প্রথম সংস্করণ আশ্বিন ১৩৬৭

প্রকাশক
শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র সান্যাল
সান্যাল প্রকাশন
১৬ নবীন কুণ্ডু লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ
অরুণিমা চৌধুরী

মুদ্রক
এস. কুণ্ডু
জয়গুরু প্রিন্টার্স
৪এ বৃন্দাবন বোস লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

বিক্রয় কেন্দ্র
জয়দুর্গা লাইব্রেরী
৮এ, কলেজ রো
কলিকাতা-৭০০০০৯

কবিতার কালান্তর

সূচিপত্র

বাংলা কবিতার কালান্তর

সেই সার্কিট হাউসের দোতালায় সমুদ্রের সামনেই তিনি বসেছিলেন একটি কেদারায়। সামনে সেই সমুদ্র। এই সমুদ্রকে দেখেই একদা সাতচল্লিশ বছর আগে এই বাড়িতেই লিখেছিলেন—'হে আদি জননী সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার।' কিন্তু এখনকার কবিতায় সে কবিতার অচিন্তিত গতিমত্ততা থাকতে পারে না। এখন এসেছে 'আত্মসমাহিত মনের ফল ফলানোর নিগূঢ় আবেগ।[১] লেখনীর এই পরিবর্তনকে, এই পরিবর্তিত এ্যাটিটুড ও টোনকে উপলব্ধির পথেই আধুনিক কবিতার প্রথম ভ্রূণস্পন্দন শুরু হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ—সেই প্রথম আধুনিক কবিই একথা প্রথম অনুভব করেছিলেন—'ঐ শালগাছ পঞ্চাশ বছর আগে যে অম্লান ফুল ফুটিয়েছিল আজও ঠিক সেই ফুলই ফোটাচ্চে, কিন্তু ক্ষণিকায় আমি ত্রিশ বছর বয়সে যে কবিতা লিখেছি, আজ আমি সে কবিতা লিখিনে'।[২] পাল্টে যায় কবিতার ভাষা, প্রসঙ্গ, প্রকরণ শুধু কবির অভিনব হবার আকুলতাতেই নয়। আসলে পাল্টে যায় বলবার কথা। টেক্‌নিকের নিজস্ব ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত সভ্যতারই জটিল বন্ধুর অগ্রগতির ইতিহাস। যে-অর্থে every age is an age of transition, সেই অর্থেই কালান্তরের চাপে সচেতন কবির কাছে বদলে যায় একযুগের কবিতার ভাষা। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ঋজু ব্যঙ্গাত্মক বিষণ্ণ ভাষা ও ডিক্‌শন বাঙালি মধ্যবিত্তের কল্পিত স্বর্ণযুগের অবসানে, তার সকল অসঙ্গতির অনিবার্য ঐতিহাসিক উন্মোচনের দিনের যথাযথতায় (poetic exactness) চিহ্নিত।

সেই অর্থে আধুনিক কবিতা আধুনিক জীবনের কবিতা। একালের কবিতা। কবে থেকে এ কবিতা 'আধুনিক কবিতা' এই অভিধা পেতে শুরু করেছে তা সন্ধিৎসু গবেষকরা খুঁজেছেন। আমাদের বর্তমান ভূমিকার প্রধান আলোচ্য আধুনিকতার সংজ্ঞার্থটিকে কে কেমনভাবে গ্রহণ করেছেন, কে কোন্ আলোকে বিষয়টির মৌল সূত্রটি ধরার চেষ্টা করেছেন। বলা প্রয়োজন, এ আলোচনার প্রেক্ষাপট থেকে আমরা কবিতায় আধুনিকতার ইতিহাস প্রসঙ্গটি বাদ দিচ্ছি। যে-বিচারে ব্লেকের Tiger চিরকেলে আধুনিক কবিতা, যে-বিচারে Donne চিরন্তন আধুনিক—আধুনিকতায় অমর বৈষ্ণব কবিতার কয়েক ডজন ছত্র—আমরা সে বিচারকে এই আলোচনার পরিমন্ডলে আনছি না। বিংশ শতাব্দীর

১. রবীন্দ্রনাথের 'চিঠিপত্র', একাদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৭৭
২. রবীন্দ্রনাথের 'চিঠিপত্র', একাদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৮২

চতুর্থ দশকে 'আধুনিক কবিতা' অভিধা পেয়ে যে সব কবিতা চিহ্নিত হল, লাঞ্ছিত হল, তিরস্কৃত হল, অভিনন্দিত হল তাদের সম্বন্ধে বুদ্ধিজীবীদের মূল্যায়নের তাৎপর্য আমাদের আলোচ্য।

রবীন্দ্রনাথের কাছে আধুনিক কবিতা ব্যাপারটি কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, অভ্যর্থনা ও প্রত্যাখ্যান দুইকেই কেন তিনি সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে ঘোষণা করতে পারছিলেন না, সে আলোচনার পুনরাবৃত্তির আগে রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনের সঙ্কটটি অনুধাবনের যোগ্য। তিনি যে তৎকালীন বিশ্ব-বাস্তবতার যথোচিত সন্নিহিত হতে পারছেন না একথা তিনি নিজেই দুএকবার বলেছেন। রুচি বদলের কাটাকুটি খেলায় যোগ দিতে আর তাঁর মন চাইছিল না। তাই তিনি তখন অন্য মাধ্যমকে অগ্রাধিকার দিতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। তাঁর কথাতেই বলি ঃ

ক. এই টলমলে অবস্থায় এখনো দুটো পাকা ঠিকানা পেয়েছি আমার বাণপ্রস্থের। গান আর ছবি।[৩]

খ. আমার চৈতন্য অন্তঃপুরে রেখারূপের জাদু নর্তকীরা একদিন পর্দানশীন ছিল, আজ পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এসেছে।[৪]

শতাব্দীর চতুর্থ দশকে কবিতার ক্ষেত্রে তিনি আধুনিকতাকে স্বাগত জানাতে হয়তো কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন—কিন্তু এই মহৎ শিল্পীর আধুনিকতার চর্চা ছিল অব্যাহত। তাঁর ছবি, তাঁর নৃত্যনাট্য আমাদের এ বক্তব্যের যাথার্থ্য প্রমাণ করছে। চতুর্থ দশকের কবিতায় মনোবিজ্ঞানের অভিঘাত সম্বন্ধে সচেতন থেকেও তাকে কাব্য অপেক্ষা ছবিতে রূপায়িত করতেই তিনি ছিলেন অধিকতর সচেষ্ট। তাঁর ছবি এবং তৎকালীন আধুনিক কবিতার এতৎ প্রাসঙ্গিক আত্মীয়তা বিষয়ে যে তিনি সজাগ ছিলেন, তাঁর চিঠিতে সে কথা তিনি বলেছেন ঃ

> আমার ছবি রচনায় দেখি অচিন্তার অতল থেকে হঠাৎ ভেসে ওঠে রেখার রূপ—সচিন্ত মন তার পরে তাকে দখল করে বসে। আধুনিক মনোলোকে কাব্যের প্রকাশ রহস্য আমি বোঝবার চেষ্টা করচি—যেখানে তার আবির্ভাব কৃত্রিম নয় সেখানে তাকে স্বীকার করে নিতে হবে—অভ্যাসের বাধাকে একান্ত বলে মানলে ভুল হবে।[৫]

৩. চিঠিপত্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, একাদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা—২২৯
৪. চিঠিপত্র, ঐ ঐ পৃষ্ঠা—২৩৩
৫. চিঠিপত্র, ঐ ঐ পৃষ্ঠা—৩২৪

'অভ্যাসের বাধা' বলতে তিনি যে প্রথাগত কাব্যচর্চার পিছুটানকেই বোঝাতে চেয়েছেন একথা বলাই বাহুল্য। আধুনিক কবিতা এই পিছুটানকে ছিঁড়ে ফেলার জন্য যেখানে ব্যস্ত হয়েছে সেখানে রবীন্দ্রনাথের মৃদু পরিহাসস্নিগ্ধ কটাক্ষটিও তাৎপর্যপূর্ণ। হেমন্তবালা দেবীকে লেখা চিঠিতে য়ুক্যালিপ্টাস গাছে কোকিল ডাকার সংবাদ জানিয়ে কবি বলছেন, কোকিলটা বোধ হয় আধুনিক।[৬]

যে কারণে রবীন্দ্রনাথ ছবির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পারঙ্গম হলেও কাব্যের ক্ষেত্রে আধুনিকতার অন্যতম কুললক্ষণ সময়সচেতনতাকে ততটা স্বাগত জানাতে পারেননি তার কারণটিও অননুমেয় নয়। আধুনিক কবি-ব্যক্তিত্বের আত্ম-সচেতনতার অখণ্ডতাকে কবি আদপেই আমল দিতে চান নি, অথবা পারেন নি। তিনি বলছেন, "আমার মনটা হয়তো সোশিয়ালিষ্ট, আমার কর্মক্ষেত্রে তা ভিতর থেকে প্রকাশ পেতেও পারে কিন্তু উর্বশী কবিতাকে সে স্পর্শও করে না। শালের কাঠ এবং শালের মঞ্জরীর প্রকাশ স্বতন্ত্র"। এই চিন্তা, মনন এবং জীবনধারার মধ্যে যে স্ববিরোধ তা একটা আধুনিক কবিতার বিষয় হতে পারে—কিন্তু কবিতা ও মননের এই অসেতুসম্ভব ব্যবধান কিছুতেই আধুনিক কবিতার লক্ষণ হতে পারে না। এই স্ববিরোধকে রবীন্দ্রনাথ এড়াতে না পেরেও তিনি যে প্রথম আধুনিক কবি হলেন, সে তাঁর বিশ্বসচেতনতার জোরে, তাঁর আত্মসচেতনতার শক্তিতে।

চতুর্থ দশকেই আধুনিক কবিতার লক্ষণ বিচার শুরু হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর যাঁরা এই কবিতার আত্মা বিচারে অগ্রসর হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আমরা অবশ্যই ১৩৪৭-এর অঘ্রাণের 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষের 'আধুনিক বাংলা কবিতা' প্রবন্ধটির কথা বলব। 'আধুনিক কবিতা' এই অভিধাটি যে অতঃপর হয়ে উঠবে অনপসরণীয়, তা এবার বোঝা গেল। বস্তুতঃ এই প্রবন্ধটিতেই নির্দেশ পাওয়া গেল ঐতিহ্য ও সমসময় সচেতনতার মধ্যে অবিরোধে, মীমাংসায় আধুনিক কবিতার সিদ্ধি। ১৩৪৬-এর শ্রাবণে প্রকাশিত হল 'আধুনিক বাংলা কবিতা'। সংকলনের নামটি থেকেই 'আধুনিক কবিতা' নামটি পাকাপোক্ত হয়ে গেল। সংকলনটি একদিক থেকে আধুনিক বাংলা কবিতার প্রতিষ্ঠা-স্তম্ভ। এর সম্পাদকদ্বয়—আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দুটি পৃথক ভূমিকায় আধুনিক কবিতার চরিত্র বোঝাতে যত না তৎপর হয়েছেন, তার চেয়ে বেশি তৎপর হয়েছেন

৬. চিঠিপত্র, নবম খণ্ড।

তার লক্ষণ বোঝাতে। আব্দু সয়ীদ আইয়ুব সংকলনটির বৈশিষ্ট্য বিষয়ে একটি সার্থক উক্তি করেছিলেন, "কোনো একটি ভাষায় নির্দিষ্ট কালের মধ্যে কিম্বা বিশিষ্ট শ্রেণীর ভিতরে কোন্ কোন্ কবিতা ভাল, কাব্য সঙ্কলন গ্রন্থকে এই প্রশ্নের উত্তর মনে করা যেতে পারে। অর্থাৎ কাব্য সঙ্কলন কাব্য সমালোচনারই অন্তর্ভুক্ত।" এ পর্যন্ত কোনো সংকলনই এর ব্যতিক্রম নয়। আইয়ুবের ভূমিকার গুরুত্ব এইখানে যে তিনিই চারের এবং পাঁচের দশকের বাংলা কবিতার মূল ভাবসংঘাতের বিষয়টি প্রথম আঁচ করেছিলেন। তিনি প্রথম উচ্চারণ করেছিলেন যে, আধুনিক বাংলা কবিতা থেকে রোম্যাণ্টিক মনোভাব অন্তর্হিত তখনো নিশ্চয় হয়নি, তবে অন্তর্ধানের পথে চলেছে। এবং সেই ১৯৪০-এর মধ্যেই 'ঘোড়সওয়ার', 'উটপাখি'র আধুনিক ও প্রতীকী আলোড়নের মধ্যেই যে কবিতাকে তথাকথিত main stream-এ ফিরিয়ে নিয়ে যাবার মৃদু প্রয়াস শুরু হয়েছে—কেউ কেউ 'উনিশ শতকের খেয়ালী সুর'কে সাহস এবং কৃতিত্বের সংগে বাঁচিয়ে রেখেছেন, শ্রীযুক্ত আইয়ুবই তা প্রথম লক্ষ করেন। আইয়ুবের ভূমিকাটির দ্বিতীয় গুরুত্ব হল সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে-র আধুনিকত্ব সম্বন্ধে নির্ভুল ব্যাখ্যা। তখন নিশ্চিত ভাবেই এই দুই পুরোধা আধুনিক কবি ছিলেন পরিণতি সাপেক্ষ। শ্রীযুক্ত আইয়ুব রসজ্ঞতার সংগে তাঁদের প্রতিভার পরিমাপের অসমাপ্ত প্রয়াস করেছেন। কম্যুনিকেশনের যে সমস্যা তখন প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল আইয়ুব (এবং অপর সম্পাদক হীরেন্দ্রনাথ) সে সমস্যাকেও যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছেন।

আইয়ুব স্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছিলেন রোম্যাণ্টিক কাব্যধারার সংগে প্রতীকী কাব্যধারার সম্পর্ক ও পার্থক্য। বাংলা আধুনিক কবিতার প্রারম্ভিক লগ্নে প্রতীকী ভাবনার প্রকৃতিটিও তিনি বিশ্লেষণ করেছিলেন। কিন্তু আইয়ুবের ঐ লেখাটিকে বর্তমান লেখক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন আর একটি বিশেষ কারণে। ১৯৫৩ সালে C. M. Bowra তাঁর Poetry in Europe[৭] নামক সুচিন্তিত প্রবন্ধে অর্ধবিংশ শতকের য়ুরোপীয় কাব্যের মূল্যায়নে য়ুরোপীয় কাব্যপ্রবাহের দুই মূল ধারা নির্দেশ করেছিলেন। একটি ধারা তাঁর মতে সিম্বলিস্ট ধারা, অপরটি anti-Symbolist and may for convenience be called Modernist. আমাদের সংগে মতে মিলুক বা না মিলুক বাওরা এই দুধারার কবিদের ভাগ করেছিলেন এইভাবে —রিল্‌কে, উনামুনো, ভ্যালেরি, জর্জ, ইত্যাদি অবিস্মরণীয় কবিরা প্রতীকী

৭. diogenes, International Council for Philosophy and Humanistic Studies. No—1

ধারার প্রধান প্রতিনিধি[৮]। পক্ষান্তরে এডিথ সিট্ওয়েল, টি. এস্. এলিয়ট, পল এলুয়ার, মায়াকোভস্কি, লোরকা,—এঁরা মডার্নিস্ট ধারার প্রতিনিধি। ১৯৫৩ সালের অনেক আগে শ্রীযুক্ত আইয়ুবের কাছেও ব্যাপারটি প্রতিভাত হয়েছে অন্য ভাষায়। তিনি বলেন—"সাম্প্রতিক য়োরোপে, অন্তত ইংরেজী ও ফরাসী সাহিত্যে দুটি প্রায় বিপরীত আন্দোলনের প্রভাব সবচেয়ে প্রবল, প্রতীকী (Symbolist) এবং সাম্যবাদী।" এখানে আইয়ুব যাকে স্থূল অর্থে 'সাম্যবাদী' বলছেন অথচ নিদর্শন অবতারণার বেলায় যাদের নামোল্লেখ করছেন, তাঁরা কিন্তু লাক্ষণিক বিচারে আধুনিক। যারা গোলদীঘিতে সভা করত, মিছিলে যোগ দিত, জেল খাটতো তাদের কবিতাকে 'বিশুদ্ধ সাহিত্যানুরাগী' ব্যক্তি সন্দেহের চোখে কেন দেখবেন শ্রীআইয়ুব সে বিষয়ে সুনিশ্চিত ছিলেন না। কেননা 'বিশুদ্ধ সাহিত্যানুরাগী' তো আমরা জানি কবিতার বিচার করবে কবিতার মাপকাঠিতেই। আইয়ুব নিশ্চয় রবীন্দ্রনাথের অসংগত উক্তির দায় সামলাতে গিয়ে (হতে পারি সোশিয়ালিস্ট, কিন্তু উর্বশী কবিতা বিচারে তার খোঁজ নেবার দরকার নেই) আর এক অসংগতি সৃষ্টি করতে চান নি!

ঐ সংকলনের অপর রসজ্ঞ সম্পাদক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর বুদ্ধিবিশ্লেষণদীপ্ত আলোচনায় প্রকারান্তরে শ্রীআইয়ুবের একটা মন্তব্য মেনে নিয়েছেন। সাম্প্রতিক কবিতার দুটো ধারা—প্রতীকী এবং আধুনিক'। এবং সেই পরোক্ষ ভাবনার দ্বারা ভাবিত হয়ে তিনি নতুন কবিতার আধুনিকত্ব কোথায় তার ব্যাখ্যায় রত হয়েছেন। মার্কসবাদী দৃষ্টিতেই তিনি সমাজ ও সভ্যতার দ্বান্দ্বিক সমগ্রতার স্বরূপটি ধরার সংগে আধুনিক কবিতার জটিলতারও চরিত্র নির্ণয় করেন চমৎকার। তিনিও শ্রীআইয়ুবের মতোই সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে-র কবিতাকে তৎকালীন কাব্যান্দোলনের অভিজ্ঞাননিরূপণের ক্ষেত্রে যোগ্যমাত্রায় গ্রহণ করেছেন। এবং কী আশ্চর্য এই দুই বিদগ্ধ সমালোচকের ভূমিকাতেই জীবনানন্দ-প্রসংগ অনুপস্থিত। হীরেন্দ্রনাথের ভূমিকায় এই অনুপস্থিতির একটা অর্থ অবশ্যই অনুমেয়। জীবনানন্দের কবিতায় আধুনিক সমাজ-সচেতনতা বলতে হীরেন্দ্রনাথ যা বুঝতেন, তার আপাত অবিদ্যমানতা হয়তো হীরেন্দ্রনাথের নীরবতার হেতু। কিন্তু আইয়ুব তো রোম্যান্টিক ও প্রতীকী কাব্যের ধারা ধরেই তাঁর বিচার সম্পন্ন করেছিলেন। তাঁর কাছে বনলতা সেনের কবি মুখ্যতা পান নি—অন্তত সেই মুহূর্তে পান নি, এটা ঐতিহাসিক সত্য। এইখানেই সমালোচকদের

---

৮ আইয়ুবই বলুন আর C M. Bowra ই বলুন—এ জাতীয় বিভাগ কল্পনায় নানা বাধা। তবে সে আলোচনার ক্ষেত্র এটা নয়।

সীমাবদ্ধতা। কবিরাই কবিকে আবিষ্কার করেন। এভাবে যে শুধু এক দেশের কবি আরেক দেশে, এক কালের কবি আরেক কালে আবিষ্কৃত হন, পুনর্মূল্যায়িত হন তাই নন—একই দেশে একই কালে একজন কবি আরেক জন কবির গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতনতা বিস্তার করেন। সুধীন্দ্রনাথের 'চোরাবালি' আলোচনা এবং বুদ্ধদেব বসুর জীবনানন্দ আলোচনা এ প্রসঙ্গে এদেশীয় উদাহরণ।

তবে এ ছাড়াও সেই মুহূর্তে জীবনানন্দ-আগ্রহের অতীব্রতার আরেকটা কারণকে বোধ হয় উপেক্ষা করা যায় না। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত আধুনিক কবিতার যে-সংজ্ঞার্থ বাংলা সাহিত্যে প্রবল ছিল, কারণটি সেখানে নিহিত। অন্তত ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত বিশ্বরণরঙ্গভূমির তাড়নায় ও আক্ষেপস্পন্দে বিশ্বসচেতনতাই হয়ে উঠেছিল আধুনিক কবিতার প্রধান পরিচয়-সূত্র। ঐ সময়েই শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত 'নব্য কবিতা' নামে তাঁর রচনার বিষয়টি আলোচনা করেছেন। 'নব্য' বিশেষণটি 'আধুনিক' বিশেষণের বিকল্প হিসাবেই শ্রীগুপ্ত ব্যবহার করেন। আধুনিক কবির অভিজ্ঞান নির্ণয়ের প্রয়াসে শ্রীগুপ্ত বলেন ঃ "আধুনিক কবির বিশ্বচেতনা দুই ধারায়—দেশে ও কালে ভূগোলের আর ইতিহাসের জ্ঞান আধুনিক মনকে বিচিত্র রকমে সমৃদ্ধ করেছে। একদিকে সমসাময়িক সমগ্র ভূখণ্ড আর একদিকে সমগ্র অতীত বিবর্তন, কত প্রকার অনুভূতির আধুনিক চেতনায় সঞ্চিত করেছে স্তরে স্তরে কোষে কোষে।" মনে হয় আধুনিকতার এই স্তরটি আমাদের প্রিয় কবি জীবনানন্দের শেষ-রোম্যাণ্টিক কোমল বর্ণাভাকে অতিক্রম করে তখনো স্পষ্টতা পায়নি বলেই শ্রীআইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথের আলোচনায় জীবনানন্দ-প্রসঙ্গ প্রাধান্য পায় নি।

প্রথম প্রকাশের চৌদ্দ বছর পরে 'আধুনিক বাংলা কবিতা'র নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হল বুদ্ধদেব বসুর সম্পাদনায়। সর্বার্থেই এটি একটি নতুন সংকলন। এবারে আর আধুনিক কবিতার সংজ্ঞার্থ নিয়ে সম্পাদককে মাথা ঘামাতে হল না, আধুনিক পক্ষে মতামত সুদৃঢ় করার জন্য ওকালতনামারও প্রয়োজন হল না, কেননা আধুনিক কবিতা তখন আত্মপ্রতিষ্ঠায় নিরঙ্কুশ। এমন কি তখন বোধ হয় তার আর 'আধুনিক' অভিধারও দরকার নেই। পুরানো প্রকরণের কবিতা তখন প্রায় অচল।

একটা সঠিক সংজ্ঞা অপেক্ষা ন্যায্যতই শ্রীবসু আধুনিক কবিতার বৈচিত্র্যটিকেই তাঁর সংকলনের প্রধান সূত্র বলে গ্রহণ করেন। তাঁর সংকলনের সাহায্যে তিনি প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন বাংলা কবিতার বহুমুখী বৈচিত্র্যকে। তিনি এই বৈচিত্র্যগুলির কোনো সামান্য সূত্র সন্ধানের জন্যও আগ্রহ দেখালেন

না। তবু অস্পষ্টভাবে যেন মনে হয়, C. M. Bowra-র মতো বা শ্রীআইয়ুবের মতো তিনিও আধুনিক বাংলা কবিতার দুই ধারায় বিশ্বাসী। তাঁর ভাষাতেই বলা যাক ঃ

'পূর্ববর্তী সম্পাদকেরা আধুনিকতার বিশেষ কয়েকটি লক্ষণ স্থির করে নিয়েছিলেন ; সামাজিক বিষয়, বিতর্ক, ব্যঙ্গ, মননধর্মিতা, নূতনতর ভবিষ্যতের দিকে উন্মুখতা, এই রকম কয়েকটি চিহ্নের সাহায্যে এরা যাচাই এবং বাছাই করেছিলেন। বাংলা কবিতায় এই লক্ষণগুলি সদ্য দেখা দিয়েছে সেই সময়ে, তখনকার মতো ঐ দিকেই বিশেষভাবে ঝোঁক পড়া অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু এর ফলে অন্যদিকে অসম্পূর্ণতা ঘটে গেল, গীতধর্মিতার স্থান হলো সঙ্কুচিত ; চিত্রকল্প প্রধান কবিতা, আবেগপ্রবণ কবিতা উপযুক্ত মর্যাদা পেলো না। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য এই যে আধুনিক বাংলা কবিতা এই দুই দিকেই সক্রিয়।' এই দুই দিক কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই আশ্লিষ্ট এ কথাটা কিন্তু তেমন জোরের সঙ্গে কেউ বললেন না। আসল কথাটি কি এখানেই নয় ? 'কবিতা' সম্পাদকের সহজাত ঔদার্য নিয়ে এ সংকলনটি তৎকালীন বাংলা কবিতার প্রতিনিধি হলেও ব্যক্তিগত রুচির মার এ সংকলনটি এড়াতে পারেনি। যেমন অরুণ মিত্রের 'লাল ইস্তাহার' নিশ্চয় কবিতা হওয়া সত্বেও বাদ গেল অন্য কারণে। যেমন, যে সময়ে সংকলনটি বেরুচ্ছে সে সময়ে বিষ্ণু দে-র 'অন্বিষ্ট' ছাপা হয়ে গেছে, 'কবিতা'তেই বেরিয়েছে 'জল দাও'। 'অরণিতে' 'মৌভোগ'। এ শুধু বিষ্ণু দে-র কালান্তরের সাক্ষ্য নয়, বাংলা কবিতার কালান্তরের ইশারা ! বাংলার অস্তিত্বের যন্ত্রণা, বিপুল লোক পুরাণে সেই যন্ত্রণা-সংগ্রামের উত্তরণের প্রাণদ উৎস আবিষ্কার—তখন বাংলা কবিতাকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়ের লেখা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সংকলনে এ জাতীয় কবিতা স্থান পায়নি। কিন্তু তাহলেও সংকলয়িতার রুচিকে আমরা সন্দেহ করতেই পারি না। না হলে সমর সেনের অমন যোগ্য প্রতিনিধিত্ব লাভ সম্ভব হত না।

১৯৫৪-তে বুদ্ধদেব বসুর এ সংকলন প্রকাশ হল। কবিতার কালান্তর কিন্তু তার আগেই সূচিত হয়েছে। ১৯৫৩-তে বেরিয়েছে 'কৃত্তিবাস'। দুটি মূল্যবান প্রবন্ধ এবং একটি সংক্ষিপ্ত সম্পাদকীয় এ কথা বুঝিয়ে দেয় যে, 'কৃত্তিবাস' তার জন্মমুহূর্তে কবিতার কালান্তরের কী বিপুল চেতনাই না বহন করেছিল ! সমর সেন তাঁর 'সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা'-য় বললেন, প্রত্যক্ষ রাজনীতির দুর্বার প্রভাব সাহিত্যে আসবে। 'রুশ ফরাসী তুর্কি, চিলির কবিদের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে। তাঁদের বিস্তার ও মানবিকতা

যে আমাদের লেখায় ছাপ ফেলবে সেটা স্বাভাবিক ও সুখের বিষয়। কিন্তু তাঁদের সহজ মানবিকতার পেছনে যন্ত্রণার ইতিহাস আছে, যে যন্ত্রণায় পোড় খেয়ে লোকে নতুন উপলব্ধির পাহাড় চূড়ায় আসতে পারে'। আধুনিক অগ্রণী কবির এই শেষবাক্যধৃত বক্তব্যের যেন আর এক ভাষ্য পেলাম ঐ সংখ্যা 'কৃত্তিবাসের'ই জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের 'স্বরান্বিতা' প্রবন্ধে আধুনিক কবির আত্ম-সমালোচনায়—'সে পাকা হাতের ফল প্রাকৃত জনের আস্বাদনের বস্তু হল না। বিশেষ করে আমাদের দেশের অর্ধশিক্ষিত নিরক্ষর জনসাধারণের নাগালের বাইরে সৌখীন বাবুদের কাব্যকাননের মাকাল ফলের মতোই তা ঝুলে রইল। এই ভাবসমাধি অবশ্য কিছু পরিমাণে ঘা খেলো গত দশ বারো বছরের প্রগতি আন্দোলনের ঢক্কা নিনাদে। কিন্তু তথাকথিত প্রগতিবাদী ও মার্কসমন্য ভাব-ধারার চাপেও এই সংকট থেকে ত্রাণের উপায় পাওয়া গেল না। মূল সমস্যা সমস্যাই থেকে গেল'। আমি ঠিক উদ্ধৃতি দিতে পারব না, তবে মনে পড়ছে 'সাহিত্য পত্র' পত্রিকায় শ্রীমৈত্র একবার যেন বিষয়টি তুলেছিলেন অন্য ভাষায়। তাঁর কথাটা ছিল—কবিতার কাজ কঠিন হওয়া বা সহজ হওয়া নয়, কম্যুনিকে-শনের সমস্যাটাই আসল কথা। যে ভাবেই হোক পাঁচের দশকের গোড়ার দিকে অন্তত কৃত্তিবাসের প্রথম সংখ্যাটি পড়লে এ ধারণা জন্মায় যে একটা 'প্রত্যয়ে'র জন্য আকুলতা এ সময়ে তীব্রতা পেয়েছিল নতুন করে। সম্পাদক শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উক্তিতে সে আকুলতা স্পষ্টতা পেলো: 'রবীন্দ্রনাথ থেকে যে আধুনিক বাংলা কবিতার সৃষ্টি তার সর্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত। বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা, বিতর্ক বিচার এবং গতিপথের মূল্য নির্ণয় সম্বন্ধে মতভেদের অন্ত নেই। তবুও প্রথম দিক্‌কার কবিতায়, কিছুটা অসংস্কৃত হলেও আত্মপ্রত্যয়ের সুর ছিল। এখনকার কবিতা যেন বেশীমাত্রায় ভঙ্গীপ্রধান এবং বক্তব্যে অনিশ্চয়তার সমস্যা'। যে-আত্মপ্রত্যয়ের অভাবের জন্য শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় ক্ষোভ করেছেন, তার কারণটিও অননুমেয় নয়। সেতুহারা বাংলা কবিতার সেতু রচনার জন্য আকুলতা (প্রসঙ্গত স্মরণ করিয়ে দিই সম্পাদকীয় প্রবন্ধটির নাম ছিল 'কাব্যসভা') আসলে তারও এক আইডেনটিটি ক্রাইসিসের সমস্যা। এ সমস্যা থেকে সে মুক্তি পেতে পারে না, বক্তব্যে নিশ্চয়তা আসতেই পারে না, যতক্ষণ না সে এ বিষয়ে নিশ্চিত হচ্ছে, 'চিত্রল পতঙ্গেরা তার দাহময় পরীক্ষায় পুড়ে মরে, যিনি অম্লান থাকেন, তিনি বসুধার দুহিতা সীতা',[১] যতক্ষণ সে না বোঝে, 'জানি নিরুদ্দেশ অন্বেষা উৎসবে / সতীকে মেলে না, মেলে

[১] ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, ১৯৩৩

পার্বতীকে কুমারসম্ভবে'[১০] ; যতক্ষণ সে না এই উপলব্ধিতে পৌঁছয়, 'একথা না মেনে তার উপায় নেই যে প্রত্যেক সৎ কবির রচনাই তার দেশ ও কালের মুকুর'।[১১]

শেষ পর্যন্ত কবিতাকেই কবিতার সমস্যার সমাধান করতে হবে। 'অনিশ্চয়তার' যে-সমস্যার কথা শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন, তার মূল তো শুধু আধুনিক জীবনের অপ্রকৃতিস্থ জটিলতার মধ্যেই নেই, কবির নিজস্ব সম্বিৎ ও আত্মসচেতনতার ঊনতায় ও আতিশয্যেও সে মূল নিহিত থাকতে পারে। পাঁচের দশকে তথাকথিত দুই ধারার মধ্যেই সে আতিশয্য ও ঊনতা দুইকেই আমরা নানা স্বভাবে কখনো কখনো প্রত্যক্ষ করেছি। বস্তু-স্থূলতায় কখনো সে হয়েছে ভারাক্রান্ত, আত্মলীনতায় কখনো সে হয়েছে স্বেচ্ছাচারী।

'কাব্যিক সংকটক্রান্তি এবং নতুন নিষ্ক্রমণের পদক্ষেপ' আধুনিক আত্মসচেতনতার কবিতার ক্ষেত্রে—মূল কথা। সুতরাং ১৯৬৩-তে 'একালের কবিতা'র ভূমিকায় সম্পাদক বিষ্ণু দে কবির আতীতি-ময় নিরন্তর বিকাশ-শীলতাকে বিশেষ গুরুত্ব দেন। তিনি সুধীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দের ও অমিয় চক্রবর্তীর বিকাশশীল কবি-ব্যক্তিত্বের (এ ভূমিকা অন্য কেউ লিখলে অবশ্যই বিষ্ণু দে-র নামটিও এখানে যুক্ত হতো) উদাহরণ দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের বিরাট প্রশ্নময় ব্যক্তিত্ব শেষ পর্যন্ত শান্তি পারাবারে লীন। আধুনিক কবির জগৎ অনেক বেশী জটিল, দ্বিধায়, যন্ত্রণায়, সংশয়ে বন্ধুর। ব্যক্তি ও বাইরের জগতের দ্বন্দ্বময় ঘাত-প্রতিঘাত এখানে কোনো শান্তি পারাবারে অবগাঢ় হয়ে নিষ্প্রশ্ন হয়ে যেতে পারে না। প্রাত্যহিক এখানে প্রবল এবং তীব্র। কবিতার উৎস জীবন। একালের কবিতার উৎস একালের জীবন। কাজেই 'আজ তাকে জীবন্ত হতেই হবে স্থানীয় বাচন শিখে' [১২]।

কাব্যের ভাষাই কবির অভিজ্ঞান। বাংলা কবিতার কালান্তরের পর্বে পর্বে এই সত্যটিই উপলব্ধ হল যে, নেহাৎ ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাস এবং তার ব্যক্তিগত প্রকাশমাধ্যম-রূপে ভাষা কবির এবং কাব্যের দুর্বলতার নিদর্শন। কবিকে সজাগ থাকতে হয় 'ব্যক্তিসমাজের নিহিত ভাষা বিনিময়ের আতীতির' দিকে। কথ্যস্রোত বা কথ্যরীতি ইত্যাদি বিষয়কে সহজ সুলভ অর্থে গ্রহণ করায় অবশ্যই বিপদ

১০. সনেট (এক) অম্বিষ্ট, বিষ্ণু দে, ১৯৪৮

১১. সূর্যাবর্ত, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, ১৯৩৬

১২. মার্কিন কবি ওআলেস্ স্টিভেন্সের লেখা 'আধুনিক কাব্য' নামে কবিতার বিষ্ণু দে-কৃত অনুবাদ।

আছে। প্রত্যহের সজীব কথ্য-স্রোতের ভিতর দিয়ে নিত্যের তটে পৌঁছানো প্রায় দুঃসহ সাধনা। আধুনিক বাঙালি কবিকে পৃথিবীর অন্যদেশের সমসাময়িক কবিদের মতোই সেই সাধনায় রত থাকতে দেখে আমরা কাব্য-পাঠকেরা উৎসাহিত থাকি। দেখি যে, ভাষা গাঢ় হতে হতে সৃষ্ট হয় যে-চিত্রকল্প, চিত্রকল্প স্বাধীন হয়ে চলে যায় যে প্রতীকের রাজ্যে—সে ভাষার আসল কাজ হল প্রত্যহের উপাদান-মাধ্যম ব্যবহার করেই প্রত্যহের জীর্ণ আবরণ সরিয়ে ফেলা। ভাষা নিয়ে এ অসাধ্য সাধন তিনি করতে পারেন যিনি জীবনের স্থায়ী মূল্যগুলি সম্বন্ধে সচেতন। তাঁর কাছে কবিতা মানে সেই মূল্য-সচেতনতা বা আত্মসচেতনতারই প্রগতি। সে প্রগতি একই সঙ্গে ব্যক্তিগত এবং মানবিক।

কবিতার ভাষা

এক

যে অপরিহরণীয় ভবিতব্য একান্তভাবে মানুষেরই, য়োরোপে শিল্প-বিপ্লবের পরে ব্যক্তি তাকে অনাবৃত তীব্রতায় অনুভব করেছে আপন প্রাতিস্বিক জগতে। নৈঃসঙ্গ্যই সেই অমোচনীয় নিয়তি। একদিকে বাইরে যখন মানুষের প্রভুত্বের সীমা ও আয়তন বেড়ে চলেছে অপরদিকে নিজের মনের গহনে জটিলে তখনই মানুষও এক অজ্ঞেয় সমুদ্রের ডাক শুনেছে। সেখানে এক কম্পাসহীন মনঃসমুদ্রচারণায় চেতনার স্বরূপায়তন ক্রমবর্ধমান দেখে ব্যক্তির বিস্ময়ের সীমা থাকে নি। বহুদিনের অনুপস্থিত 'আমি' তার অনাবিষ্কৃত আন্তর মহাদেশের সকল রহস্যকে মেলে ধরে কবির কাছে উদ্ঘাটিত হতে চেয়েছে, উন্মোচিত হতে চেয়েছে। স্বভাবতই এই সময়ে কবির প্রকরণে শব্দ এবং প্রতীকের যুগ্ম স্বাধিকার। শব্দের শক্তি কত অজেয়, কী তার সাধ্য, আর অসাধ্য—কতখানি অর্থকে সে নিজের কবলে আনে, নিজেই যথাসময়ে তা ছাড়িয়ে দেবে বলে, কেমন করে তাকে নতুন তাৎপর্যে দীপ্যমান করা যাবে—আপন নৈঃসঙ্গ্যের মুখোমুখি হয়ে, তারই মার খেতে খেতে কবিরা তা উপলব্ধি করলেন। তখনই তাঁরা বুঝলেন বচনকে সেই অবধি নিয়ে যেতে হয় যেখান থেকে অনির্বচনীয়ের আরম্ভ। শব্দ সেখান থেকেই বহু অনুষঙ্গের পরিষদবর্গের সমভিব্যাহারে তার সীমা ভাঙার যাত্রা শুরু করে—সে রাজার ললাটে কবি নিজে রাজপুরোহিতের মতো পরিয়ে দেন কল্পনার অভিজ্ঞান টীকা। শব্দই তখন শব্দচিত্র হতে হতে আপন রাজাধিকারে প্রতীক হয়ে ওঠে। প্রকৃত কবিতায় শব্দ, শব্দচিত্র এবং প্রতীক গৃহীত অথবা রচিত নয়, জাত।

গদ্যে শব্দেরা স্বাধীন নয়। তারা অভিধান-শাসিত। সংস্কৃত ক্লাসিকে শব্দের অভিধা-নির্দেশিত অব্যর্থতা বিস্ময়কর। রসজ্ঞ সমালোচক দেখিয়েছেন মেঘদূতে কালিদাস একাধিক 'স্ত্রী'-বাচক শব্দকে ভিন্ন ভাবব্যঞ্জনায় প্রয়োগ করেছেন। আধুনিক কবি এই পথেই হাঁটেন এবং পেঁছে যান আর একটু দূরে। তিনি নব অনুষঙ্গ সৃষ্টি করেন। তাদের স্বাধীন করে তোলা একালের কবিরই কাজ। তখনই তারা দ্বিতীয়ার্থকে বাড়ায়, বদলায়। একই শিখাকে আলাদা আলাদা আবরণে দেখা যায় পৃথক দ্যুতি বিকিরণ করতে। যে Lily একদা ছিল শুধু শুভ্রতার অনুষঙ্গবাহী, প্রির্যাফায়েলাইটদের করস্পর্শে সেই Lily-র শুভ্রতায় এল নীরক্ততার আসঙ্গ। রক্তের লাল রঙ কখনো হয়

উদ্দীপনার রঙ, কখনো হয়ে ওঠে হিংস্র নৃশংসতা। 'মদ' বা 'মাতাল' আবিষ্টতার প্রাথমিক অর্থকে ছেড়ে নিয়ে যেতে পারে স্বার্থবিস্মৃত আত্মোৎসর্জনের দ্বিতীয়ার্থে—'রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে', 'মাতাল হয়ে পাতাল পানে ধাওয়া'। হেমন্ত রবীন্দ্রার্থে যা, জীবনানন্দীয় অর্থে তা নয়। একই 'শরৎনীলিমা' 'কল্পনা'-পর্যায়ে যে অর্থসঞ্চারী, 'পূরবী'তে সে অর্থ নিশ্চয়ই নেই। 'নীল' এখানে যদি মৃত্যুর রঙ, ওখানে তা হলে পূর্ণতার। অতঃপর আমাদের কাছে স্বতঃসিদ্ধ হয়ে ওঠে এই সত্য যে কবিতার বাইরে শব্দেরা দরিদ্র। অথচ, কবিতাপাঠক মাত্রেই জানেন কোনো প্রতিশব্দের মধ্যে শব্দের সেই গূঢ়তা নেই। মাত্রাগুণে মিলিয়ে দিলেও সে হারিয়ে যাবে। সে হারিয়েই থাকবে ততক্ষণ, যতক্ষণ না কবি কবিতার শব্দধ্বনির বিশিষ্ট কাঠামোর মধ্যে অন্বিষ্ট অনন্যাকে মনের মতো করে পাবে, যতক্ষণ না তার আর্থ-অবয়বের গভীর রহস্যকে উচ্চাবচ করে তুলবে। প্রসঙ্গত আমরা রবীন্দ্রনাথের 'রাহুর প্রেম' কবিতাটির মূলপাঠ ও সংশোধিত পাঠের তুলনা করতে পারি। ১৩৭০ বঙ্গাব্দের সঞ্চয়িতায় যে 'রাহুর প্রেম' কবিতা মুদ্রিত তার সম্বন্ধে গ্রন্থ-পরিচয়ে বলা হয়েছে "প্রথমাবধি সংক্ষিপ্ত ও সংস্কৃত পাঠ।" বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র রচনাবলীর প্রথম খণ্ডের 'ছবি ও গানে'র পরিচয়ে জানানো হয়েছে " 'রাহুর প্রেম' কবিতাটি সঞ্চয়িতায় বহুলাংশে পরিবর্তিত হয়েছে"। 'রাহুর প্রেম' কবিতার পরবর্তী সংক্ষিপ্ত ও সংস্কার সবই ঘটেছে মানসীতে কবি-প্রবর্তিত মাত্রাবৃত্ত ছন্দের আকর্ষণে ও প্রেরণায়। এতে সন্দেহ নেই যে, কবিতাটি তার ফলে ছন্দের ব্যাকরণে 'নির্ভুল' ছাড়পত্র পেয়েছে। কিন্তু যদি বলা যায় যে ছন্দে নির্ভুল হতে গিয়ে হারিয়ে গেল মূল কবিতার বাণীবিন্যাসবৈশিষ্ট্য, এবং কবিতাটির ভাবগত আবহের grimness তাহলে কি বেঠিক বলা হবে? সঞ্চয়িতার পরিবর্তিত পাঠে পাওয়া গেল 'চিরভিক্ষার মতন দাঁড়ায়ে রব সম্মুখে তোর', আপাতদৃষ্টিতে নিখুঁত চরণ, নির্ভুল পর্বপাত। কিন্তু 'ছবি ও গানে'র মূল পাঠের—'বিশীর্ণ কঙ্কাল চিরভিক্ষাসম দাঁড়ায়ে সম্মুখে তোর/দাও দাও বলে কেবলি ডাকিব ফেলিব নয়নলোর' এই চরণ যুগলে—যে ভাব-গাঢ় করাল সৌন্দর্য তা সঞ্চয়িতার পাঠে নেই। কবিতার ভাষা মানে ভাবের ভাষা, তার পারিপাট্য অপেক্ষা বড়ো প্রয়োজন ভাবাত্মক হয়ে ওঠা।

'ছবি ও গানে'র বিশ্বভারতী সংস্করণের এই দুটি কল্পনাসম্ভব চরণ, 'গভীর নিশীথে জাগিয়া উঠিয়া সহসা দেখিবি কাছে / আড়ষ্ট কঠিন মৃতদেহ মোর তোর পাশে শুয়ে আছে'—সঞ্চয়িতার (১৩৭০) সংস্করণে বর্জন করা হয়েছে। সংশোধিত পাঠে এই ভয়াল কল্পনার রূপায়ণ সম্ভব হয় নি। এখন কি আমরা

এই কথা বলতে পারি যে যাকে আমরা কবিতার ভাষা বলছি তা কবিতাটির আত্মার ভাষা—কবিতার অর্থে, ধ্বনিতে, ছন্দে, চিত্রকল্পে সে ভাষা উচ্চারিত হয়, গঠিত হয় অকাট্য অখণ্ডতা ? 'রাহুর প্রেম' কবিতার আদিপাঠে কবির অভিপ্রেত ছন্দ ছিল না, পরিশোধিত পাঠে ছন্দটি এল, কবিতাটি হল ললিত চারুতার নিদর্শন, কিন্তু হারিয়ে গেল সেই প্রাথমিক রুক্ষতা, যা ছিল তার ভাবাত্মক ভাষা।

সোনার তরী কাব্যগ্রন্থের 'বিম্ববতী' কবিতাটির গাঠনিক-সিদ্ধি প্রসঙ্গত আলোচ্য। ভ্রাতুষ্পুত্রী অভির মুখ থেকে শোনা রূপকথার গল্প কবিতাটির বহির্জাগতিক উদ্ঘাত। কবিতাটিতে কোথাও কিন্তু শিশুর স্বর নেই। শিশুর অমূল কল্পনার অনর্গল অর্থহীনতার মাধুরীও এখানে যথাসম্ভব বর্জিত। কবিতাটি সচেতন রূপকর্ম। প্রতিটি স্তবকের আঁটসাঁট বাঁধন বড় বেশী নিখুঁত। গল্প এখানে একাভিপ্রায়ী—তীরের মতোই লক্ষ্যভেদী। পাখির মতো ভঙ্গি নেই তার। কবি খুব সতর্ক এবং সন্তর্পিত, নির্ভুল এবং সুমিত। রানীর সজ্জার কথা বলা হয়েছে খুঁটিয়ে। আর তার দেহের কথা, রূপের কথা একবারও না। কাহিনীর যেটুকু নিষ্ঠুর অংশ তার জন্য প্রতি স্তবকে বরাদ্দ করা হয়েছে একটি করে চরণ। রানীর সজ্জার তালিকা বর্ণাঢ্য। একক চরণের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা শীর্ণ তর্জনীর মতোই রানীর নবঘন স্নিগ্ধবর্ণ নব নীলাম্বরী, গোলাপি অঞ্চল, সুবর্ণমুকুর, প্রবালের হার, সিঁদুরের টিপ, রক্তাম্বর পট্টবাস এবং পীতবসনের নবরৌদ্রবিভার হৃদয়হীন রক্তাক্ত নিষ্ঠুরতাকে দেখিয়ে দিচ্ছে। পাপের চেয়েও পাপাত্মক বলে প্রতিভাত হচ্ছে অননুশোচিত অসূয়া। বিম্ববতীর রূপকেও নেপথ্যে রাখা হয়েছে। তার সমস্ত রূপের প্রতিনিধি তার অনসূয়া হাসি। তার মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র তার প্রেম। সে প্রেম আভাসে ব্যক্তমাত্র। এদিকে কিন্তু রানীর মৃত্যুর বর্ণনাও সেই যুগল প্রাণের সঙ্গে এক চিত্রল বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছে।

তবু এরকম নিটোল আর্থ-অবয়ব সত্ত্বেও কবিতার কুহকে সিদ্ধ হল না বিম্ববতী। কাহিনী-কবিতা হিসাবে এ ঋজু বটে, প্রত্যক্ষ বটে—কিন্তু কৃত্রিমতা এখানে সংগুপ্ত নয়। পীড়িত করে 'নব' বিশেষণের পুনরাবৃত্তি। 'ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে'—এই স্তবকান্তিক ধুয়ায় 'স'-এর মতো স্বজন-বিমুখ ব্যঞ্জনধ্বনিকে ভিড়ের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। ছন্দের দ্বিচারণে স্পষ্ট হয়ে ওঠে কবির দ্বিধা। সমিল প্রবহমান পয়ার ছন্দে কাহিনী-ধারা চলতে চলতে পুরনো আট-ছয়ের চালে আরাম পেতে চেয়েছে। তখনই স্পষ্ট হয়ে উঠল

এই সত্য —যে ছন্দে 'মেঘদূত', 'অহল্যার প্রতি', 'মানসসুন্দরী' বলা চলে সেই ছন্দে রূপকথা অচল।

অপরদিকে শব্দের অনুষংগ সৃজনী ক্ষমতা যদি কোনো কারণে ব্যাহত হয় তাহলে কবিতার আর্থ-অবয়বেরও ক্ষতি ঘটে। বলাকার ২২ সংখ্যক কবিতা (যখন আমায় হাতে ধরে/আদর করে······) এ বিষয়ে উত্তম সাক্ষ্য। কবিতাটির এই অংশে :

আমি যে সেই বৈশাখী মেঘ বাঁধনছাড়া
ঝড় তাহারে দিল তাড়া ;
সন্ধ্যারবির স্বর্ণকিরীট ফেলে দিল অস্তপারে,
বজ্রমানিক দুলিয়ে নিল গলার হারে ;

স্বর্ণকিরীট অবশ্যই রাজার ভাবানুষংগ বহন করে। কবিতায়, নাটকে রবীন্দ্রনাথের রাজা রাজবৈরাগীরই প্রতীক। এখানে মেঘের পক্ষে রাজবৈরাগীর মতো স্বর্ণকিরীট বিসর্জন প্রত্যাশিত। কিন্তু উদ্ধৃত অংশের দ্বিতীয় চরণের 'তাড়া', 'বাঁধনছাড়া' মেঘকে তাড়না করেছে বা তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে এমন অর্থের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। এই দ্রুত ব্যস্ততার ফলে মেঘ কিরীট-বিসর্জী রাজমহিমার ধীর লয় থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এবারে কিন্তু সেই ছড়ার ছন্দই রাজার সেই বৈরাগ্যবাসনাকে ঘন এবং তীব্র হতে দিল না। আসলে বলাকায় রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব রাজা-কল্পনা কাব্যের ভাবভিত্তির কাছ থেকে কোনো আনুকূল্য পায় নি। ২৭ সংখ্যক কবিতায় যে রাজা খাজনা তলব করেন, তিনিও না হতে পারলেন উপযুক্ত পরিমাণে নিষ্ঠুর, না হতে পারলেন অনিবার্য। বলাকার ভাববৃত্তের প্রধানাংশে রয়েছে আধুনিক মানুষ। তার সংগে কবির এতকালের লালিত, পোষিত, রাজানুষংগের মিল দুরূহ।

রবীন্দ্র-পাঠক জানেন যে কবিতায়-গানে রবীন্দ্রনাথের রাজা, অতিথি, দস্যু, বর, ঝড় ইত্যাদি আকারত পৃথক হলেও প্রকারত একই ভাবানুষংগের স্রষ্টা। কেমন করে প্রসংগগুলি কবিকল্পনার প্রসাদ পেয়ে দ্বিতীয়ার্থের ছায়াকে প্রগাঢ় করে তোলে তা যথাস্থানে আলোচিত হবে। এখানে শুধু একটি বিষয় উল্লেখ্য। অচরিতার্থতার বোধ আধুনিক ব্যক্তির অপরিহরণীয় নিয়তির করচিহ্ন। সেই বিশূন্য বন্ধ্যা বিরসতার প্রতিমুখে অন্ধকারের গর্ভ থেকে জাত হল এক রাজা-কল্পনা, এরই গৌণ রূপে থাকল দস্যু-কল্পনা। তাৎপর্য একই—'ভেঙে চুরে দেয় চিরাভ্যাসের মেলা'। এই দস্যু-কল্পনার নানা উজ্জ্বলতার মাঝে একস্থানে একটি কবিতা সচেতন পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। কবিতাটি পরিশেষ কাব্যগ্রন্থের 'সুসময়'। ঝড় এখানে দস্যু :

বৈশাখী ঝড় যতই আঘাত হানে
সন্ধ্যা সোনার ভাণ্ডারম্বার পানে,
দস্যুর বেশে যতই করে সে দাবি
কুণ্ঠিত মেঘ হারায় সোনার চাবি
গগন সঘন অবগুন্ঠন টানে।

এ দস্যু কবির প্রিয়তম দস্যু নয়। মূল্যহীনকে সোনা করার পরশপাথর তার হাতে নেই। এক কথায় কবির স্বহস্তপ্রদত্ত ভাবানুষঙ্গের কিছুই এ দস্যুর সংগে জড়িত নয়। পরন্তু অলক্ষ্যে এ রবীন্দ্রনাথের এক তীক্ষ্ম গল্পের নিষ্ঠুর অংশকে মনে পড়িয়ে দিচ্ছে। মানভঞ্জন গল্পে গিরিবালার স্বামী চাবির জন্য যে অহৃদয় ইতর আচরণ করেছিল, এখানে বৈশাখী ঝড়ের আচরণের সঙ্গে তার মিল আছে ঃ

"গোপী বলিল, 'দিবে না বৈ কি! কেমন না দাও দেখিব।' বলিয়া সে গিরিবালার আঁচলে দেখিল চাবি নাই। ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া তাহার আয়নার বাক্সর দেরাজ খুলিয়া দেখিল, তাহার মধ্যে চাবি নাই। তাহার চুল বাঁধিবার বাক্স জোর করিয়া ভাঙিয়া খুলিল, তাহাতে কাজললতা, সিঁদুরের কৌটা, চুলের দড়ি প্রভৃতি বিচিত্র উপকরণ আছে—চাবি নাই। তখন সে বিছানা ঘাঁটিয়া গদি উঠাইয়া, আলমারি ভাঙিয়া নাস্তানাবুদ করিয়া তুলিল।

গিরিবালা প্রস্তরমূর্তির মতো শক্ত হইয়া দরজা ধরিয়া ছাদের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।"

মানভঞ্জন গল্পের শেষে গোপী যেমন গিরিবালার জীবনে অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেল, এ কবিতার বৈশাখী ঝড়ও তেমনি কবিতার পরবর্তী স্তবকে লক্ষ্মীছাড়া হয়ে নিরুদ্দেশ। কিন্তু কবিতাটি জীবন্ত হল না। এখানে কল্পনার এমন শক্তি নেই যার সাহায্যে কবি ঝড় বা দস্যুর সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্য-প্রদত্ত অনুষঙ্গকে উপেক্ষা করে এই কবিতার ইতর দস্যুর অনুষঙ্গকে রসসিদ্ধি দিতে পারেন। সুতরাং পৃথক চিত্রকল্প হিসাবে এটি চমৎকার হলেও ব্যর্থতা একে স্পর্শ করেছে, তাই শেষ চরণটি ক্লিশে, শুধু ছকা কথা।

দুই

কবিতার শাব্দ বিন্যাসে ফুটে ওঠে রেখা, গাঢ় হয় রঙ, জাগে উচ্চাবচতার লাবণ্য। কোনো নারীর রূপপ্রসাধনের সংগে এ তুলনীয় নয়। হলে, তাকেই বলতাম রীতিবাদিতা। এর সংগে বরং তুলনীয় কোনো পূর্ণাঙ্গ

নারী। তখনই জানি এ শুধু সাবয়ব নয়, এ স্বয়ংসিদ্ধাও বটে। তখনই আর্থ-বিন্যাসেও আসে অনির্বচনীয়ের সংকেত। তখন ব্রজবুলির মতো কৃত্রিম ভাষাতেও কবিতা কালকে জয় করে। রায়শেখরের বিখ্যাত 'সখি হামারি দুখের নাহি ওর' পদটির কাব্যার্থের প্রাণবত্তা আজও প্রশ্নাতীত। দ্বিতীয় চরণের তৃতীয় পদটিতে সমগ্রার্থের বিপুল উদ্ভাসন—শূন্য মন্দির মোর। তৃতীয় চরণে মেঘগর্জিত আকাশের বর্ণনায় 'ঝম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া'—সাধারণ ছেকানুপ্রাসের নিদর্শন মাত্র নয়। পুঞ্জীভূত যুক্ত-ব্যঞ্জনের সমারোহ বর্ষা-প্রকৃতির পূর্ণতার স্তননের ও সমারোহের প্রতিধ্বনি ও প্রতিচ্ছবি। এই বাইরের পূর্ণতার মাঝখানেই দ্বিতীয় চরণের ঐ সংক্ষিপ্ত পদটি অনিদ্রিত—শূন্য মন্দির মোর। অধিকাংশ চরণের শেষে 'আ'-স্বরধ্বনি এক তীব্র আর্তির স্মারক। 'নথিব বিজুরিক পাঁতিয়া'—নায়িকার আশা-আশঙ্কায় জাগর হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি। 'কৈছে নিরবহ হরি বিনে ইহ রাতিয়া'—ঠিক তার পরেই চরম নৈঃসঙ্গ্যের নিরাশ্বাস বেদনা। অথচ আপাত-বিচারে এ ভাষা কৃত্রিম। কিন্তু তখনই আমরা বুঝি যে কবিতায় কৃত্রিম ভাষা বা অকৃত্রিম ভাষা বলে কিছু নেই, আছে শুধু কবিতার ভাষা। সে ভাষারও একমাত্র অভিজ্ঞান exactness বা কাব্যিক যথাযথতা।

ক্যাপটেন কুক্ সতের শো তিয়াত্তর খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ মেরু অভিযাত্রায় গিয়েছিলেন। তিনি প্রথম দেখেছিলেন মেরুসাগরের দিনগুলি কুহেলী-মলিন—ভাসন্ত বিশাল বরফখণ্ড সহসা উল্টে যাচ্ছে, সশব্দে ফেটে যাচ্ছে। এ সবের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আছে কুকের জার্নালে। সতের শো আটানব্বই সালে কোলরিজের এনশ্যেন্ট মেরিনার প্রকাশিত হল। কুকের জার্নাল কোলরিজ কি পড়েছিলেন? কে জানে? কিন্তু কোলরিজ যখন বলেন:

> The ice was here, the ice was there
> The ice was all around :
> It crack'd and growl'd and roar'd and howl'd
> Like noises in a swound—

তখন সহজে অবিশ্বাস করা যাবে না যে কোলরিজ কুকের বিবরণী পড়েন নি। কিন্তু যদি পড়েই থাকেন, তাতে কী এল গেল? কুক্ কোথায় পাবেন উদ্ধৃত অংশের তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তির যথার্থতা (exactness) যা শুধু কাব্যেরই অধিগত, কোথায় পাবেন সেই শ্রুতি এবং দৃষ্টির সম্ভোগের বিচিত্র আয়োজন?

কবিতায়, বিশেষত যে কবিতা ব্যক্তিগত এবং আত্মজা, কবি অভিজ্ঞতার সহায়তায় আবেগের ওঠাপড়াকে সাজিয়ে তোলেন, গুছিয়ে নেন। কবিতার

সেই গূঢ় আলাপে বিশেষণ যেমন আবেগের ক্রমপরিণামী স্তরগুলিকে স্পষ্টতা দেয়, ক্রিয়া তেমনি কল্পনার পরিধিকে দেয় বিস্তৃতি। দুইই যেখানে একত্র সেখানে বাস্তবতার সেই অনাবৃতপূর্ব স্বরূপটি ধরা পড়ে, যা আধুনিক কবির জটিল জগতের সংকেতবহ। April is the cruellest month, breeding Lilacs out of the dead land...এই উক্তিতে cruellest এই বিশেষণ ও breeding ক্রিয়া একত্রে যে গূঢ়কে ব্যঞ্জিত করে তুলল, তা প্রকৃতপক্ষে কবির অভিজ্ঞতার দান। পক্ষান্তরে "বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে—" এই পদে এমনই এক গূঢ় ব্যঞ্জনাকে ধরিয়ে দিতে গিয়েও কবি দিলেন না। তা হয়ে থাকল শুধু এক কাব্যিক ভাবুকতা।

'সোনার তরী' এবং 'নিরুদ্দেশযাত্রা' কবিতা দুটির রসসিদ্ধির প্রসঙ্গে দুই কবিতার অন্তর্গত গাঠনিক বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে আলোচ্য। শাব্দ অবয়ব এবং আর্থ অবয়বের যে নিবিড় সম্বন্ধপাতে কাব্যাত্মা কান্তিমান, এই দুটি কবিতাতেই তার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। 'সোনার তরী' কবিতাটিতে কৃষক এবং মাঝির এতদ্দেশীয় নিত্যসম্পর্ক থেকে নিষ্কাশিত হয়েছে এক জীবনার্থ—যাকে নিয়ে ব্যাখ্যার অন্ত নেই। কিন্তু কবিতাটির ভাবে একটি নাটকীয় গতি না থাকলে এ জীবনার্থ ব্যঞ্জিত হতে পারতো না। কৃষকের প্রত্যাশা অন্তত একবার চরিতার্থতার সীমাকে ছুঁয়েছে—'যত চাও তত লও তরণী পরে' এই স্তবকে। কৃষকের চাওয়া-পাওয়ার দুঃসহ জীবনে এই হল সৌভাগ্যের তুঙ্গ মুহূর্ত—মেঘাবৃত অন্ধকারে ক্ষণায়ু রবিরশ্মি। এই তুঙ্গ মুহূর্তের পরেই catastrophe নেমে এসেছে দ্বিগুণিত তীব্রতায়। শেষ স্তবকে 'শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি' এই তীব্রতার চূড়ান্ত লগ্ন। এই কৃষকের মানবিক পূর্ণতায় কোন খাদ নেই। প্রথম স্তবকে 'রাশি রাশি ভারা ভারা' যেমন তার গাণিতিক বৈশ্যসিদ্ধির নিদর্শন—পঞ্চম স্তবকের 'থরে বিথরে' তেমনি গাণিতিকতা-মুক্ত রসানন্দময় মানসতায় উত্তরণের নিদর্শন। কিন্তু এ আনন্দের ধর্মই এই যে, একে যে সন্ধান করে সে বিনিময়ে অসামান্য বেদনায় বিদ্ধ হবে। সহজাত অথচ পুনর্লব্ধ সেই নৈঃসঙ্গ্যই পরিণত মানুষের পরম অভিজ্ঞান।

কবিতাটি জ্যাবদ্ধ ধনুর মতো শরসন্ধানী নয়—সংহততন্ত্রী বীণার মতো সুর-সঞ্চারিণী। এর স্তবকে স্তবকে কয়েকটি সুনির্বাচিত বিশেষণে সূচিত হয়েছে বচনের শেষ সীমা—তারা আলোর ঝরোকা খুলে দেয় আচম্বিতে। সব ঝরোকাগুলি খোলা হলে মন ভরে যায় আলোয়। নদীর বিশেষণ 'খরপরশা' জলের বিশেষণ 'বাঁকা'—সেখানে ঢেউগুলি 'নিরুপায়'। শ্রদ্ধেয় বুদ্ধদেব বসু 'কবি রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে বলেছিলেন যে মিলের খাতিরেই ঢেউগুলি নিরুপায়

হয়েছে। একথা মানলে অনেকখানি কবিতা হারিয়ে যায়। নিয়তির মতো নাবিকের নিষ্ঠুরতার বা উদাসীনতার কাছে এই করুণ কৃষক পরিশেষে ত্যক্ত হবে এক অনুপায় শূন্যতায়। তৃতীয় স্তবকে নাবিকের প্রথম আবির্ভাবে 'ঢেউগুলি নিরুপায় ভাঙে দুধারে'—শেষ স্তবকের করুণ মিনতি ও কঠিন প্রত্যাখ্যানের পূর্বচ্ছবি। সে যেন অদৃষ্টের মতোই নির্বিকার, জড়প্রকৃতি ঢেউ, এবং মানুষ-কৃষক, কারো প্রতি তার কোন মমতা নেই। বাঁকাজল, নিরুপায় ঢেউ, সকালের মেঘার্ততা—সব মিলিয়ে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে এক অর্থময়তা—যা কবিতার শব্দে নেই, অর্থে নেই। তা শুধু এ দুয়ের সহযোগিতা-সম্ভব।

নিরুদ্দেশ যাত্রা কবিতায় আর্থ অবয়ব গড়ে উঠেছে অনুভূতির উচ্চাবচতায়, ভাবের অনিবার্যতায়। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি স্তবকে একটির পর একটি সোপান পেরিয়ে আমরা পৌঁছে যাই শেষ স্তবকের অনিবার্য অন্ধকারে। প্রথম স্তবকে প্রশ্ন, দ্বিতীয় স্তবকে আশা, তৃতীয় স্তবকে আশংকা, চতুর্থ স্তবকে আশার স্মৃতি, পঞ্চম স্তবকে আশা-আশঙ্কার খর অনুভব, ষষ্ঠ ও শেষ স্তবকে অনিবার্য অন্ধকার। প্রথম পাঁচটি স্তবকে সেই নারীর দেহ বা দেহসম্বন্ধীয় কিছুরই উল্লেখ নেই। আছে শুধু নীরব হাসির বাঙ্ময়তা। শেষতম স্তবকে এল দেহের ঘ্রাণ, চুলের স্পর্শ—হারিয়ে গেল সেই হাসি। অনেক তরংগের মাঝখানে যা ছিল একমাত্র সম্বল তা হারিয়ে যাবার আশংকাতেই আমরা বুঝলাম যে হাসি শুধু হাসিটুকুই নয়। তখনই নিবিড় অন্ধকার অতলান্ত বলে মনে হল। এই আর্থ অবয়ব এক অর্থাতিরিক্তের দোলা পাচ্ছে কবিতাটির শব্দ-তরংগের ঘাতে ঘাতে। লক্ষণীয় এই কবিতার বিস্ময়কর ক্রিয়াপদগুলি। 'অকূল' সিন্ধু উঠিছে আকুলি'—কবিতার মূল আকুলতাকে প্রথম স্তবকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে। 'ঝলিতেছে জল তরল অনল'—পরের স্তবকের এই চিত্রকল্পটি জীবন পেল 'ঝলিতেছে' ক্রিয়ার স্পর্শে। আর সেই স্পর্শই বিস্ময় সৃষ্টি করল 'গলিয়া পড়িছে অম্বরতল' এই পরের চরণে। 'গলিয়া পড়িছে' শুধু বাক্যের ক্রিয়া নয়; কল্পনার ক্রিয়া। কিন্তু এই ক্রিয়াত্মক কল্পনা চূড়ায় পৌঁছল কবিতার তৃতীয় স্তবকে—'অসীম রোদন জগৎ প্লাবিয়া দুলিছে যেন'। 'রোদনের' সংগে 'দুলিছে' ক্রিয়াপদের যোগ একমাত্র এই কবিতাতেই সম্ভব হল। যখন সম্ভব হল তখন একবারও একথা মনে হল না অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। বরঞ্চ মনে হল এমন স্বাভাবিক অথচ অব্যর্থ কথা আমরা এর আগে শুনিনি কেন। 'সোনার তরী'তে অভিনব বিশেষণ প্রয়োগ—'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় অভিনব ক্রিয়া-উদ্ভাবন—কাব্যগ্রন্থটির দুই প্রান্তের দুটি কবিতায় দুই পৃথক বাণীসিদ্ধির নিদর্শন। পূরবীর 'শেষ বসন্ত' কবিতাটিতেও স্তবকের পাপড়ি-

গুলি একটি সংহত কল্পনার চারিপাশে ঘনবদ্ধ। প্রস্তাব, প্রস্তাবের হেতু, আশ্বাস, মিনতি, প্রতিশ্রুতি, শেষ বিদায় ও সান্ত্বনা—এই সাতটি মুহূর্ত শেষ বসন্তের প্রার্থনাকে ঘিরে মুঞ্জরিত। এক-একটি স্তবকে সাতটি চরণ। কবিতাটিতে নায়কের প্রস্তাবের সকল কারুণ্য শান্ত সংযমে বাঁধা। এমন কি ষষ্ঠ স্তবকের চূড়ান্ত মুহূর্তেও তা অশান্ত হয়ে ওঠেনি। শুধু নিরাশ্বাস বেদনার অন্তহীনতার দিকে অঙ্গুলি সংকেত করা হল সময়ের উল্লেখে—'নীড়ে ফেরা পাখি যবে অস্ফুট কাকলিরবে দিনান্তেরে ক্ষুব্ধ করি তোলে'। 'ক্ষুব্ধ করি তোলে' বহুব্যঞ্জক ক্রিয়া। তখনই 'ঝরাপাতা দলে' নায়িকার চলে যাবার তাৎপর্যটিও মূর্ত হল। এক সমাসন্ন অনির্দেশ্য স্তব্ধতার প্রাক্কালে দুটি ছোট শব্দের কল্পনা—দ্রুত পায়ে শুকনো পাতা ভেঙে চলে যাবার শব্দ, রাত্রির আগে পাখিদের আকাশ-হারানোর অস্ফুট কান্নার শব্দ। কবিতাটি এখানেই শেষ হতে পারত। এই অনিবার্য ভবিতব্যের সম্মুখেই নায়কের মূর্তি স্তব্ধ থাকুক এমনটি আমরা চাই বলেই শেষতম স্তবকের সান্ত্বনা বাহুল্য মনে হয়।

শব্দের সঙ্গীতে আর্থ অবয়বে আসে অর্থাতিরিক্তের দোলা, আবার অর্থের ইঙ্গিতে শাব্দ অবয়বে আসে বিচিত্রের আভাস। 'চৈত্র মাসে শুক্ল নিশা / জুঁহি বেলির গন্ধে মিশা / জলের ধ্বনি তটের কোলে কোলে / বিচিত্রা হে বিচিত্রা / অনিদ্রারে আকুল করি তোলে'—'জুঁহি' হিন্দি শব্দটি সরিয়ে বাংলা জুঁইকে বসালে শব্দের সঙ্গীত হারিয়ে যায়, এবং অর্থও অক্ষুণ্ণ থাকে না। 'জুঁহি' শব্দের মহাপ্রাণবর্ণে সঞ্চারিত রয়েছে অনিদ্র শুক্ল রাতের অব্যক্ত বেদনা। জুঁই শব্দে এখনো কোনো কবি সে অর্থানুষঙ্গ সৃষ্টি করেন নি। 'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুঁণে মন ভোর। প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর' জ্ঞানদাসের এই বিখ্যাত পদে 'ঝুরে' এবং 'কান্দে' এই ক্রিয়া দুটির শব্দার্থে বিশেষ পার্থক্য নেই। কিন্তু এই ক্রিয়া দুটির স্থান-পরিবর্তনে কবিতাটি রসাতলে যাবার আশংকা বেশি। জীবনানন্দের 'আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই —নুয়ে আছে নদীর এপারে। বিয়োবার দেরি নাই—রূপ ঝরে পড়ে তার'— এখানে 'বিয়োবার' ক্রিয়াপদটি ব্যবহৃত হয়েছে উচ্চাঙ্গের কবিত্ব-সম্ভব সন্তর্পিত সতর্কতায়। 'দেখে-লই'-এর পরিবর্তে কবি যদি চলতি ক্রিয়া 'দেখে নিই' প্রয়োগ করতেন তাহলে 'বিয়োবার' হত অশালীন উক্তি। 'দেখে লই' বলার ফলে ব্যাপারটিতে ঋজু প্রখরতা কমে গেল—এল এক স্তিমিত নিস্পৃহতা— তখনই মূল লক্ষ্য হল 'রূপ ঝরে পড়ে তার'। তখনই কবি সময়ের হাতে যে ক্ষয়ের কথা বলতে চাইছেন তা দাঁড়াতে পারল।

তিন

বিশেষত যে কবিতায় আধুনিক ব্যক্তির নিভৃত জটিলতার প্রতিফলন, যে কবিতা একজনের একান্ত অভিজ্ঞতারই স্মারক, সে কবিতায় শব্দপুঞ্জের স্বয়ংনির্ভরতা বিস্ময়কর। Emily Dickinson-এর একটি কবিতা The last night that she lived···স্মরণীয়। It was a common night, except the dying—কিন্তু তার পরেই কবি বলছেন ঃ

We noticed smallest things—
Things overlooked before,
By this great light upon our minds
Italicized, as 't were.

Italicized শব্দটির অভাবিতপূর্ব ব্যঞ্জনা শুধু এই কবিতাতেই সম্ভব। অথচ যিনি এই শান্ত বিষণ্ণ কবির জীবনকথা জানেন তিনি আন্দাজ করেন, এই নারী কবি নিজের জীবন নিংড়ে শব্দটি নিষ্কাশন করেছেন এবং সে জীবন-কথা না জানলেও ক্ষতি নেই, Italicized নিজেই কবিতাটিতে স্বরাট হয়ে বিরাজিত। কবিতাটির শেষতম স্তবকটির ভাষায় সামান্য ও অসামান্য এক হয়ে গেছে ঃ

And we placed the hair;
And drew the head erect
And then an awful leisure was,
Our faith to regulate.

Our faith to regulate নিঃসন্দেহে অসামান্য কাব্যোক্তি। পূর্ব চরণের leisure-এর বিশেষণ awful শেষতম চরণের to regulate এই ক্রিয়াকে দিয়েছে উদাসীন মহাকালকে স্পর্শ করার ক্ষমতা। এ ভাষা নিভৃত অনুভূতির জগতের ভাষা। সংশয় এবং অসংশয় এখানে একীভূত।

একালের এক তরুণ বাঙালী কবির একটি কবিতা এই প্রসঙ্গে গোটা উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করা গেল না।

চাঞ্চল্য, তোমাকে আমি রাত-ভিতে স্তব্ধ বাগানের
মাটির গভীরে, নিচে রেখে আসি
দিই এক টুকরো কানি, রুক্ষরা এবং পেয় জল
চাঞ্চল্য, তোমাকে আমি বাগানের নখ, শিকড়ের
পাহারায় রেখে আসি, কারাগারে ফাটকে, পুলিশে ··

তালকানা বাদুড় জানে আর কিছু জোনাকি নবীন
তদন্তকারীর মতো জেনে যায়—সন্দেহও করে
কেন আসি, নিজেকে না ঢেকে রেখে, চাঞ্চল্য কবর দিই রাতে ?

বাদুড় গায়ের কালি ঢেলে দেয় রাত্রিকে সাজাতে
মনে হয়, কাজে আর চিন্তনে ঘটেছে ঘোর ভুল
চাঞ্চল্যের হাত থেকে ছাড়া পেতে মিথ্যে বাঁচিয়েছি
নিজেকে, সহজ ছিলো যার সবই ত্যাগ ক'রে যাওয়া ।।

(চাঞ্চল্য, তোমাকে আমি/শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

কবিতাটি পড়া শেষ হ'লে অর্ধরাত্রির ঝিল্লিস্বর শুনতে পাওয়া যায়। চাঞ্চল্যের উদ্দেশ্যে লিখিত একথা স্তব্ধতার কবিতা। প্রথম পংক্তির 'রাত-ভিতে' উচ্চারিত হবার সংগে সংগে সেই স্তব্ধতা সংক্রামিত হতে থাকে। বাগানে ফুলের গন্ধ সংগ্রহ হয়, কিন্তু তার চেয়েও নিষ্ঠুর কাজ ঘটতে পারে। তালকানা বাদুড় আর নবীন তদন্তকারীর মতো জোনাকি সেই চাঞ্চল্যকে কবর দেবার অনির্ণেয় হেতুকে আরও রহস্যঘন করে তুলল। তা স্তব্ধতাকে করে তুলল প্রায় স্পর্শ-গ্রাহ্য। এ ভাষা নির্জনতার এবং নৈঃসঙ্গ্যের। অথচ 'চাঞ্চল্য, তোমাকে আমি বাগানের নখ, শিকড়ের পাহারায় রেখে আসি, কারাগারে ফাটকে, পুলিশে…' এই অংশের উপাদান সংগৃহীত হল বাংলাদেশের প্রত্যহের অভিজ্ঞতা থেকে। এই অংশটি কবিতায় এসেই আনমনে চলে গিয়েছে। ভালোই হয়েছে সে বেশীক্ষণ থাকে নি। থাকলে, গায়ের কালি ঢেলে বাদুড়ের রাত্রি সাজানোর গা ছমছমে পরিবেশ এক কথায় জমে উঠত না। নৈতিক ব্যাখ্যাটি ব্যর্থ হত।

একালের কবির কাছে শব্দ শুধু বাক্যকে সম্পূর্ণ করার উপাদান নয়। শব্দের ভিতরেই রয়েছে কবির ভাবনার অভিজ্ঞান। শব্দেরা মৃত—কবিই তাকে উজ্জীবিত করেন, তখন সেই জীবন্ত শব্দেরা হয় মান্ত্রিক। কবি শব্দকে খুঁজতে গিয়ে নিজের অভিজ্ঞতাকে, স্মৃতিকে অস্তিত্বের স্তরগুলিকেই খোঁজেন। তাই এক-একটি শব্দের ভিতরে কবির সমগ্র সত্তার আলোড়নকে, সংক্ষোভ এবং শান্তিকে সংহত করে তোলাই কবির লক্ষ্য। জীবনানন্দ যখন বলেন, "ভালোবেসে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে" এবং যখন বলেন ঃ

'নারী, তুমি সকালের জল উজ্জ্বলতা ছাড়া পৃথিবীর কোনো নদীকেই
বিকেলে অপর ঢেউয়ে খরশান হতে
দিতে ভুলে গিয়েছিলে ;'

অথবা যখন বলেন ঃ

'কোথাকার মহিলা সে? কবেকার? ভারতী নর্ডিক গ্রীক মুশিলম মার্কিন?'
—তখন 'মেয়েমানুষ' 'নারী' এবং মহিলা' এই তিনটি শব্দ তিনগুচ্ছ অনুষঙ্গকে বহন করে। শব্দের সেই গূঢ় ক্ষমতাকে আবিষ্কার করা, সৃষ্টি করা এবং কাজে লাগানোই কবির লক্ষ্য। শব্দের সেই শক্তিকে না ব্যবহার করলে কবির যা প্রধান উদ্দেশ্য, বিশেষত আজকের কবির, সভ্যতার নিয়তিকে ব্যাখ্যা, তা করা যাবে না। সময়, ক্ষয়, ব্যর্থতা, অনন্বয় এসবের মুখোমুখি হয়েছেন কবি। কবিই শিখিয়েছেন ভাষাই অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞান।

সেই উনিশ শো তেতাল্লিশে দময়ন্তী'র পরিশিষ্টে বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন, 'পদ্য অথচ গদ্যকবিতার মতো মৌখিক ভাষায় গঠিত, বাংলা পদ্যের নতুন পরিণতি বোধ হয় এক দিকেই।' কবিতার অন্বিষ্ট মুক্তির গতিপথ নির্ণয়ে কবিসমালোচকের এই উক্তির যাথার্থ্যে কোনো সন্দেহই নেই। বাংলা কবিতা আধুনিক হতে গিয়ে কাব্যিকতার হাত ছাড়িয়ে নেবার জন্য কী করবে, কী করবে না, বুদ্ধদেব সে বিষয়ে কিছু ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন। বাক্‌রীতির সঙ্গে কাব্যরীতির মিলন ছিল লক্ষ্য, তাই পুরনো বাক্‌রীতির অতি ব্যবহৃত জীর্ণতা পরিহৃত হতে চেয়েছে। এ কাজের সিদ্ধি খুঁজতে গিয়েই পয়ারকে দিতে হ'ল প্রশ্রয়, কেননা সেই-ই পারে অপরূপ গুরুচণ্ডালীকে নিজ পরিসরে মানিয়ে নিতে। কিন্তু মৌখিক ক্রিয়ার অপরিহার্যতায় যে বাক্‌ছন্দ জীবনানন্দ তো বহুক্ষেত্রে তাকে বর্জন করেই আধুনিক মানুষের জটিল নৈঃসঙ্গ্যকে মূর্ত করে তুললেন। স্মরণীয় 'বনলতা সেন' কবিতাটি। বিষ্ণু দে চোরাবালি কবিতায় 'প্রিয়তম মোর' লিখেও থেকে গেলেন অগ্রণী আধুনিক কবি। তখন আর একবার জানা গেল কবিতার ভাষা কবির ভাষা নয়—কবিতারই ভাষা। ভাবজ স্বাধীনতাই তার প্রধান শক্তি। সেই শক্তিই ভাষাকে দেয় বর্ণ, বর্ণকে সংহত করে চিত্রে, দেয় ধ্বনি, ধ্বনিকে মূর্তি দেয় শ্রাব্যকল্পে।

আধুনিক বাংলা কবিতার ভাষা

"রিপন তখনো সুরেন্দ্রনাথ হয়নি" অথবা "শান্তিপুরে না, কৃষ্ণনগরে যাব, তাহলে কলকাতা পৌঁছতে দেরি হবে না"—আজকের শ্রোতার কাছে এসব বাক্যের অর্থ এই কারণেই সহজবোধ্য যে, শ্রোতা এবং বক্তার স্থান-কালের ঐক্যই এসব বাক্যের অর্থ নির্ণয়ে সাহায্য করে। বেশী পিছনে যেতে হবে না, উনিশশো পঁয়তাল্লিশেও প্রথম বাক্যটির জন্ম হয়নি। আঠারোশ' সত্তরেও দ্বিতীয় বাক্যটি ছিল বোধাতীত এক অসম্ভবতার ওপারে। সে সব দিনের কোনো মানুষ যদি এসব বাক্য শোনেন তাহলে এ মন্তব্য অবশ্যম্ভাবী—'একালের মানুষের কথার কোনো মানে হয় না।' আধুনিক কবিতার ভাষা বোঝা যায় না—এই অভিযোগের মূলেও কতকটা এই জাতীয় ব্যাপার রয়েছে। মানসিকতায় যিনি তাঁর যুগের বা সময়ের বাসিন্দা নন, তিনি আজকের কবিতার ভাষাকে ন্যায়তই দুর্বোধ্য বলবেন। একালের কবিতা-সংক্রান্ত তিন-খানি বই আমার সামনে রয়েছে, প্রত্যেকটিরই প্রারম্ভিক আলোচনায় আধুনিক কবিতার ভাষায় দুর্বোধ্যতার বিষয়টি সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। এ আলোচনায় প্রতিক্ষেত্রেই না হলেও প্রধান প্রধান ক্ষেত্রে কবিদের সময়-সচেতনতার প্রশ্নটি উঠেছে। কবি তাঁর সময়ের মুখপত্র নন, মুখপাত্র। তাই, যিনি কবি তাঁর, একমাত্র তাঁরই, কোনো বধিরতা নেই—নেই বলে তিনিই পারেন সাড়া দিতে সময়ের উঁচু নীচু, সর্বজনীন ব্যক্তিগত, সকল প্রকারের স্পন্দনে। তাঁর সময়ের পটে তিনিই সবচেয়ে জীবন্ত, সবচেয়ে সজাগ। আর সকল সামাজিকের মধ্যে কবির বিশিষ্টতা অন্য একটি কারণে চিরকালই প্রতিষ্ঠিত—সেটি হল কবির সত্যাগ্রহ এবং শব্দাগ্রহ অবিচ্ছেদ্য। সকল সজাগ ব্যক্তিই নিজ নিজ অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সচেতন—কবির স্বাতন্ত্র্য এইখানে যে, তাঁর এই সচেতনতা বা অবধানতাই তাঁর প্রকাশমাধ্যম, তথা তাঁর ভাষা সম্বন্ধে সচেতনতা। একথা বলা যায় যে কবিতার ভাষা কবির অভিজ্ঞতারই ভাষা।[১]

অবশ্য অভিজ্ঞতার কোন. তর-তম-বিচার সম্ভব নয়। কেউ বলতে পারে না অভিজ্ঞতার কোথায় আরম্ভ, কোথায় বা শেষ, অভিজ্ঞতার পরিমাণ বা আয়তন নিয়েও কোনো বিতর্ক চলে না। একমাত্র বিতর্ক চলে, অন্ততঃ

১. দ্রষ্টব্য F. R. Leavis-এর New Bearings in English Poetry গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধটি। Leavis-এর মতো এমন কথা এমন করে একালে কে বলছেন—if the poetry and the intelligence of the age lose touch with each other, poetry will cease to matter much, and the age will be lacking in finer awareness.

চলেছিল—কোন্ অভিজ্ঞতা কাব্যবহ, কোন্ অভিজ্ঞতা নয়। ওয়ার্ডসওয়ার্থ কোলরিজ অথবা রবীন্দ্রনাথ, পরস্পরের মধ্যে সচেতন পার্থক্য রচনা করেও কাব্যিক অভিজ্ঞতার আভিজাত্য-বিষয়ে ছিলেন সজাগ। ওয়ার্ডসওয়ার্থ যখন বলেছেন grandeur of imagination, কোলরিজ যখন বলেন grandeur of its subject এবং রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন, "ভাত-কাপড় ছাতা-জুতা আমাদের মনে সৌন্দর্যের পুলক সঞ্চার করে না। কিন্তু লক্ষ্মণ রামের সঙ্গে সঙ্গে বনে গেলেন—এই সংবাদে আমাদের মনের মধ্যে বীণার তারে যেন একটা সংগীত বাজাইয়া তোলে—" (সৌন্দর্যবোধ/সাহিত্য)—তখন ক্লিন্‌থ ব্রুক্‌সকে অনুসরণ করেই বলতে ইচ্ছে করে যে, এরা সব এক গোত্রের রসদৃষ্টি।[২] আধুনিক কবিতার ভাষা-রহস্য ব্যাখ্যায় যে কথা প্রথমেই স্মরণীয় তা হল, সপ্তদশ-শতাব্দীর মেটাফিজিক্যাল কবিদের মতোই আধুনিকতা-বাদীদের কাছেও স্বতঃই কাব্যিক বিষয় বলে কিছু নেই, অকাব্যিক বিষয় বলেও কিছু নেই। মেধা বা মননের সঙ্গে আবেগের বৈরিতাকেও তাঁরা স্বীকৃতি দিলেন না। তাঁদের ভাষারও প্রথম বৈশিষ্ট্য ও দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য রচিত হয়েছে এই কাব্যিক ও অকাব্যিকের সীমা ভেঙ্গে ভেঙ্গে।

দুই

স্বীকৃতি দিলেন না, কেননা, যাঁদের আমরা রোম্যান্টিক কবি বলে থাকি, তাঁদের সময় থেকেই কবিতার গঠন বিন্যাসের formal logic পরিবর্জনের যে-প্রবণতা দেখা দিয়েছে, তাই আরো তীব্রতা পেল আধুনিক পর্যায়ে। ইতিহাসের সূত্রেই এ-বিষয়টিও অব্যাখ্যাত থাকে না। অস্তিত্ব এবং বিশ্বের মধ্যে অনন্বয়জনিত সংকটকে সমাহিত করতে গিয়েই ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রকৃতি-ধ্যান। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিমুক্তির চেতনাও আর এক তাৎপর্য পায় এদেশের পঙ্গু অষ্টাবক্রতা এবং সার্বিক ঔপনিবেশিক অচরিতার্থতার পটে। বাস্তব ইতিহাসে যেদিন এ বিকল্পরচনার সাধ আরো বিড়ম্বিত হল কালের প্রহারে, নানাদিক থেকে যখন মানুষের সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞার্থ মানুষের কাছেই বদলে যেতে লাগল—তখন সমস্ত পুরনো বনেদের ভাঙ্গচুরের মাঝখানে কবিতার

২. এবং অপরিহার্যভাবেই Cleanth Brooks-এর Modern Poetry and the Tradition গ্রন্থের বিশেষত ১৯৬৫তে লেখা A Retrospective Introductionটি-র কথা স্মরণ করি। এ প্রসঙ্গে C. M. Bowra র লেখা Poetry in Europe, 1900—1950 প্রবন্ধটির কথাও মনে পড়ে। এঁর এখানকার মত সর্বাংশে গ্রাহ্য মনে হয় না।

গঠন বিন্যাসের পরিচিত লজিককে আশা করাই অসম্ভব। এই সময় আজকের কবিতার texture-এ, বা বুনোনে ছাপ রেখেছে গভীর। এও অকস্মাৎ দেখা দেয়নি। এরও পূর্বসূত্র আছে কথিত রোম্যান্টিক কবিদের রচনাতেই। যাকে a-logical বা যুক্তি-নিরপেক্ষ বিন্যাস বা structure বলে তা প্রথার বিরুদ্ধে রোম্যান্টিকদের বিদ্রোহের ফল। মানুষের বিচ্ছিন্নতার ছবি রবীন্দ্রনাথের হাতে ফুটে ওঠে নতুন রেখায়। 'সোনার তরী' কবিতার প্রথম স্তবকের ছোট ছোট বাক্যের অব্যবহৃত পূর্ণচ্ছেদগুলি ফুটিয়ে তুলেছে যেন কোন প্রির‍্যাফেলাইট শিল্পীর তুলির অমোঘ টান—গগনে গরজে মেঘ। ঘন বরষা। কূলে একা বসে আছি। নাহি ভরসা। রাশি রাশি ভারা ভারা ধান কাটা হল সারা। ভরা নদী ক্ষুরধারা খর পরশা। কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা। পরের স্তবকের 'বাঁকা জল'-এই বর্ণনায় 'বাঁকা' বিশেষণটি এতই গভীরার্থদ্যোতক যে কীট্‌স-এর এই বিখ্যাত চরণের—"Thou, silent from dost tease us out of thought / As doth eternity"—'tease' শব্দটির অমেয় গুরুত্বের সঙ্গে তুলনীয়। বাক্যের এই গভীর গঠন, শব্দের এই জটিল গূঢ় হবার ক্ষমতাকে উত্তরাধিকার হিসাবে পেলেন প্রতীকী কবিরা—তা বর্তেছে আধুনিকতাবাদীদের লেখনীতে। আসলে আধুনিক কবি আর একটু এগিয়ে গেলেন—শব্দের ব্যক্তার্থ বা বিশেষাভিধানকে অক্ষুণ্ণ রেখে তার গূঢ়ার্থের যে কালগত পরিবর্তন ঘটল, তাকে আশ্চর্য সংবেদিতায় ধরে নিলেন। এই সংবেদিতাই আধুনিকতা। যাকে আমরা আপাত দৃষ্টিতে বলি বিশেষণের বেড়া ভেঙে দেওয়া, যাকে বলি বিপরীত সন্নিবেশ—এ সবই ঐ কালগত সংবেদিতায় অভিনব হয়ে উঠেছে। শেক্সপীয়রের রাজা লীয়রের 'ফুল' রিগান সম্বন্ধে যখন বলেন "Shalt see thy other daughter will use thee kindly," তখন 'kindly' শব্দটির ব্যক্তার্থ অক্ষুণ্ণ থাকেই, শুধু কথনের ঢঙে, কথাস্রোতের আভ্যন্তরীণ ঢেউয়ে শব্দটির গূঢ়ার্থ কতটা ইঙ্গিতবহ হতে পারে তার পরিচয় মেলে Steiner-এর 'Linguistics and Poetics' নামক প্রবন্ধের এই উক্তিতে—"Terrible queries and ironies lie in that little word. Is there *kindness* in our human *kind* ; what if each man deals after his own *kind* ?"[৩]

৩. ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে 'চোমস্কীর বিপ্লব' গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কাব্যতত্ত্বের ওপর এর প্রভাব পড়বে কিনা পণ্ডিতেরা ভাবছেন। কিন্তু কাব্যবোধ এই তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত থাকলে তার লাভ বই লোকসান নেই। চোমস্কীয় তত্ত্ব দুরূহ, আমার মতো লোকের পক্ষে বোঝা কঠিন। Steiner-এর **Extraterritorial** গ্রন্থে **Tongues of Men** প্রবন্ধটি দিয়ে একটা made-easy-র কাজ চলে।

কিন্তু এই পরিচিত ব্যাখ্যাদানেই Steiner সন্তুষ্ট থাকেন না, তিনি আরো বলেন—"And did Shakespeare, with his ultimate responsiveness to the manifold pointers in language, implicate the common etymological stem which makes of ***kind*** the German word for 'child' ?"—এই ultimate responsiveness-এর ক্ষমতা যাঁর থাকে, সেই কবি শব্দকে দিতে পারেন এক বিশিষ্ট গতি। আধুনিক কবির ভাষার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য সেই গতিকে কালচিহ্নে পঞ্চমমাত্রিক করে তোলা। শব্দের এই অর্জিত স্বাধীনতাও আসলে অর্জিত হয়েছে ঘটনার অভিঘাতে, সময়ের ক্রোড়ে। লীয়র-কল্পনার আলোকেই উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে বিষ্ণু দে-র 'তিনটি কান্না' কবিতার তিন নম্বর অংশটি-

"শহুরে পথে যেন সে এক প্রাকৃত দুর্যোগ—
পাগল বুঝি ? পাগল নয় মোটেই ?
প্রবল বেগে মাথা নাড়ায় ঝড়ে তালের কাতরানি
কিম্বা যেন লিয়র মাথা কোটে।"

'ঝড়ে তালের কাতরানি' আপাত বিন্যাসে বা surface structure-এ যাই হোক, deep structure-এ এই কান্নাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে দেশকালেব মর্মন্তুদ পটভূমিকায়। কিন্তু এখানে আধুনিকতার সুমুদ্রিত স্বাক্ষর ফুটেছে 'প্রাকৃত দুর্যোগ'-এ। Surface structure-এ ঝড়ের ছবির প্রসঙ্গে 'প্রাকৃত' শব্দের বিশেষাভিধান বা ব্যক্তার্থ ঠিকই কাজে লাগে—'প্রকৃতি সম্বন্ধীয়'। কিন্তু চকিত ঢেউ ওঠে এক সুগভীর গূঢ়ার্থের—'প্রাকৃত দুর্যোগ' মানে প্রজাসম্বন্ধীয় বিপর্যয়ও হতে পারে। তখনই কবিতাটির বৃদ্ধ চরিত্রটি হয়ে যায় দেশহারা লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু ভিখারীর একজন। তখনই কবিতাটি হয়ে ওঠে একালের কবিতা। এ কি শুধুই কৌশল ? একি শুধুই রীতি ?—নাকি এইভাবেই কবি ব্যক্ত করেন তাঁর উপলব্ধ পৃথিবী ? শব্দের এই বহুবার্থ-বিস্তারী শক্তি, এই বিচিত্রাধিকার আধুনিক জটিলতার প্রতিফলনের জন্যই প্রয়োজন। বিষয়টি ব্যাখ্যার জন্য বিষ্ণু দে-র 'ওফেলিয়া' কবিতার একাংশ বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

"দেবযানী। সাঁঝে তোমার প্রণাম মাঝে
ক্লিষ্ট আমার দিবসের ক্ষমা বাজে
শাপমোচনের সুরভি সুরের পাকে পাকে এই সাধনা আমার।"

সাহিত্য শিল্পের চিরন্তন জগতে নিয়ত যাতায়াতের ভিতর দিয়ে গভীরতর বিষয়-বাস্তবতার উদ্ঘাটনে, নিরাসক্ত ব্যক্তির সমীচীন জীবন-দর্শনে এই

এলিয়টীয় ভাবনা-রীতি বিষ্ণু দে-র কবিকৃতিতে পৃথক তাৎপর্য পায়। হ্যামলেট নাটকে স্তবরত ওফেলিয়াকে দেখে গ্লানি-জর্জর হ্যামলেটের বিখ্যাত উক্তি—'The fair Ophelia—Nymph—in thy orisons/Be all my sins remembered'—এখানে মাত্র পুনরাবৃত্ত হয়নি, বর্তমান শতাব্দীর বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণাকে তা সূচ্যগ্র অভিব্যক্তি দিয়েছে। আধুনিক কবিতার ভাষার জটিলতা, অথচ অব্যর্থ অভিপ্রায়কে বোঝার জন্য 'দেবযানী' শব্দটি আলোচনা করা যায়। হয়তো কবিকল্পনায় Nymph শব্দটির অভিঘাতেই 'দেবযানী' শব্দটির উদয়। Nymph শব্দের ব্যক্তার্থ এবং 'দেবযানী' শব্দের নামবাচক বিশেষ্যার্থ না ধরলে, যা সাধারণ ব্যক্তার্থ দাঁড়ায়, তাতে দুই শব্দ পরস্পরের থেকে খুব দূরে নয়। কিন্তু উৎকৃষ্ট কবিকর্ম কখনোই অর্থের এই বন্দীদশাকে প্রশ্রয় দেয় না। বিপুল বিশ্ববীক্ষার পটে অর্থকে নতুন জীবন দান সেই কবিকর্মেরই বিশিষ্ট ভূমিকা। 'দেবযানী' Nymph-কে আলগোছে ছুঁয়ে থেকেও হয়ে গেল ভারতীয় পুরাণের 'দেবযানী'—অস্তিত্বের সমস্ত প্রতিকূলতা ও বৈরিতার মাঝখানে মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রের জন্য আকুল নায়কের আশ্রয় যে-নায়িকা, সেই-ই দেবযানী। সুতরাং 'দেবযানী' শব্দের প্রয়োগে আভাসিত হল নায়কের নির্বেদ নয়, এক পজিটিভ ভূমিকা। অথচ যে-গ্লানিজর্জর জীবনের উত্তরণের অভীপ্সাও হারিয়ে যায় না 'শাপমোচন' শব্দের ইঙ্গিতে। এ-শব্দের অনুষঙ্গে আসে ঐ নামের বিখ্যাত গীতিনাট্যের ভাবস্মৃতি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমরা যেভাবে খুলতে খুলতে এগুচ্ছি, সেভাবে নয়, কবি এগিয়েছেন বাঁধতে বাঁধতে। এখানেও, "গান যে করে সে আনন্দের দিক হইতে রাগিণীর দিকে যায়, গান যে শোনে সে রাগিণীর দিক হইতে আনন্দের দিকে যায়।"[৪] সাম্প্রতিক একখানি কাব্যনাটকের কথা এখানে অবশ্যই উঠবে। নাটকটি 'নাটকের নাম ভীষ্ম', রচয়িতা মণীন্দ্র রায়। এ নাটকের ভীষ্ম-সংলাপ ও আধুনিক কুশীলব-সংলাপের দুই মাত্রাকে ও স্তরকে কবি যেভাবে ধরেন তা বাস্তবতার দুই প্রান্তের মধ্যে জ্যা সংযোজনা। বস্তুত মণীন্দ্র রায়ের দীর্ঘ কবিতায় যে জীবনের নানা বৈপরীত্যকে মেলানোর প্রয়াস তাঁর শব্দ সমাবেশে ভাষার বাঁধনে তাই মূর্তি পায়—আলোছায়ায় সে মূর্তি জীবন শিল্প।

৪. বর্তমান লেখকের লেখা বিষ্ণু দের 'ক্রেসিডা'-কবিতার আলোচনা থেকে।

তিন

চিত্রকল্পকে কাব্যভাষায় রূপান্তরিত করা আধুনিক কবিতার ভাষারই বিশিষ্ট লক্ষণ একথা বলা যাবে না। এ বিষয়ে আধুনিক কবিদের প্রবল পূর্বগ রয়েছেন রোম্যাণ্টিক কবিরা, প্রতীকী কবিরা। কিন্তু আধুনিক কবিতার কাব্যভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল চিত্রকল্পের ভিতর দিয়ে বিপরীতের সমপাতন। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরেজ মেটাফিজিক্যাল কবিরা এইভাবে আশ্লিষ্ট বিপরীতের সাহায্য নিয়েছিলেন—আধুনিক কবিকেও এ সাহায্য নিতে হয় আধুনিক জীবনের অধিকতর জটিলতার চ্যালেঞ্জকে স্বীকৃতি দিয়ে। আপাতদৃষ্টিতে যারা অসম্বন্ধ, তাদের পাশাপাশি সন্নিধি আধুনিক কাব্যের বিষয়, কেননা তারা আধুনিক জীবনেরই অংশ।[৫] জীবনানন্দের কাব্যভাষার তিনটি চিত্রকল্প প্রসঙ্গ ব্যাখ্যায় সহায়ক হবে :

ক. স্তন তার
করুণ শঙ্খের মতো—দুধে আর্দ্র—কবেকার শঙ্খিনীমালার

খ. উটের গ্রীবার মতো কোনো এক নিস্তব্ধতা এসে।

গ. পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

স্তন এবং শঙ্খের সাদৃশ্য ক.-চিহ্নিত উদ্ধৃতিতে বড়ো কথা নয়। যে-সাদৃশ্যকে উপেক্ষা করা হচ্ছে না, তবে তাকে গৌণ করে দিয়ে এক অমেয় রহস্যকে ডাক দিয়েছে 'করুণ' বিশেষণটি। আমরা জানি, দৃশ্য-বাস্তবের শৃঙ্খল ভেঙে পরাবাস্তবতায় উত্তরণের আধুনিক রীতিতে জীবনানন্দ বিশেষণের সীমা ভেঙে দেন। 'অরব অন্ধকার'-এর 'অরব' শুধু 'নীরব'-এর বিকল্প নয়—এক বিমর্ষ শূন্যতার অনুষঙ্গবাহী। ঠিক তেমনি 'করুণ' এই দ্ব্যর্থক বিশেষণ (দুঃখাবহ এবং দয়ার্দ্র) দুই অর্থের মধ্যবর্তী ছায়ায় অপরূপ। অব্যবহারে অচরিতার্থ শঙ্খের কারুণ্যই কি এখানে উপমেয়? সৌন্দর্য এবং বিষণ্ণতার আশ্লেষে এ হয়ে উঠেছে রোম্যাণ্টিক কল্পনার পরাকাষ্ঠা। কিন্তু 'করুণ'-কে যদি পাত্রান্তরিত বিশেষণরূপে ভাবা যায়, তাহলে যে-অর্থে ইএট্‌স আধুনিক, সেই অর্থেই জীবনানন্দ সঞ্চার করেন আধুনিক অর্থ—শঙ্খের মতো স্তন যার, সেই শঙ্খিনীমালার সৌন্দর্যের যুগ পৃথিবীতে চিরকালের মতো শেষ হয়ে গেছে সৌন্দর্য-বিচ্ছিন্ন সেই আধুনিকের কারুণ্যই কি এখানে উদ্দিষ্ট?

---

৫. বুদ্ধদেব বসুর জীবনানন্দ আলোচনা—আমার আজো ধারণা এ ব্যাপারে শ্রীবসুর পারদর্শিতা তুলনাহীন।

খ.-চিহ্নিত চিত্রকল্পটি কাব্যভাষায় পরাবাস্তবতার বিশিষ্ট লক্ষণ। যে-নিস্তব্ধতা কিম্ভূতকিমাকার, যে-নিস্তব্ধতা অনির্দেশ্য এবং আধুনিক অর্থে absurd, তাকেই 'উটের গ্রীবার' আকস্মিক উল্লেখে সংক্রামিত করা হল। অন্যদিক থেকে 'উট'-শব্দের অর্থগত অনুষঙ্গে ভেসে ওঠে বিবর্ণ ধূসর মরুশূন্যতা। সেই শূন্যতার ভয়াবহ স্তব্ধতা কখনো কখনো অপ্রতিরোধ্য—অস্তিত্বের নিরর্থকতার বোধ জেগে উঠলে আর রেহাই নেই।

গ.-চিহ্নিত চিত্রকল্পটি বিস্তৃত ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। 'বনলতা সেন' কবিতায়, রসিক পাঠক লক্ষ করেছেন, বনলতা সেন বর্ণিত হয়েছেন মাত্র দ্বিতীয় স্তবকটিতে। প্রথম ও তৃতীয় স্তবকে তিনি শুধু উল্লেখিত। প্রথম স্তবকে কালে এবং স্থানের অসীমে বিস্তীর্ণ যন্ত্রণাময় মানব অস্তিত্বের স্মৃতি। বনলতা সেনের ভিতরে, প্রেমের ভিতরে মানুষ খুঁজে পেল তার identity. দ্বিতীয় স্তবকের প্রথম দুটি চিত্রকল্পে বনলতা সেনের সৌন্দর্যকে ক্লাসিক স্পষ্টতা দেওয়া হল। অথচ ঐ স্তবকেই প্রচলিত উপমারীতিকে ধাক্কা দেওয়া ঐ চিত্রকল্পটি সমুখিত—'পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে'। মনে হতে পারে, আপাত দৃষ্টিতে, দ্বিতীয় স্তবকের প্রথম দুই চরণের উপমারীতির সঙ্গে এ বুঝি অসমঞ্জস। কিন্তু কবিতাটি ভিতরে ভিতরে এমন ভাবে বেড়ে চলেছে যে, দুই অসমঞ্জসতা আশ্চর্যভাবে সংগতি পেয়ে গেল। দিশাহারা যাত্রী, দিশাহারা পাখির মতোই—প্রেমের আশ্রয় কল্পনাতে প্রেমিকার চোখ আশ্রয়দাতা নীড়ের উপমা পেয়েছে। সৌন্দর্যের নিরাসক্ত বর্ণনা অকস্মাৎ ব্যক্তির আকুলতায় একান্ত মন্ময় হয়ে উঠল। প্রথম দুই স্তবকের শেষেই বনলতাকে স্থানে কালে চিহ্নিত করা হল—ঐ মন্ময় উচ্চারণ তার ফলেই পেয়েছে তীব্রতা। শেষ স্তবকের শেষ চরণে আর দরকার নেই 'নাটোরের' কথাটি। শুধু 'বনলতা সেন'ই যথেষ্ট। যে-ধ্যানলোক তৃতীয় স্তবকের বর্ণনীয়, তা শিল্পীর ধ্যানলোক। বনলতা সেন আর তখন বাস্তবের কেউ নন, কাব্যকাহিনীর বিষয়—নাটোরের ভৌগোলিক বন্ধন থেকে তিনি তাই মুক্ত। চিত্রকল্পের এই কালগত মৌলিকতা আধুনিক কাব্য ভাষাকে দিয়েছে চৈতন্যকে নাড়া দেবার ক্ষমতা।

চার

একথা কে না জানেন যে, আধুনিক জীবনের জটিলতার আহ্বানে সাড়া দিতে গিয়েই আধুনিক কবিতার ভাষা প্রচলিত রীতিকে আঘাত হেনেছিল।

কোনো অভিজ্ঞতাই প্রত্যাখ্যানের যোগ্য নয়, কৌতূহল কোথাও প্রতিহত হবার নয়। অমিয় চক্রবর্তী যখন লেখেন, 'না দাড়ি কামানো বুড়ো', লেখেন 'কাঁসাটে', 'মাদুরে চ্যাপটানো প্রাণ', বুদ্ধদেব বসু যখন বলেন, 'সংঘহীন সংজ্ঞাতীত এককের আদিম জ্যামিতি', সমর সেন যখন বলেন ঃ

"মৃত্যু শুনেছি শেষ কথা নয়,
কালস্রোতে ভেসে আসে নবীন জঞ্জাল
আবার সঙ্গোপনে ঘরে রহস্যভরে বিড়ি ধরে
বালক বংশধর,
তারো পরে টেরি কেটে কাব্য প'ড়ে
জানায় অমর প্রেম বখাটে যুবক—"

বা সুভাষ মুখোপাধ্যায় যখন বলেন ঃ

"নখাগ্রে নক্ষত্রপল্লী, ট্যাঁকে টুকরো অর্ধদগ্ধ বিড়ি।
মাংসের দুর্ভিক্ষ নইলে ঋষি মনে হতো হাবভাবে।
বিকৃত মস্তিষ্ক চাঁদ উল্লাঙুল স্বপ্নে অশরীরী—"

তখন কবিদের শব্দের স্বাধিকার চৈতন্যের পরিবর্ধিত পরিধির স্মারক হিসাবেই আমাদের কাছে জীবন পায়। এখানে গদ্যময় জগতের অভিঘাত অস্বীকৃত হয়নি, তবু এরা কবিতা, কেন না 'নবীন জঞ্জাল' অথবা 'নখাগ্রে নক্ষত্রপল্লী' অথবা মেটাফিজিক্যাল কবিদের স্মারক জ্যামিতির উপমা আসলে শব্দেরই আধুনিক অব্যর্থতা, বিকল্পবিহীনতা। হরপ্রসাদ মিত্র ঠিকই বলেন ঃ

"শব্দ এক অনন্যীকরণ!
যথার্থ শব্দের স্বাদ ইন্দ্রিয়ে ও অতীন্দ্রিয়তায়—
অনিরুদ্ধ অভিজ্ঞতা যেমন এ বেগনভিলায়।"

এইমাত্র যতগুলি উদ্ধৃতি আমরা আহরণ করেছি তার সবগুলি গদ্যময় বিস্তৃত জীবনকে স্বাংগীকরণের প্রয়াসে চিহ্নিত। সবগুলি ভাষাতেই এক যুগায়ত মননের আভা। এগুলি একথাই প্রমাণ করে আধুনিক কবিতা, পাঠক বা কবি কারো আশ্রয়-নিকেতন নয়—এ কবিতার ভাষাই প্রমাণ করে যে, জীবনের সর্বৈব জটিলতা, বঙ্কিমতা, এমনকি অকাব্যিকতার সম্মুখীন হবার সাধনায় এ ভাষাও এক exactness-এর অভিপ্রায়ী। আধুনিক কবিতা একদিন বাংলা কাব্যসাহিত্যে যে-বিপ্লবের বার্তাবহ হয়ে দেখা দিয়েছিল তা এই অভিপ্রায়ের প্রেরণাঋদ্ধ। এ অভিপ্রায়ে কোনো ভ্রান্তি ছিল না, এ প্রেরণাতেও কোনো ফাঁকি ছিল না, শুধু এই অভিপ্রায়কে ভুল ব্যাখ্যার ফলে, এর এক কল্পিত সীমাবদ্ধতার ধারনায় উত্তেজিত হয়ে কবি-অভিজ্ঞতা ঐকান্তিক

প্রসারকে উপেক্ষা করে হতে চাইল একান্ত ভাবে ব্যক্তিগত। এই গোষ্ঠির ব্যক্তিগত হবার সাধনার সর্বজনীন মূল সূত্র হল মননের বা বুদ্ধিশীলতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। তার ফলে আধুনিক কাব্যভাষার গতিতে যাকে বলা হচ্ছে সর্বাশ্লেষী গুণ তা অত্যন্ত একপেশে। প্রকৃত পক্ষে বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা'-পত্রিকা বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কাব্যভাষার প্রতিষ্ঠায় যে পরিমাণে ভূমিকা পালন করেছে, কাব্যভাষার অর্জিত আধুনিকতার, তথা আধুনিক অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াকেও ততখানিই প্রশ্রয় দিয়েছে 'কবিতা'। 'দাও সেই বুদ্ধিরে বিদায়' 'দময়ন্তী'র সেই উৎসর্গ-কবিতাটি থেকেই বুদ্ধির বিরুদ্ধে, আধুনিকতার বিপরীতে বুদ্ধদেবের কবিস্বভাব তৎপর হয়েছে। সুতরাং 'দময়ন্তী'র-প্রথম সংস্করণের ক্রোড়পত্রে কাব্যভাষা সম্বন্ধে বুদ্ধদেব যে সংকল্পের সূত্রগুলি উচ্চারণ করেন, তা লংঘিত হয়েই সম্মানিত হয়েছে বেশি। তারপরে চারের দশকের মাঝামাঝি সময়ে, কি শেষের দিকে যখন বুদ্ধদেব 'কবিতা' পত্রে লেখেন ঃ

"ক্ষান্ত হলো যৌবনের কলতান। সাঙ্গ হলো খেলা।
আনন্দিত ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজাল-উজ্জ্বল মেখলা
শ্লথ হলো, শূন্য, ম্লান, নিঃস্ব নীলিমায়। যে-মোহিনী
বিশ্বজয়ী মাল্য দিয়ে একদিন করেছিল ঋণী,
আজ শুষ্ক তার মালা, পুষ্পগুলি একে একে খ'সে
রেখে যায় স্মৃতির ভীষণ ভার।"

তখন আমরা বেশ বুঝতে পারি, এই প্রাজ্ঞ কবি কবিতাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন কাব্যের তথাকথিত main stream-এ, উদ্ধৃত অংশের বাণী-ভঙ্গিমার রাবীন্দ্রিকতায় আমি অভিভূত নই, আমার লক্ষণীয় নয় ঐ 'মালা', 'মাল্য', 'পুষ্প' ইত্যাদি শব্দগুলি—'মোহিনী' শব্দটিও আমার আপত্তির কারণ নয়—আমার বক্তব্য হল এই সব শব্দপুঞ্জ শেষ পর্যন্ত কবিকে যে-বিশ্ব সম্পর্কে গ্রথিত করে তোলে তা কি এক পড়ে-পাওয়া-জগৎ নয়? 'তাঁর কবিতায় চলতি কালের জীবন অথবা কথ্যভাষার আস্বাদ নেই' অথবা 'কালীদাসীর মণ্ডসজ্জা'—রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই সব অভিযোগবাণীর উচ্চারক সেদিন একথা মনে রাখেন নি যে, রবীন্দ্রনাথের কাছে শব্দেরা উপলব্ধ, বুদ্ধদেবের এই কবিতায় (আমি মাত্র এই কবিতাটির কথাই বলছি) তারা আহূত। এ-শব্দ একরৈখিক ও সমতলীয়-এর বিন্যাস।

কবিতাটি গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে পরবর্তী সময়ে বোদলেয়রের ঢেউ বুদ্ধদেব ও শক্তিশালী তরুণ বাঙালী কবিদের অধিগত করেছে। শব্দের এই

পরবেশী চাল ছাড়া আধুনিক বাংলা কাব্যে সে-কাজ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সেই পরবেশ গ্রহণ অলক্ষ্যে শুরু হল 'এও তার' কবিতায়। পাঁচের দশকে এই কবিরা লিখলেন ঃ

"ঘটায়, ঘোমটার তলে, মৌলিকের নিত্য রূপান্তর—
পদার্থের, চেতনায় ; স্পন্দমান মাংসের, মানসে ;
বিষ্ঠার, প্রোজ্জ্বল ফুলে ; অংগারের নবান্ন পায়সে ;
এবং মলের ভাণ্ডে ছেঁকে তোলে সম্ভাব্য ঈশ্বর।"
—সর্বেশ্বরী / বুদ্ধদেব বসু।

লক্ষণীয় 'বিষ্ঠা' 'মলভাণ্ড', লিখতে হচ্ছে সেই বুদ্ধদেবকে যিনি একদা বলেছিলেন, 'হাতকে হস্ত, গাছকে তরু, ফুলকে পুষ্প বলবো না। মুখের কথায় এদের যা বলি, কবিতাতেও তাই বলবো'।[৬] একথা যেদিন বুদ্ধদেব বলেছিলেন সেদিন ছিল তাঁর বাংলা কবিতার মূল গতিবেগকে সামনে চালিয়ে নেবার দায়িত্ব। আরো লক্ষণীয় যে, চার-পাঁচ-ছয়ের দশকেই কথ্য-স্রোতের প্রাণবন্ত টানকে কাব্যে স্বীকৃতি দিতে দিতেই গড়ে উঠল আধুনিক জীবনের নিজস্ব বাণীমূর্তি। প্রধানত বিষ্ণু দে রূপকথা ও লোকায়ত চিত্রভংগিকে প্রশ্রয় দিয়ে এবং মংগলাচরণও গড়ে তুলেছেন জীবনের দেশজ অথচ বীর্যমান প্রতিমা। মণীন্দ্র রায় লিখেছেন মানুষের চলিষ্ণু পদাবলী, সুভাষ মুখোপাধ্যায় সূচ্যগ্র ব্যঞ্জনায় ধরিয়ে দিলেন আমাদেরই আটপৌরে জীবনের অন্তর্লীন রুদ্রছন্দ। অরুণ মিত্র এক গূঢ় গহনের সংকেত ফুটিয়ে তুললেন ভাষার বাস্তবতাকে ক্ষুণ্ণ না করেই। শঙ্খ ঘোষ এক আস্তিক্যকে মূর্ত করলেন শব্দের ইংগিতবহ বিপরীত সমাবেশে, নাটকীয়তা ও লিরিসিজমের অসবর্ণ বিবাহে।

পিছিয়ে পড়ার প্রশ্ন বা নিজের গুহায় আশ্রয় নেবার প্রশ্নকে সচেতন কবিব্যক্তিত্ব আমল দেয় না। আধুনিক কবিতার আগুয়ান উচ্চারণ আমাকে এই শিক্ষাই দেয়।

৬. 'দময়ন্তী'র ১৩৫০ এর 'কবিতা-ভবন' সংস্করণের ক্রোড়পত্র।

অর্থের শব্দ

একথায় আর কারো অবিশ্বাস নেই যে, শব্দের অর্থ আছে বিষয়টি যত সত্য, অর্থের শব্দ আছে একথা জানা আরো জরুরী। যে কোনো সেরা কবিতার লক্ষ্যভেদী যে-কোনো অংশবিশেষ এ ব্যাপারে উত্তম সাক্ষ্য বলে পরিগণিত হবে। শব্দ শ্লীল নয়, অশ্লীল নয়, সৎ নয়, অসৎ নয়, কটু নয়, মিষ্ট নয়। সে ত্রিগুণাতীত বলেই অনুভূতির দেবী বারে বারে তাকে নিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠেন। সে-ই কবিতাকে দিতে পারে চারিত্র্য। ভারি অথবা হালকা, ধ্রুপদী অথবা ইতর শব্দেরা পাশাপাশি বা নাতিদূর সন্নিধানে বসে পড়ে—এক অবাচ্য অর্থের আশায়। তখনই কবি-ভাবনা সরল রৈখিক বিন্যাস পরিহার করে—কল্পনা মূর্তি ধারণ করতে চায় ত্রিস্তর ভাস্কর্যের সাদৃশ্যে। ভাব বা কল্পনা জীবন্ত হয়ে ওঠে, পায় শরীরী গতি শব্দদের পারস্পরিক অর্থ সমবায়ের ফলে। তখনই শব্দের অর্থের চেয়ে, জরুরী হয় অর্থের শব্দ। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'উলঙ্গ-রাজা' বইয়ের 'আজ বিকেলে' কবিতাটির একটি বিচিত্র শব্দ এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। 'মাঝে মাঝেই বুকের মধ্যে ঝনকে ওঠে/এখন এই পড়ন্ত বেলায়।' কাকে বলে 'ঝনকে ওঠা' ঠিক কেউই আমরা জানি না। জানি না ব্যাপারটি শারীরতত্ত্বের আওতায় পড়ে, না, রোগতত্ত্বের এলাকায় আসে। তবে সেই বিশেষ অনুভূতিকে আমরা সকলেই জানি, যা বৈকালী বিষণ্ণতার দরজা খুলে দেয় সহসা। সেই ম্লান বহুবিবর্ণ দরজা খোলার আকস্মিকতা বুঝি ধরা পড়ে যায় 'ঝনকে ওঠে' এই শব্দকল্পনায়। একেই বলা যায় অনির্বচনীয় অর্থের শব্দ[১]। কবি এই শব্দটিকে চিনেছেন। ধুয়োর মতো একে ফিরিয়ে ফিরিয়ে এনেছেন ঃ

১. সর্বথা স্মরণীয় রবীন্দ্রনাথকে এখানেও একটু স্মরণ করার লোভ সংবরণ করতে পারি না। 'শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থে তিনি বলেছেন ঃ

> 'গদ্য জ্ঞান লইয়া এবং পদ্য অনুভাব লইয়া। বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্থের সাহায্যে পরিস্ফুট হয়; কিন্তু অনুভাব কেবলমাত্র অর্থের দ্বারা ব্যক্ত হয় না, তাহার জন্য ছন্দের ধ্বনি চাই; সেই ধ্বনি অনির্বচনীয়কে সঙ্কেতে প্রকাশ করে।
> আমাদের বর্ণনায় যে অংশ অপেক্ষাকৃত অনির্বচনীয়তর, সেগুলিকে ব্যক্ত করিবার জন্য বাংলা ভাষায় এই সকল অভিধানের আশ্রয়চ্যুত অব্যক্ত ধ্বনি কাজ করে।'
>
> (ধ্বন্যাত্মক শব্দ)।

অনুরূপ বিষয় নিয়ে লেখা আর একটি প্রবন্ধ 'ভাষার ইঙ্গিত'। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি রবীন্দ্রনাথের এই 'ভাষার ইঙ্গিত" প্রবন্ধ পড়ে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—'অব্যক্ত ধ্বনির শব্দগুলির রহস্যবোধ সকলের ···... কানে হয় না। যে কানে বোধ শক্তি বর্ধিত সে কানে হয়। কবি রবীন্দ্রবাবুর তাহা হইয়াছে।'

মাঝে মাঝেই বুকের মধ্যে ঝন্‌কে ওঠে
এখন এই পড়ন্ত বেলায়।
দিনের দীপ্তি মিলিয়ে যাবার খানিক আগে
বন্ধুদেরও মুখ দেখে আজ ধাঁধা লাগে,
মন বসেনা কোনো কাজে, কোনো খেলায়।
বুকের মধ্যে বিষণ্ণতা ঝন্‌কে ওঠে
এখন এই পড়ন্ত বেলায়।

'ঝ'-এর সঙ্গে মিশে আছে দীর্ঘশ্বাস, 'ন' দিচ্ছে যন্ত্রণার ধ্বনি, 'কে' এনে দিল আকস্মিকতার ইশারা। পুরো কবিতাটাও মিলিয়ে গুছিয়ে এই কথাই তো? এমনি করেই শব্দেরা হয়ে ওঠে স্বমহিম কবিতার জনক। কবিত্ব সেই শব্দে নেই, সেই শব্দ বাদ দিয়ে কবিতাতেও নেই—সেই শব্দের সহযোগী ক্ষমতায় আছে কবিত্বের বীজ। কখনো পুরাতন শব্দ ও নতুন শব্দের সহজ বাণিজ্য, কখনো বা শব্দ সমাবেশের পরিপূর্ণ পারস্পরিকতায় গড়ে ওঠে কবিতার শৈল্পিকতা।

এই পরিপূর্ণ সহযোগ বা পারস্পরিকতা আরো বিচিত্র হয় তখন, যখন অভিজাত এবং অনভিজাত শব্দেরা আত্মবিস্মৃত হয়ে একে অন্যকে মদত দেয়, মহাজনদের ব্যবহৃত শব্দ এবং অভাজনদের প্রত্যহের বাক্‌রীতি তখন অসবর্ণ মিলনের মাধ্যমে সম্ভব করে তোলে অনবদ্য কবিতা। প্রসঙ্গতঃ রাম বসুর 'রক্তাক্ত বাঘিনী' কবিতাটির কথা বলা চলে ঃ

নিটোল নিস্তব্ধ বনে অস্ত মেঘ, অকস্মাৎ আছড়ায়
রক্তাক্ত বাঘিনী তার পাটল গায়ের রঙ, অন্ধরাগে
থাবা মারে। দাঁত ঘসে, মেঘ ফাটে, পাথরও কাতরায়
ঘুর খেয়ে লাফ দেয়। তপ্ত তামা চোখ, প্রতিবিম্ব লাগে
পিঙ্গল পাহাড়ে। বিদ্যুতের যাতায়াত নখে। শোধ তুলে
নিতে ধনুকের মতো দেহ। অন্ধকার জমে থাকে-থাকে,
একজনে গংগাজল ভাঙে। শান্ত বট রস টানে মূলে
পাখি নড়ে, তারা জ্বলে, কেবল বাতাস যায় হেঁকে হেঁকে।

প্রত্যেক ক্রিয়াপদ কল্পনার দিগন্ত-বিস্তারের সাক্ষ্য। প্রত্যেকটি বিশেষণ বর্ণবাচক। 'নিটোল নিস্তব্ধ' বন শুধু পটভূমির প্রাথমিক প্রস্তুতি। দেখা গেল পরস্পরের সহযোগেই শব্দেরা হারিয়ে ফেলে নিরুত্তাপ উদাসীনতা—তারা এইভাবেই বিশেষ বিশেষ কবিতায় লাভ করে এক অনন্তভোগ্য আয়ু। তা শুধু কবিতাতেই লভ্য। কবিতাই শব্দের নব নব জন্মের ক্ষেত্র।

শব্দেরা কখনো কখনো দুঃসাহসিকতায় বিষমকে মিলিয়ে দেয়, ইন্দ্রিয়ের সীমানা দেয় ভেঙ্গে চুরে। অকল্পিতপূর্ব অনুষঙ্গে দৃশ্যে নিয়ে আসে শ্রুতির স্পন্দন, শ্রুতির স্মৃতিতে ভাসে দৃশ্যের ইংগিত। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি কবিতা থেকে এর একটি সাম্প্রত-সার্থক পরিচয় নেওয়া চলে ঃ

·········দ্রিদিম জ্যোৎস্না

অমনি আমার বুকের মধ্যে ভয়ের ঘণ্টা, দ্রিদিম জ্যোৎস্না

লিখে ভয় হয়

দ্রিদিম না স্মৃতি ? জ্যোৎস্না না জল ? অথবা সাগর ?

দ্রিদিম সাগর ? ঠিক ঠিক ঠিক। ··········

(শব্দ/বন্দী জেগে আছো)

বলে রাখা দরকার এটি এমন ধরনের কবিতা যে, এর অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা যায় না। আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিন্দু চিহ্ন লাগিয়ে বর্জন গ্রহণ করা হয়েছে। আমাদের প্রয়োজন 'দ্রিদিম জ্যোৎস্না' এই শব্দজোটের বিষম-সমন্বয়ের রহস্য। কবি দ্রিদিম এই বিচিত্র বিশেষণের সাহায্যে জ্যোৎস্নার ব্যক্তিগত স্মৃতি-অনষুংগকে ধ্বনিত করে তুলতে চান। এখানেও শব্দের অর্থ খোঁজার চেয়ে অর্থের শব্দই কবির অভিপ্রায় বলে মনে হয়।

শ্রী গঙ্গোপাধ্যায়েরই আর একটি কবিতা 'শব্দ' নামে খ্যাত। সে কবিতা প্রথম উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে চিত্তে সাধ জাগে উধাও হয়ে যাবার ঃ

ঝাটিংগা নামে এক দুর্দান্ত পাহাড়ী নদীর পাশে

হারাংগাজাও নামে একটা

নম্র ছিমছাম স্টেশন··· ··

এই অদ্ভুত নাম দুটো জাদুকরের মন্ত্রের মতো পরিদৃশ্যদান রিয়্যালিটিকে দুলিয়ে দেয়। কিন্তু জাদুকর হওয়া তো কবির অভিপ্রায় নয়, তাই তিনি দুলিয়ে দিলেও রিয়্যালিটিকে উড়িয়ে দেন না। সঠিক বাস্তবতা ফুটে উঠে এই ছবির রূপকে ঃ

পাথুরে প্লাটফর্মে একজন রেলবাবু কাঁঠালের দর করছেন

আমাদের কামরায় পর্যাপ্ত ভীড় ও হাতকড়া বাঁধা

দুজন খুনী আসামী

এবং উজ্জ্বল স্কার্টপরা চারটি

স্বাস্থ্যবতী অহংকারী খাসিয়া তরুণী·······

এই উদাসীন সৌন্দর্য ও অপরাধের শাশ্বত বাস্তবতার ছবিটিকে সামনে রেখেই ঐ নদী আর ইষ্টিশন, (এখানে আমার ইষ্টিশন বলতেই ইচ্ছে করল,

তাদের ভূমিকা পালন করে। নদী আর.স্টেশনের জন্য বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন হল না – শব্দধ্বনিই আমাদের টেনে নিয়ে গেল এক অনাবৃত আদিম অস্তিত্বের সন্ধানে। 'মানুষ নামের অসংখ্য মানুষ' ক্লান্তিময় অবজ্ঞাকে চূড়ান্ত করে তুলেছে। 'খুনী আসামীদ্বয়ের ধ্যাতা মুখ'—বিশেষণ সন্নিপাতের বৈশিষ্ট্যেই হয়ে উঠল ঘটনা এবং অনুভূতির বৈপরীত্যে সুন্দর। আর যে-ঘটনা-ছবিটি কেন্দ্রীয় আলোকের মতো সমগ্র কবিতার total meaning-কে উদ্ভাসিত করে, তাকে আমাদের চিনতে ভুল হয় না ঃ

ঈষৎ নুয়ে পড়া এক রমণীর উপচে ওঠা বুকে
শেষবার চোখ রেখেছে
যমজের মতন ঐ দুই খুনী আসামী
মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতের আর কোনো দোষ নেই—

কবির কী অভিপ্রায় জানি না, এই অংশটি পড়তে গেলেই, আমার মনে পড়ে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত এই সভ্যতাকে, সেও বুঝি প্রাকৃত স্তনশ্রীর মতো অস্তিত্বের আদিমতার দিকে শেষবারের মতো তাকিয়ে অনুভব করে নিতে চাইছে নিজেকে। আমারই দোষ, আমি 'ঝাটিংগা' শব্দের সঙ্গে ঝটিকার উন্মূলন ক্ষমতার মিল খুঁজে পাই ; আমারই দোষ 'হারাংগাজাও' শব্দে খুঁজে পাই হারানো কোনো বস্তুর অনির্দেশ ঠিকানা। এ দোষও কাব্য রসাস্বাদনে প্রতিবন্ধক নয়, এই যা আমার সান্ত্বনা।

তবু এ কবিতা আধুনিকের কলমে রোম্যান্টিকের কবিতা। হলেও কিছু আসে যায় না। শব্দের নিগূঢ় এবং তির্যক হবার ক্ষমতা আছে বলেই কিছু আসে যায় না।—কেউ কেউ এই শক্তিতেই আরো গাঢ় করে তোলেন কোনো এক অনির্বাচ্য প্রশান্তিতে। শঙ্খ ঘোষের একটি কবিতার সাক্ষ্য নেওয়া যায়। কবিতাটি দীর্ঘ। ধরে নিলাম 'আরুণি উদ্দালক' কবিতাটি স্বাভাবিক ভাবেই অনেকের পড়া আছে। বন্যার প্রমত্ততা এবং নিষ্ঠুরতা এ কবিতায় সাংবাদিক আনুগত্যে বর্ণিত হয়নি। অথচ একান্তভাবেই দেশজ এই ঘটনাকে তিনি বেঁধে নিয়েছেন আমাদেরই আবহমান পুরাণ কাব্যের চরিত্র-প্রতীকে। বেদনার গভীর ও গাঢ় রূপ রচিত হয় ঃ

আমাদের ঠোঁটে ওঠে হাসি
দুপুরে বাতাস-ভরা কেঁপে ওঠা অশথের পাতা
যেমন নির্জন-শব্দ তোলে
এখনো অম্বার স্বর ততখানি ঝরে পড়ে 'সুমন সুমন'
আমাদের চোখে ভাসে সাবেক করুণা

প্রতীকী কবিতার ফ্রেমে এ-কবিতা আধুনিক কবিতা। এই কবিতার মধ্যে সেই আধুনিকতা আছে, যার সংজ্ঞা হ'ল সভ্যতার ঐতিহাসিক ভবিতব্যের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভবিতব্যের অন্বয় এবং অনন্বয় সম্বন্ধীয় চেতনা। কালপটে মানুষের যে-ভূমিকা আধুনিক কবির অনুসন্ধেয় তা এই কবিতার প্রতীকী ফ্রেমেও বাঙ্ময়। 'নীল' এই শান্ত রঙ শ্রীঘোষের কাছে এক বর্ণ-প্রতীক। এই কবিতায় 'নীল কাঁচে', 'নীল জল' 'নীল শিশু' এবং ১৯৭২-এর পুজোর 'সত্তর দশকে' 'মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়' কবিতার 'নীলকুঠরি' এক আত্মস্থ বেদনার অনুষঙ্গবাহী। এলিয়ট-কথিত শাব্দ বিন্যাসের complete consort রচনার সার্থকতায় এই কবিতাটি বিশিষ্ট।

আমি আবারও রাম বসুর আর একটি কবিতা মনে করতে চাই। ১৯৭২-এর পুজোর 'পরিচয়ে' কবিতাটি বেরিয়েছিল। সমগ্র কবিতাটি (অসমাপ্ত) যখন এইখানে এসে শেষ হয় ঃ

চারপাশে ছায়া গুটিয়ে আসছে
পৃথিবীর শরীর থেকে নরম গন্ধ
নগ্ন আমি প্রস্রাবখানার জানলায় মাথা রেখে নক্ষত্রের দিকে
তাকিয়ে আছি।

তখন আমরা পাবলো নেরুদার অনুসৃত এলিয়টীয় complete consort-এর আর এক নিদর্শন খুঁজে পাই। 'প্রস্রাবখানা এবং নক্ষত্রলোক' আবিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে কবি সমগ্রসত্তার অংশ হিসাবে জেনে নিলেন।

অর্থই অগাধ। কবি অর্থকে গৌণ করে শব্দের শ্বারস্থ হন না। শব্দের চলতি সীমাকে তিনি বারে বারে ছাড়িয়ে যান, সেই অগাধ অর্থের কাছে যাবেন বলেই। শব্দের স্বরাজ্য বলে কিছু নেই।

ভা ষা র অ তী তে

এক

সেণ্ট জন বলেছিলেন প্রারম্ভে ছিল শব্দ। পরিমাণে কী সে, আভাস তিনি দেন নি। ঠিকই করেছিলেন, কেননা প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে শব্দের প্রাথমিক আধিপত্যই ছিল তাঁর কল্পনীয়, আর, যে অনির্বচনীয় সব বচনের অন্তে অপেক্ষমান, শব্দ তো সেই অকূলের সৈকত। সৈকতের আবার পরিণাম কী? তারপরেই তো এক লোক থেকে আর এক লোকে চলে যাওয়া। 'পক্ষবান শব্দেরা' মৃত্যুকে পরাস্ত করবে—হোমারের বাইরের আলোক মুছে গেলেও, ভিতরের আলোয় এই বিশ্বাস ছিল পরম প্রত্যয়ে উজ্জ্বল। অর্ফিয়ুসকে শাস্তি পেতে হয়েছিল জিউসের বজ্রে, অর্ফিয়ুস বিশ্বরহস্য ভেদ করে তাঁর গীতমাধ্যমে সে রহস্য রটনা করেছিলেন—এই অপরাধে। অন্য কাহিনীতে জানা যায় বিখণ্ডিত অর্ফিয়ুসের মৃতকণ্ঠে শব্দেরা ছিল সংগীতে অনির্বাপিত। শব্দের এই অসামান্য শক্তির কথা আবহমান কাল ধরে পুরাণে, লোকশ্রুতিতে, গাথায় এবং মহাকাব্যে নানা ভাষায় ঘোষিত হয়েছে। প্রাচীন চীনারা প্রায় এই ধরনের কথাই বলেছেন যখন তাঁরা জেনেছিলেন যে meaning বা উদ্দেশ্য স্বমাধ্যমে চিরবর্তমান।

সব ধর্মেতিহাসেই দেখা যায় যে ঈশ্বর মানবগোষ্ঠীর প্রত্যুষবেলায় মানুষের কাছে তাঁর বার্তাজ্ঞাপনের জন্য কোনো সংকেত বা প্রতীক ব্যবহার করেন নি। তাঁর মুখনিঃসৃত বাণীই কখনও হয়েছে ঋষির কাছে বেদ, কখনও হয়েছে মোজেসের কাছে মূর্ত সিনাই পাহাড়ের বিদ্যুৎ বহ্নিময় দশ নির্দেশ। শব্দেরা সেদিন ছিল আধিপত্যশীল। একথা স্বতঃস্বীকার্য যে, সেদিনের মানুষ জড়বিশ্বকে অধিগত করার, তার রহস্য ভেদ করার অনেক উপায়ই জানত না। কিন্তু দূর অতীত থেকে সেদিনের মানুষ আজকের এই প্রযুক্তিপারংগম, জড়বিশ্বজয়ী, কুবেরকল্প সভ্যতালগ্ন মানুষের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলবে; বলতে চাইবে আমাদের সমস্ত রিক্ততার মধ্যেও আমরা স্বচ্ছন্দ ছিলাম। জীবনের বা বেঁচে থাকার একটা নির্দিষ্ট অর্থে আমরা বিশ্বাস করতাম। লব্ধ ও উপলব্ধের মধ্যে, অর্জন ও অভিজ্ঞতার মধ্যে, প্রতীয়মান ও বাস্তবের মধ্যে আজ যে বৈপরীত্য ক্ষণে ক্ষণে বড় বড় মহানগরীর জনাকীর্ণতার মধ্যে ব্যক্তির বিবিক্ত অন্তরে জেগে উঠেছে, সে বেদনা সেদিন ছিল অনুপস্থিত। এই সেদিন পর্যন্তও শব্দেরা ছিল অভিজ্ঞাত জীবনেরই নিয়ন্ত্রণে। শেক্সপীয়রের

ট্র্যাজিক নায়কেরা উচ্ছ্বসিত শব্দরাশিকে ব্যবহার করেছে নিজ নিজ অদম্য অভিজ্ঞতাকে এবং স্ব-তন্ত্র অভিপ্রায়কে ব্যক্ত করার আবেগে। এবং এইভাবেই তারা তাদের ট্র্যাজেডির মধ্যে সংকেতিত করেছে জীবনের পূর্ণতা। দান্তে শেক্সপীয়র অথবা মিল্টন তাঁদের অভিজ্ঞতাকে ন্যস্ত করেছিলেন শব্দের বিরাট বিচিত্র আধারে। অভিজ্ঞতার কোনো স্তর সেদিন উপেক্ষণীয় ছিল না। সেদিন কিছুই গৌণ হয়ে যায় নি। কোনো অভিজ্ঞতার উৎস সেদিন রুদ্ধ হয়ে যায় নি। তাই শব্দেরা সকলেই সে দিন ছিল ব্যবহৃত ও ব্যবহার্য।

কাব্যিক মাধ্যমের সংকট তীব্র হয়ে উঠেছে গত শতাব্দীতে। কিন্তু তার পৃষ্ঠপট ও ইতিহাস রচিত হয়েছে আরো এক শতাব্দী আগে। তাত্ত্বিকভাবে রুশো যখন সভ্যতাকে অভিযুক্ত করলেন তখন এর সূত্রপাত। ক্যাপ্টেন কুক যখন তাহিতি দ্বীপ এবং দ্বীপবাসীদের জীবনকে আবিষ্কার করলেন তখন পাশ্চাত্ত্যবাসীদের কারো কারো কাছে একদিকে যেমন রুশোর বক্তব্যের সারবত্তা সমর্থিত বলে প্রতিভাত হল, তেমনি কিছুকালের মধ্যে দ্বীপবাসীদের কাছে বয়ে নিয়ে যাওয়া পাশ্চাত্ত্য predicaments-এর প্রতিক্রিয়ায় সভ্যজগতের অন্তর্গত সংক্রামক-ক্ষয় ও পচনসৃষ্টি সম্বন্ধেও সচেতনতা বাড়তে লাগল। সতেরশো একাত্তর সালে ফরাসী সরকারের ও মিশনারিদের তাহিতি-নীতির বিরুদ্ধে দিদেরো যে অভিযোগবাণী উচ্চারণ করলেন, তার মধ্যে ধ্বনিত হল খৃষ্টীয় বিশ্বাস সম্বন্ধে এবং সভ্যতা সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্যবাসীরই তীব্র সংশয়। এ ফরাসী বিপ্লবের আগের কথা। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে গগ্যাঁ যখন তাহিতি বালিকাদের ছবি এঁকেছেন তখন আধুনিক সভ্যতার আত্যয়িক রূপ সম্বন্ধে সচেতনতা অগ্রণী মনীষী মানসে আরো বদ্ধমূল হয়েছে। গগ্যাঁর আঁকা তাহিতি নারীপুরুষেরা কেউ হাসে না, স্বর্ণাভ বর্ণাঢ্যতা ও উজ্জ্বল রৌদ্র রঙ নিয়েও তারা ম্লানমুখী; তারা আর নাচে না; বিধ্বস্ত অতীতের স্মৃতিতে তারা বিষণ্ণ। গগ্যাঁর Never more ছবি যেন সভ্যতারই পরোক্ষ পরিচয়। শায়িত ক্লান্ত তাহিতি নগ্নিকা যেন পাশ্চাত্ত্য সফিস্টিকেটেড সভ্যতার দ্বারা ধর্ষিত এক সৌন্দর্য। সে মৌন, শূন্য, তার প্রতীক্ষাও শূন্য। এও এক নীরবতা।

এই শতাব্দীরই শেষার্ধে মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতা সম্বন্ধে নবলব্ধ জ্ঞান ও পুরানো প্রকাশরীতির মধ্যবর্তী ব্যবধান সম্বন্ধে সচেতনতা থেকেই প্রচলিত ভাষার অনুপযোগিতা কবিদের কাছে ধরা পড়েছে। সভ্যতার ও সমাজের আত্মগ্লানি, ধর্মীয় বিশ্বাসের সীমাবদ্ধতা, শিল্পবিপ্লবের ফলে ব্যক্তির নৈঃসঙ্গ্য ও অসহায়তা এই ব্যবধানকে আরো বাড়িয়েছে। র‍্যাঁবো ভাষাকে মুক্তি দিতে চাইলেন কার্যকারণ পরম্পরাযুক্ত বন্ধন থেকে। ঘটনা তাঁর কাছে উন্মোচিত

হল কার্যকারণের পারম্পর্যহীন যৌগপদ্যে'। মালার্মে শব্দকে ভাব সঞ্চারিত করার মাধ্যম হিসাবে যত না প্রয়োগ করলেন, তার চেয়ে বেশি শব্দ তাঁর কাছে হয়ে উঠল গূঢ় রহস্যে দীক্ষিত করার মান্ত্র ক্ষমতায় বিশিষ্ট।

গত শতকেই দেখা যায়, যে-কোনো দিকেই হোকনা কেন, কবি ঔপন্যাসিক বা শিল্পীর কাছে সমাজ বা রাষ্ট্র ব্যক্তিত্বনাশক বলে ধীরে ধীরে পরিগণিত হয়েছে। সেই পুরাতন একাভিপ্রায়ী শব্দধৃত অভিজ্ঞতারা হারিয়ে গেছে। পক্ষান্তরে শিল্প, সংগীত, কাব্য,—সমাজকে অথরিটি-স্বরূপ জ্ঞান করে তাদের বিপরীতে নিজেকে স্থাপন করতে চেয়েছে। আঠারোশো পঁচানব্বই সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি চিঠিতে লিখছেন, "ক্ষুদ্র এবং কৃত্রিম সমাজবন্ধনগুলি সমাজের পক্ষে বিশেষ উপযোগী, অথচ সংগীত এবং উচ্চ অঙ্গের আর্ট মাত্রেই সেইগুলির অকিঞ্চিৎকরতা মুহূর্তের মধ্যে উপলব্ধি করিয়ে দেয় –সেই জন্যে আর্ট মাত্রেরই ভিতর খানিকটা সমাজনাশকতা আছে।" ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ব্যক্তি আস্তে আস্তে সমাজের pressure group-গুলি সম্বন্ধে সচেতনতা পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের উক্তিটির মধ্যে ব্যক্তির সেই যুগধৃত যন্ত্রণার ইঙ্গিত লভ্য। এই সভ্যতা যখন শুধু গগ্যাঁ, র‍্যাঁবো, কাফকা প্রভৃতির কাছেই নয়, আরো অনেক অগ্রণী ভাবুকের কাছেই অসুস্থ বলে বিবেচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথও অনুভব করেছিলেন, "য়ুরোপের সভ্যতা ক্রমে যেন মর্বিড হয়ে আসছে।" এই ব্যাধিচেতনার মধ্যে দাঁড়িয়েই কবিরা সেদিন উপলব্ধি করেছেন যে শব্দেরা হারিয়ে ফেলেছে সর্বাশ্লেষী ক্ষমতা। আবার অন্যদিকে বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান এবং বৌদ্ধিক চর্চার নানা দিগন্ত যত বিস্তৃত হয়েছে তত non-verbal ভাষার পরিধিও বেড়ে গিয়েছে। এর ফলে তুলনাগতভাবে কবিব্যবহৃত শব্দের অধিকার-সীমা হ্রাস পেয়েছে। 'অসীম' বলতে কাব্যে আমরা যা বুঝব, যথা "হেরি সে অসীম মাধুরী হৃদয় উঠিছে গাহিয়া"—তা নিশ্চয়ই গাণিতিকের infinity নয়। সর্বদা পরিবেষণযোগ্য ভাষায় বিজ্ঞান, দর্শন, প্রাণীবিদ্যা আলোচিত হয় না। অথচ অতীতে দেখেছি যে, এক একজন শেক্সপীয়র বা মিল্টন বা ডান বিজ্ঞান, দর্শন, সংগীত, শিল্প সকল বিষয় সম্বন্ধেই স্বচ্ছন্দভাষী হতে জানতেন এবং পারতেন। এখন অভিজ্ঞতারা আগের মতো সার্বজনীন নয়, বিশেষীকরণের যুগে শব্দেরাও এক একটা খোপে বন্দী হয়ে গেছে। সেখান থেকে তাদের বের করে এনে সাধারণের ভাঁড়ারে মিলিয়ে দেওয়া 'সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ'। সাধারণভাবে শব্দ-দৈন্যের এই সংকটের বোধ আসলে প্রযুক্তিবিদ্যার চরমোৎকর্ষের যুগে অনন্বিত মানুষের আত্মিক সংকটের উপলব্ধি। এবং এই সকল কিছু একত্রে সচেতন

মানুষের কাছে অস্তিত্বের যে জটিলতা রচনা করেছে তারই প্রতিরোধ গড়তে গিয়ে বিকল্পবিহীন যে-আশ্রয় মানুষকে আকর্ষণ করেছে তা হল নীরবতা। এক একজন কবির নীরবতার ব্যক্তিগত চরিত্র আধুনিক কাব্য পাঠকের বিশেষ আলোচ্য।

দুই

তবে একথাও ঠিক, অদ্বিতীয় অভিজ্ঞতার কাছে মানুষের উচ্চারিত ভাষা-মাধ্যম এর আগেও কখনো কখনো অতিসীমিত অথবা নিরর্থক বলে মনে হয়েছে। দান্তের কাব্যে ও শেক্সপীয়রের চরিত্রের ভাষায় সেই বিচিত্র অনুভূতির দেখা পাওয়া যায়। পারাদিসোর প্রথম ক্যান্টোয় তীর্থংকর যখন বিয়াত্রিচের চোখের গভীরে তাকালেন তখনকার বর্ণনায় দান্তে বলেন, to go beyond the human cannot be signified in words ; কেবল তাই নয়, পারাদিসোর তীর্থংকর তার পরম দৃষ্টির সব কিছুকেই যেন বাণীমাধ্যমে ব্যক্ত করতে পারছে না, কবিও মৌনের কাছে আশ্রয়ার্থী। থিয়োলজির দিক থেকে এই দিব্যদৃষ্টির প্রসাদ অবর্ণনীয়—এ ব্যাখ্যাতে এখানে আমাদের আশা মেটে না। যে কোনো বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতাকেই শব্দমূর্তি দিতে গেলে দেখা যায় উপাদানেরা কত বিবর্ণ। কিন্তু দান্তের বেলাতে আমরা দেখেছি অভিজ্ঞতাটি বিশুদ্ধ বলেই তার আলোয় ঐ বিবর্ণ উপাদানেরাই কত সুবর্ণ হয়ে উঠতে পারে। সেই মধ্যযুগের অবসানের কালে দান্তের কাছে প্রথম মানুষের জীবন্ত ঐতিহাসিক বাস্তবতা স্বীকৃতি পেয়েছিল, তাই দান্তে তাঁর তুরীয় অভিজ্ঞতাকে বাচনিক বোধ্যতা দিয়েছেন মানুষের তাৎকালিক ভাষাধারে। যেখানে মানুষের ভাষা পেঁছিয় না সেখানকার কথা ব্যক্ত হল মানুষেরই কল্পনায় ; এও যেন সেই ঐশী করুণায় নিজেরই আত্মপ্রকাশ। এও যেন তাঁরই লীলা।

অন্যদিকে শেক্সপীয়রের মানুষেরা দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ হৃদয়কে চলে যেতে দেখেছে শব্দ মাধ্যমের বাইরে। সেখানে আর স্মৃতিও কার্যকরী নয়। কেননা শব্দেরা বিদায় নিতে চাইলে শব্দবন্দী স্মৃতিও বাষ্পীভূত হয়ে উবে যায়, ভেঙ্গে পড়ে। উচ্চারিত শব্দেরা যে তাৎপর্য সৃষ্টি করে তার শেষ সীমায় পেঁাছে যাওয়া গেল, তাঁর একাধিক ট্র্যাজেডির পরিণাম-অংশে বিভিন্ন চরিত্রমুখে একথা ধ্বনিত হয়েছে। মথিত-হৃদয় ব্রুটাস আত্মঘাতনের পূর্বমুহূর্তে উপনীত হয়েছিলেন সেই মহা নীরবতার দ্বারে ; তাই তিনি বলেন, Brutus' tongue/ Hath almost ended his life's history—অন্তরের ঘাতে প্রতিঘাতে

অবসন্ন ব্রুটাস সমস্ত অভিজ্ঞতার, তথা, অকৃতার্থতার বোঝা এবার নামিয়ে ফেলতে চান, শব্দেরা অভিজ্ঞতার বাহন, তাই তাদেরও ছুটি। অপর ক্ষেত্রে উদগ্র জীবন-বাসনায় ক্লিওপেট্রাও চেয়েছিলেন মানবিক বাঙ্ময়তার ওপারে চলে যেতে, তারই ইঙ্গিত তাঁর অন্তিম উক্তিতে, I am fire and air ; my other elements I give to baser life, রাজা লিয়রের বক্ষফাটা জীবননাট্যের অন্তে এ ব্যাপারটা আলবানির কাছে অনুভূত হয়েছে। The weight of this sad time we must obey/Speak what we feel, not what we ought to say—এবং সেই যবনিকার ছায়ায় ধ্বনিত হল সৈন্যদের dead march-এর শোকগীত। শব্দরা হারিয়ে গেল শব্দাতীতে। ব্রুটাস বুঝেছিলেন যে যন্ত্রণাময় অভিজ্ঞতা তাকে নিয়ে গেল জীবনেতিহাসের শেষ বাণীতে ; ম্যাকবেথ জটিল অনুশোচনার অমীমাংসায় অনুভব করেছিলেন, To the last syllable of our recorded time-এর পুনরাবৃত্ত আশ্বাসহীনতা। নীরবতা, সময়-প্রহত ক্লান্তি ও ব্যর্থতা উভয়ক্ষেত্রেই একত্র হয়েছে। সেই চূড়ান্ত আশ্বাস-হীনতায় ব্যক্তির কাছে জীবন হয় মূর্খ-বর্ণিত গল্প—যা শুধুই শব্দঝঙ্কার, অন্তর্গত তাৎপর্য থেকে বঞ্চিত। মূর্খ বর্ণিত গল্পের বাক্‌প্রতিমায় শব্দের অক্ষমতা সম্বন্ধীয় চেতনা এক হিসাবে জীবনের অবর্ণনীয়, অব্যাখ্যেয় জটিলতার স্বীকৃতি। এই সংলাপের পরক্ষণেই দূতকে দেখে ক্লান্তপ্রাণ ম্যাকবেথের আবার মনে পড়ে গেল শব্দময়, তথা, স্মৃতিতিক্ত জীবনের কথা। দূতকে দেখে ম্যাকবেথের মন্তব্য লক্ষণীয়, Thou com'st to use thy tongue। স্বগতোক্তির নিহিতার্থে যে নীরবতার বাসনা, তাই যেন দূতের উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত রূঢ়োক্তিতে আরো স্পষ্ট হল। হ্যামলেটের ধূসর আত্মগ্লানি সকল প্রয়াসের অন্তে এক মহানীরবতার কাছে আত্মসমর্পণ করে, The rest is silence। দান্তের মানবিক উত্তরণ-অভীপ্সা তীর্থঙ্করকে যে-নীরবতার দ্বারে নিয়ে গেল, স্বরূপত সে এক অনন্ত শান্তির উদ্বোধক ; জীবনের রক্তাক্ত ভূমিতে ধূসরিত কর্দমাক্ত মানবপ্রাণ যে নীরবতায় সমাহিত হতে চায় শেক্সপীয়রের ট্রাজেডিতে তারই ইঙ্গিত।

শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডির অন্তকালে এই নীরবতার অভিমুখিতা, নায়কদের মতই ব্যর্থতার এক করুণ অর্থগৌরবে পূর্ণ। বুর্জোয়া বিপ্লবের সেই বসন্ত উল্লাসের দিনে সামন্তীয় প্রথাবন্ধনের বিরুদ্ধে 'স্বাধীন মানুষে'র বিদ্রোহই ছিল প্রধান অনুভববেদ্য বিষয়। তাই শেক্সপীয়রের ব্রুটাস, লিয়র, ম্যাকবেথ, হ্যামলেট সকলেই মানুষের অদম্য অবার্য ব্যক্তিত্বের বিপুল উদ্ভাসনের নিদর্শন। তাঁদের কারো ব্যক্তিত্বের একতিল অবনমন ঘটাতে পারেনি কেউ—না আইন, না

নিয়তি, না ঈশ্বর, না মৃত্যুভয়। তারা যা ছিল, ধ্বংসের পূর্বমুহূর্তেও তারা তাই রইল। মৃত্যুমুহূর্তে যে নীরবতাকে তারা খুঁজেছে, তা তাদের দিয়েছে সব বন্ধনকে উপেক্ষা করার শক্তি। এই নীরবতার প্রাতিস্বিক বাসনাই সেদিনের অর্বাচীন বুর্জোয়াকে (upstart bourgeois) প্রতিষ্ঠিত করল শ্রদ্ধার্হ আভিজাত্যে।

তিন

The rest is silence—জটিল তরঙ্গরাশির সংঘাতময় ফেনিলতার মাঝেই আধুনিক মানুষ চেয়েছে ডুব দিতে অতল নৈঃশব্দ্যে; যে গান কানে যায় না শোনা, তাকেই মানুষ শুনতে চেয়েছে অতলের সভায় আর্তহৃদয়ে। র‍্যাবো এবং হোয়েলডারলিন ব্যক্তিগত জীবনে অচিরে চলে গেলেন নৈঃশব্দ্যের অন্তরালে। দুজনের প্রকাশময় সমুজ্জ্বল কবিজীবনের সময়কাল বড় সীমিত, প্রথমোক্তের আত্মনির্বাসন, আর দ্বিতীয়ের অচঞ্চল উন্মাদদশা দুজনকেই নিয়ে গেল অপ্রকাশের অরবতায়। কিন্তু মুখরতার কূল থেকে দুজনের এই বিদায়ের মধ্যে ওঁদের কবিজীবনের মৌল সার্বভৌম যুক্তি সক্রিয়। হোয়েলডারলিন জেনেছিলেন স্থির থেকে যেতে হবে স্থিরতরের দিকে। তাই কি সব চঞ্চল অর্থবানতার হাত থেকে ছুটি নিয়ে তিনি ডুব দিলেন অসংজ্ঞেয় এক নিজস্ব নির্জনতায়? র‍্যাবো কি বুঝেছিলেন নাগরিক অনির্দেশ্যতার মধ্যে এক দুঃসহ নিরর্থকতা গম্বুজের চূড়ার মতোই ইঙ্গিত করেছে এসবের ওপারে চলে যেতে? তাই কি এই স্বেচ্ছানির্বাসন? এ শব্দবৈরাগ্য স্বরূপত কী? যাই হোক, হোয়েলডারলিন এবং র‍্যাবো এ বৈরাগ্যকে আর খণ্ডিত করেন নি। একদা সমাজ-বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীপিত, কঠোর ধর্মীয় শিক্ষায় প্রতিক্রিয়ান্বিত, শৈশবের পারিবারিক জীবনে ধর্মিষ্ঠা, অনমনীয়া মা এবং পরিহারক পিতার বিচিত্র স্মৃতিতে গঠিত এই কবি অন্তহীন অভিজ্ঞতার বলেই বুঝেছিলেন, যে অভাবনীয় আমাদের বক্ষ জুড়ে, তার ভাষা হবে আত্মার কাছে আত্মার ভাষা। তাই সব বচনের সীমান্ত পেরিয়ে সেই অনির্বচনীয়ের দিকে যাত্রা।

বাণিজ্যজীবী হাটের ভাষা, বাটের ভাষা, মানুষের অন্তরের ভাষা হয়ে ওঠে না তা নয়। কিন্তু তাকে কাব্যের ভাষায় উন্নীত করতে গেলে ব্যক্তির মানসোৎকর্ষের তারতম্য অনুযায়ী ব্যবহারের স্বাতন্ত্র্যের ভিতরেই তারা নতুন হয়ে ওঠে। তা নইলে সাধারণত শহর-গঞ্জের ভাষা, কলকারখানার দুপাশের ভাষায় প্রাত্যহিক দায়মোচনের ক্লান্ত বিবর্ণতা। বুর্জোয়া-বিকারের শেষ পর্যায়ে

মুমূর্ষা শুধু মানুষেরই হৃদয়ের অভিজ্ঞান নয়, শব্দেরাও মুমূর্ষু। হাসপাতালে 'উঃ' শব্দের কোনো ব্যঞ্জনা নেই। রণক্ষেত্রে মৃত্যুকালীন আর্তনাদ অভ্যস্ত হয়ে যায়। র‍্যাঁবো তাই দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের পতনের পরে ফরাসী চেতনার কুহেলী সন্ধ্যার বিবর্ণতায় দাঁড়িয়ে একথা বুঝেই খুঁজেছিলেন শব্দোত্তরকে। এ পথেই নীরবতার মধ্যে নিহিত হলেন র‍্যাঁবো। মুখরতার উপকূলে আর তার প্রত্যাবর্তন ঘটল না। আইকেরাসের মতোই মানুষের হাতে গড়া ডানায় তিনি নীলিমা ভেদ করে যেতে চেয়েছিলেন মহাপ্রত্যক্ষের উদ্দেশ্যে। সেই প্রত্যক্ষই তাঁর ডানা দুটিকে পুড়িয়ে তাঁকে ফেলে দিল মর্তলোকে।

চার

এখানে রবীন্দ্রনাথ ঊনবিংশের শেষ দশক ও বিংশের প্রথম দশকে অনুভব করেছিলেন এক নীরবকে। তাঁর পক্ষে কিন্তু এ নীরবকে উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। দেশকালের বন্ধনের আপেক্ষিক গুরুত্বে তিনি স্বদেশ-ইতিহাসের সূত্রটির মূল্য কখনো হারিয়ে ফেলেন নি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতার ঔপনিবেশিক মধ্যবিত্ত জীবনচর্যার সহস্র খন্ডায়নের মধ্যেও তিনি লক্ষ করেছিলেন যে, আমাদের ভাষা মধ্যযুগীয় একদেশদর্শিতাকে পরিহার করে এক অপক্ষপাতী সার্থকতার সন্ধানী হয়ে উঠেছে। রামমোহনে-বিদ্যাসাগরে তার সূচনা, বঙ্কিমচন্দ্রে তার বিকাশ। সোনার তরী-চিত্রা-কল্পনায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের হাতে প্রতিষ্ঠিত-প্রাণ সেই ভাষা-সরস্বতীর প্রেমে পড়েছিলেন। এবং তা ব্যর্থ-প্রেম নয়। সেই প্রেমাঢ্য মুহূর্তে তিনি যে-কথা, যে-শব্দই ব্যবহার করেছেন, তার নূতনত্বের নেশা আসলে সেই প্রেমেরই বিহ্বলতা। অথচ, সেই ছিন্নপত্রাবলীর দিনগুলি থেকেই তিনি জেনেছেন যে কোথাও কিছু থেকে যাচ্ছে অসেতুবন্ধ্য। শিলাইদহ শাজাদপুরে, কলকাতার কল্লোলের পরিবর্তে তিনি পেয়েছিলেন যে স্তব্ধতার অনুভব, তা তাঁকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। পত্রে পত্রে সে স্তব্ধতার কথা তিনি বলেছেন। এ থেকে যেতে পারতো শুধু এক ভৌগোলিক স্তব্ধতা, কিন্তু এই স্তব্ধতার পাদপীঠে বসেই তিনি আবিষ্কার করলেন তাঁর একান্ত নিজের এক অন্ধকারকে। তাই দেখা যায় যে তাঁর হাতে আর যে দুটো মাধ্যম ছিল, গানে এবং ছবিতেও সেই অনির্বাচ্যের ইশারা। তাই পূরবীতে টোড়িতে অথবা ভৈরবীতে তিনি অনুভব করেছেন অস্তিত্বের সহজাত ঔদাস্য এবং বিষাদ। আকাশের ঐ নক্ষত্রমালার স্তব্ধতার দিকে তাকিয়েই পরবর্তী সময়ে তিনি বলেছিলেন—

সে দিনে ধন্য হবে তারার মালা
তোমার এই লোকে লোকে প্রদীপ জ্বালা
আমার এই আঁধার টুকু ঘুচলে পরে ।।—

এ আঁধার তাঁরই ব্যক্তিগত অন্ধকার। যাকে তিনি পেয়েছিলেন তাঁর শোকে, আধিতে, ব্যাধিতে আকুলতায় এবং সর্বোপরি এ দেশের জীবনের সুবিস্তৃত ব্যর্থতায়, যার ইঙ্গিত রয়েছে ছিন্নপত্রাবলীর ১৫৩ সংখ্যক চিঠিতে। নিজস্ব এই অন্ধকারও যেমন ভাষাহারা, আর এর বিপরীতে রয়েছে যে পূর্ণতা, সেও তেমনি অনির্বাচ্য। এই দুইয়ের সম্মুখীনতায় গড়ে উঠেছে তাঁর নীরবতার চেতনা। তখন তাঁর ভাষা আর প্রত্যক্ষকে বর্ণনা করে না, বর্ণনা করে না যা দেখছেন তাকে। সে তখন সঞ্চারিত করতে চায় যা তিনি অনুভব করছেন তাকেই। "নীরব যিনি তাঁহার পায়ে নীরব বীণা দিব ধরি"—এখানে 'নীরব বীণা' যুক্ত তাঁর অশ্রুর সঙ্গে, আর, সেই অশ্রুর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অসার্থক জীর্ণতরীর ঘাটে ঘাটে ঘুরে বেড়ানোর ক্লান্ত স্মৃতি। 'নীরব যিনি'—এই অংশে 'নীরব' শব্দে ব্যক্তির সেই অমিত অথচ অসাধ্য অভিপ্রায় (প্রাণের বীণা নিয়ে যাব সেই অতলের সভা মাঝে) আভাসিত হল এবং এই দুয়ের সম্মুখীনতায় গাঢ় হয়ে উঠল এক আত্মবিলোপী সমাহিত ভাব।

"নীরব" গীতাঞ্জলির ক্ষুদ্রকায় লিরিকগুলিতে বহুব্যবহৃত শব্দ। কখনো 'নীরব আলোক', 'নীরব আকাশ', কখনো বা 'নিশার মতো নীরব', কখনো বা 'আঁধার আকাশের নীরবতা' এই কাব্যের কবিতাগুলিতে আবির্ভূত হয়েছে। কখনো এ আপনাতে আপনি পূর্ণ, তখন 'নীরবতায় বাজছে বীণা/বিনা প্রয়োজনে'। কখনো আপনার ভারে আপনি দুঃসহ, 'হেথা যে গান গাইতে আসা আমার / হয় নি সে গান গাওয়া'। এবং এ নীরবতা কোনো ক্ষেত্রেই অরবতা নয়—নয় শুধু শব্দশূন্যতার অনুভূতি। এ এক প্রত্যক্ষ অস্তিবাচক সন্দর্শন। এমন কি এও শ্রাব্য, 'সকল আলাপ গেলে থেমে / শান্ত বীণায় আসে নেমে / সন্ধ্যা যেমন দিনের শেষে বাজে গভীর স্বনে'। শেষ পংক্তিটির অসামান্যতায় যে অতীন্দ্রিয়তা তা ব্যাখ্যেয় নয়। পীড়িত, তাপিতব্যথিত ব্যক্তি কোথায় খুঁজে পাবে বিরোধ-বিহীন সেই স্তব্ধতা, যা বৃক্ষ ইব ? তাই তাঁর তখনকার অভিজ্ঞতার সেই শতখণ্ডিত বহির্জগত সম্বন্ধে এই প্রার্থনা গুঞ্জরিত হয়—'নীরব রাত্রে হারাইয়া যাক / বাহির আমার বাহিরে মিশাক / দেখা দিক মম অন্তরতম অখণ্ড আকারে'।

এই নীরবতা প্রধানত রাত্রির অনুষঙ্গকে বহন করে। বীণা যেখানে নীরব, রাত্রি সেখানে স্বতঃনির্ধারিত। বীণা সোনার হলেই তার প্রভাতী

আলাপনের প্রত্যাশা। কবির বেশ কিছু সংখ্যক কবিতায় বীণা বা সংগীত চিত্রকল্পের প্রধান উপাদান হিসাবে গৃহীত হয়েছে। বীণা বা সংগীত সেই আকুলতাকে ধারণ করে, যে-আকুলতায় আধার এবং আধেয় গলে মিশে যাবে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে একটা বিচিত্র ব্যাপার লক্ষ করা যায়—তাঁর নীরবতা কখনো সাংগীতিক শুদ্ধতায় গাঢ় হতে চায়, কখনো এ মিশে যেতে চায় আলোক-সমুদ্রে, কখনো বা এ রজনীর অন্ধকারের মৌনকেই মূর্ত করে তুলতে চায়। প্রথম দুটি ক্ষেত্রে এ নীরবতায় উত্তরণের অভীপ্সা। প্রথম ক্ষেত্রে কথা পাখা মেলে উড়ে যেতে চায়। উদ্দেশ্য আর উপায় সেখানে সাংগীতিকতায় অবিভাজ্য হতে চেয়েছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কথা ভেসে যেতে চায় পাল তুলে আলোকের ডাকে। প্রথমটির উদাহরণ "এবার নীরব করে দাও হে তোমার" কবিতাটি; দ্বিতীয়টির উদাহরণ, "প্রেমে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে"। তৃতীয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ যেখানে তিনি অন্ধকারের মৌনকেই মূর্ত করতে চেয়েছেন সেখানে মৌন আর কবিই হতে চেয়েছেন অবিভাজ্য, যেমন "রূপসাগরে ডুব দিয়েছি" কবিতাটি। আরো লক্ষণীয় যে, শব্দেরা এখানে সাধারণত সাধারণ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে, সংগীতের প্রশ্রয় ছিল বলেই বোধ হয়, একেবারে 'গাদ্যিক' শব্দও প্রযুক্ত হয়েছে। 'পথিকহীন'-এর মতো সমাসবদ্ধ পদ (একেলা কোন পথিক তুমি পথিকহীন পথের পরে) অথবা 'ভবিতব্যে'-র মতো নিছক গদ্যময় শব্দ (দিগন্তরালে কোন ভবিতব্যতা) গীতাঞ্জলিতে ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দগুলি যেন নীরবতার সায়রে স্নান করে শুদ্ধ হয়ে এল। তখনই তাদের সাধারণত্ব ঘুচে গেল। ভাষার প্রকৃতি সম্বন্ধীয় যে নিরীক্ষা গীতাঞ্জলিতে ছিল কবির অন্যতম অভিপ্রায়, সে নিরীক্ষার মূল কথা হল শব্দেরা যে অতলস্পর্শকে ঢেকে রয়েছে, সে কথা জানানো, এবং শব্দেরই সাহায্যে সেই ঢাকা খুলে দেওয়া। "নীলাজ নীল" এবং "কালো কল্পনার" মতো শব্দগুচ্ছে সেই অতলস্পর্শকে ছোঁবার চেষ্টা।

ব্যক্তি জীবনের সংকট, এবং স্বদেশের নানা অসঙ্গতির মাঝে এই 'নীরব'কেই কবি জেনেছিলেন গভীরতর বাস্তবতা বলে। তাঁর গল্পগুচ্ছের 'মাষ্টার মশাই' গল্পের হরলাল কলকাতার স্থূল যান্ত্রিকতার ইতর এবং বৈষয়িকতা-বিকৃত কোলাহলের মাঝখানে আপন অনুচ্চ স্বভাবের নীরবতায় চিহ্নিত। সেও বেণুকে ভালবেসে যেন Tonio Kroeger-এর মতো এ কথাই অনুভব করল যে He who loves the more is the inferior and must suffer। এই যন্ত্রণাভোগই শেষ পর্যন্ত হরলালকে নিয়ে গেল আত্মগত নীরবতার উপসংহারে। সে শেষ মুহূর্তে এই উপলব্ধিতে পৌঁছল যে তার বন্ধনমুক্ত হৃদয়ের মধ্যেই

অনন্ত আকাশের অনুভব'। সেখানে তার কলকাতার কলরব মিথ্যা হয়ে যায়। কবি বুঝেছিলেন, কলোনির মধ্যবিত্ত ধমনীতে যে ক্লান্ত বিবর্ণ পৌনঃপুনিকতা খেলা করে, তা থেকে মুক্তির রাস্তা মনুষ্যত্বের এবং ব্যক্তির সামগ্রিক উদ্ধারে! তাই তাঁর এ আনুভাব্য নীরবতায় ছিল মুক্তিকামী ব্যক্তির স্বাধিকার নিবেদন। সেজান-এর আপেলপুঞ্জের মতো তিনিও এ নীরবতা আপন ব্যক্তি-স্বাক্ষরে মুদ্রিত করেছেন। অথচ তিনি আধুনিক কবি বলেই একথা জানতেন যে এ নীরবতায় তাঁর লীন হয়ে যাবার কথা নয়। এও জানতেন, এ নীরবতা যখন বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অতিবাস্তব হয়ে উঠতে চায় তখনই এ হবে "উটের গ্রীবার মতো নিঃস্তব্ধতা"। উটের অনুষঙ্গে তাহলে ফুটে উঠতে চাইবে মরুশূন্যতা, এবং এক অর্ধপরিচিত কিম্ভূতকিমাকার অস্তিত্বের ছবি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মানুষের নৈঃসঙ্গ্যকে জানতেন বলেই, এ-ও জেনেছিলেন যে, এ নীরবতা কখনো কখনো ভেঙ্গে ফেলতে হয়। গীতাঞ্জলিতে নীরবতা গড়া, বলাকায় ভাঙ্গা। এই গড়াভাঙ্গার তীব্র আর্তিকে ধারণ করতে গিয়েই সৃষ্ট হল কিংবা চরিতার্থতা পেল বলাকার ছন্দ। তিনি আবার বিজ্ঞান এবং দর্শনের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। এখানে আমাদের স্মরণে আসে এ শতকের আরেক মহত্তম লেখক টোমাস মানকে। তিনি তাঁর ক্লাসিক ছাঁদের নভেলগুলির মধ্যে সংগীততত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, মহাকাশতত্ত্ব, প্রাণতত্ত্ব সবকিছু মানবলব্ধ অভিজ্ঞতাকে একত্র করেছেন। বিজ্ঞান সাহিত্যের কাছ থেকে যা কেড়ে নিয়েছিল, মান আবার তাকে পুনরুদ্ধারে প্রয়াসী হলেন। কারণ তাঁরও অন্বিষ্ট ছিল মানুষের অস্তিত্বের সমগ্রতা। রবীন্দ্রনাথও স্বভাবত আধুনিক কবি বলেই দর্শন বিজ্ঞান কাউকেই পরিহার করলেন না, এবং সঙ্গে সঙ্গে মানবহৃদয়ের আনুভাব্য নীরবতাকেও তিনি উপেক্ষা করলেন না। তাই তাঁর নীরবতার জগতের আকর্ষণে বলাকার পংক্তিগুলি কখনো হয়েছে মিতবাক, প্রকাশের আবেগে কখনো তারা হয়েছে দীর্ঘায়িত। এই দ্বান্দ্বিকতার ভিতর দিয়েই বলাকার ছন্দের প্রকৃতি নির্ধারিত হল।

অপর দিকে এ নীরবতার জগতে জীবনের প্রবেশাধিকার হারিয়ে গেল না বলে তাঁর 'নীলমণিলতায়' (বনবাণী গ্রন্থে) অতিবাস্তবকে উপেক্ষা করেই নানা অসম্ভব ব্যাপার ঘটল। সেই নীরবতার জগতে শ্রাব্য ও দৃশ্যের ব্যবধান ঘুচে গেল। এভাবে এই নীরবতার জগত রচিত না হলে ইন্দ্রিয়ের ব্যবধান এমন সুন্দরভাবে ঘুচে যেতে পারত না। তাই "চাঁপার কাঞ্চন-আভা সে যে কার কণ্ঠস্বরে সাধা" অথবা, "করবীর রাঙা রঙ কংকন ঝংকার সুরে মাখা"—সে নীরবতার জগতে মিশে যায়। "তুমি সুদূরের দূতী নূতন এসেছ নীলমণি/

স্বচ্ছ নীলাম্বরসম নির্মল তোমার কণ্ঠধ্বনি" —এখানে নীরবই হল বাঙ্ময়। এখানে নীরবের যে ভাষাকে ব্যক্ত করার প্রয়াস তাকে কোন অর্থেই আমাদের প্রত্যহের ভাষায় বলা চলে না। চাঁপার কাঞ্চন আভা যদি শুধু অনুষঙ্গবাহী হয়, অথবা করবীর রাঙা রঙ যদি শুধু স্মৃতিকেই জাগিয়ে তোলে, তাহলেও সে স্মৃতি, সে অনুষঙ্গ, অন্তত এক্ষেত্রে শব্দ মুখাপেক্ষী নয়। সুতরাং এ নীরবতায় জগৎ নতুন করে নির্মিত হয়। এই এর গৌরব।

অথচ রোগশয্যায়, আরোগ্য এবং শেষ লেখার কতকগুলি কবিতায় সমাসন্ন নীরবতার অনুষঙ্গে কখনো রচিত হল পরিশেষ পর্বের সুবিখ্যাত জপমালার চিত্রকল্প, (বসে বসে কেবল গণি নীরব জপের মালার ধ্বনি / অন্ধকারের শিরে শিরে) কখনো ঊর্ধ্বের দিকে ইঙ্গিত করে এমন কোনো প্রসঙ্গ ("অদূরে বনের ঊর্ধ্বে মন্দিরের চূড়া" বা "বৃদ্ধ মহানিম / নিবিড় গম্ভীরতার অভিজাত্যচ্ছায়া" বা "শেষতীর্থমন্দিরের চূড়া")। 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থেও এই জীবনান্তিক নীরবতার সমাসন্নতা উপলব্ধ হয়েছে। এ যদি শুধু আয়ুষ্মান কবির প্রশান্ত অনুভব হিসাবেই মূর্ত হয়ে উঠত তা হলে পৃথকভাবে বলার কিছু ছিল না। কিন্তু এই শেষ সমাসন্ন নিস্তব্ধতার উপকণ্ঠে দাঁড়িয়ে সত্তার সমগ্র গভীরের সকল রহস্য তিনি পাঠ করতে চেয়েছেন। তারই উত্তরহীন অমীমাংসায় যে নীরবতা তা এক সদর্থক অনুভূতি। তা জীবনের জটিলতার স্মারক নয়, বিশাল অন্তহীনতার স্মারক। 'প্রথম দিনের সূর্য' কবিতায় সেই অনুত্তর স্তব্ধতার সাহায্যে কবি আর একবার ইঙ্গিত করলেন, জীবন সব বচনের থেকেও বড়। একে কোনো শব্দবন্ধনে ধরা যায় না। অস্তিত্বরহস্য দুরবগাহ।

আর, সেই আনুভাব্য অমেয়তাকে মূর্ত করতে হবে শব্দেরই সাহায্যে। কিন্তু তা বলে শব্দ থেকে পালালে চলবে না। Steiner তাঁর সুবিখ্যাত আলোচনায় Retreat from the word কথাটি ব্যবহার করেছেন। Retreat অর্থে পালানো নয়—বরঞ্চ শব্দের কাছ থেকে কবি সরে আসেন। ঐ নীরবতার প্রসাদ পেয়ে আবার শব্দকেই গভীরতা দেবেন বলে। 'প্রথম দিনের সূর্য' কবিতার বাক্‌সংযম সেই গভীরতার দান। গীতাঞ্জলিতে নীরবতার প্রসঙ্গে গানের শৈলীতে আমরা যে বাক্‌পরিমিতি লক্ষ্য করেছি, তার সঙ্গে 'প্রথম দিনের সূর্য' কবিতার বাক্‌সংযমের পার্থক্যটি অনুধাবনীয়। গীতাঞ্জলিতে জটিলতা গ্রন্থিমোচন করে ডুব দিতে চেয়েছে গভীরতায়। সেখানে নীরবতায় এই গভীরতার সন্ধান। আর 'প্রথম দিনের সূর্য' বা এই জাতীয় কবিতায় গভীরতা আত্মপ্রকাশ করেছে সরলতায়। তাই প্রথমোক্ত কবিতাগুলিতে শব্দের শান্ততা —দ্বিতীয়োক্ত কবিতাগুলিতে বাক্যের বাহুল্যবর্জিত রিক্ত ধ্যানাসন। প্রথমোক্ত

শব্দ তখনও কোমলতা খুঁজেছে। দ্বিতীয়োক্ত ক্ষেত্রে এসেছে এক তাপসী রিক্ততার শ্রী।

এ আসলে শব্দকেই পুনরুদ্ধার। শব্দকে খণ্ড করে অথবা বিসর্জন দিয়ে মানুষের অন্তর্বর্তী সেই অন্তহীনতাকে মূর্ত করা যাবে না। অচিন্ত্যকুমার বাংলা গদ্যরীতিতে এক সময় যে কাটা-কাটা, বামনীকৃত বাক্যপুঞ্জের প্রবর্তন করেছিলেন তার যোগ্যতা যাই থাক না কেন, সে ভাষায় আমরা রবীন্দ্রনাথের কর্ণকুন্তী সংবাদের কর্ণের ভাষাতীত নির্বেদের আভাস রচনা করতে পারি না। সমালোচকেরা ঠিকই বলেন যে, আর্থার মিলারের উইলি লোমানের বাক্‌রীতিতে মামুলি পাণ্ডিত্য বিতরণের চেয়ে ম্যাকবেথের মৃত্যুকালীন উচ্ছ্বাস অনেক বেশি ট্র্যাজিক, তাই, মহানীরবতার সন্নিহিত। (ইবসেনের কাছ থেকে বহু শিক্ষা গ্রহণ করেও মিলার ধরতে পারেননি যে ইবসেনের বস্তুতন্ত্রী ধারার পিছনে কোথায় কাব্যের স্থায়ী সুরটি বেজে চলেছিলে।)

চরিত্রের ছন্দভাষা

এক

নাট্যকাব্যে বা কাব্যনাট্যে অথবা সেই সব কবিতায়, যেখানে এক ব্যক্তিত্বময়, কি চরিত্রময় 'আমি' কথা বলে—সে সব ক্ষেত্রে কাব্যের যে ছন্দ তা শুধু কবিরই নির্বাচিত ছন্দাশ্রয় নয়। এবং আমরা যদি রবার্ট ফ্রস্টের এ উক্তিকে মেনে নিই যে, যেহেতু প্রতিটি কবিতাই একজনের প্রতি একজনের উক্তি, সেইহেতু সব কবিতাই নাট্যগুণান্বিত, এবং এই গুণই কবিতাকে বাঁচায় sing-song-এর কবল থেকে—তাহলে এই ফ্রস্টীয় নির্দেশকে মান্য করেই আমরা কবিতায় চরিত্রের কণ্ঠস্বর বা ছন্দ খুঁজে পেতে পারি। সেখানে ছন্দাত্মার সঙ্গে চরিত্রাত্মার যে মিলন সম্ভব হয় সেটাই আসল কথা। এবং সকল মিলনের মতোই সেখানেও প্রত্যাশার পরিচিত সরণীতেই অপ্রত্যাশিতের এবং অভাবনীয়ের আলো পড়ে। সেখানে দুর্বলতাও নিমিষে হয়ে ওঠে অক্ষয় দৃঢ়তা—কেবল তা চরিত্রটিরই স্বভাষা বলে। ওথেলোর সেই আর্ত, মর্মস্পর্শী আত্মোদ্ঘাটনের পংক্তিটি স্মরণীয়—It is the cause, it is the cause, my soul—এই পংক্তিতে তিনটি মাত্র বল-প্রস্বরিত দল। কিন্তু রসবিদেরা জানেন যে ঐ তিনটির ওপর যে ঝোঁক বা গুরু প্রাধান্য দেওয়া হল তা মাত্র কবিকৃত নয়, তা ওথেলোর চরিত্র প্রসঙ্গেই হয়ে উঠেছে আলোকসম্পাতী। পংক্তিগত দুর্বলতা এই অংশে উপেক্ষণীয়—ওথেলোর চরিত্রছন্দের করুণ গুরুত্বই এখানে দর্শক-শ্রোতাকে অথবা পাঠককে আকৃষ্ট করে। এ তুলনা বাঙলা ছন্দে অবশ্যই চলবে না। কিন্তু মাত্রা গণনার গাণিতিক বিশুদ্ধিকে রক্ষা করেও চরিত্রভাষা কেমন করে ছন্দভাষায় লয়ের এবং বাক্‌ছন্দের রূপান্তর ঘটায় মধুসূদন থেকেই তার প্রাথমিক দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা যায়। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গে রাবণের বিখ্যাত উক্তি স্মরণীয়ঃ

কে কবে শুনেছে পুত্র, ভাসে **শিলা** জলে
কে কবে শুনেছে, **লোক** মরি পুনঃ বাঁচে?

প্রথম চরণে বাক্‌ছন্দকে অনুসরণ করে প্রাধান্য আসে 'শিলা' শব্দের ওপর। দ্বিতীয় চরণে তা আসে 'লোক' শব্দে। এবং একথা কে না জানে যে এ শুধু পংক্তিতে ছেদ-মাত্রা বিন্যাসেরই কৌশল নয়—এ রাবণের নিয়তি-সম্ভব বিস্ময়ের প্রকাশও বটে। একে যদি পুরাতন কৃত্তিবাসী সিংসঙ্ ঢঙে পড়া যায়, তা হলে এর মধ্যে আর রাবণের চরিত্রগত বক্তব্যের কণামাত্রও খুঁজে

পাওয়া যাবে না। আবার ষষ্ঠ সর্গে মেঘনাদ যখন বলেন—"হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে"—তখন এতগুলি প্রান্তিক মুক্তদলের এবং "ইচ্ছি" শব্দের মতো সমস্বর অন্তর ধ্বনির সাহায্যে এক মন্থরতা সৃষ্ট হয়। সে মন্থরতা মেঘনাদের ঘটনা-বিমূঢ় ভাবনার মন্থরতা। পরবর্তী পংক্তিগুলিতে বিভীষণকে স্বমতে আনয়নের জন্য বা তার সুবুদ্ধি উদ্রেকের জন্য যে যুক্তিতর্কের অবতারণা, তার মধ্যেও আবেগ-কম্পন নেই। ছন্দও নিস্তেজ। ইচ্ছাকৃত এই নিষ্প্রাণতা—কেন না, বিভীষণের আচরণ মেঘনাদের হৃদয়কে করে তুলেছে হিমশীতল। কর্তব্যগত তার্কিকতাই তখন শুধু সজাগ। আবার সপ্তম সর্গে নিহত মেঘনাদের জন্য মন্দোদরীর বিলাপকে সংযত করতে গিয়ে রাবণ যা বলেছিলেন সেখানে ছন্দে এসেছে এক সর্বংসহ ভূধরের বেদনাবহন ক্ষমতা ঃ

"বাম এবে, রক্ষঃ কুলেন্দ্রাণি
আমা দোঁহা প্রতি বিধি ! তবে যে বাঁচিছি
এখনও, সে কেবল প্রতিবিধিৎসিতে
মৃত্যু তার ! যাও ফিরি শূন্য ঘরে তুমি ঃ—
রণক্ষেত্র যাত্রী আমি, কেন রোধ মোরে ?
বিলাপের কাল, দেবি, চিরকাল পাব !
বৃথা রাজ্যসুখে, সতি, জলাঞ্জলি দিয়া
বিরলে বসিয়া দোঁহে স্মরিব তাহারে
অহরহঃ। যাও ফিরি ; কেন নিবাইবে
এ রোষাগ্নি অশ্রুনীরে, রাণী মন্দোদরি ?
বন সুশোভন শাল ভূপতিত আজি ;
চূর্ণ তুঙ্গতম শৃঙ্গ গিরিবর শিরে ;
গগনরতন শশী চির রাহুগ্রাসে !"

বিস্মিত হতে হয় একটি সামান্য কৌশলের অসামান্য প্রয়োগে। এই বারো-তেরো পংক্তির ছন্দ স্তবকের মধ্যে চারটি ভিন্ন ভিন্ন অথচ একোদ্দিষ্ট সম্বোধনকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। উদ্‌গত অথচ নিরুদ্ধ অশ্রু যেখানে যেখানে বেদনার্ত বাক্যের পূর্ণতাকে বাধা দিয়েছে, সেখানে সেখানে ভিন্ন ওই সম্বোধন-গুলি বক্তাকে সাহায্য করেছে বাক্যের কঠিনতম অংশকে, সত্যের অসহ্য অংশকে গঠিত করতে, উচ্চারণ করতে। উক্ত সম্বোধনগুলির প্রথমটির ছয় কলামাত্রার মধ্যেই যে অস্বাভাবিক গুরুভার অর্পণ, 'এ' এবং 'আ'-এর মতো দীর্ঘস্বরকে পাশাপাশি স্থাপন—তা রাবণের সচেতন আর্থ প্রয়াসের সঙ্গে ঠিকভাবে মিলে গেছে—শোকবিহ্বল মন্দোদরীকে ভূমিকা-সচেতন করে তোলাই এর লক্ষ্য।

উদ্ধৃত অংশের দ্বিতীয় চরণের 'প্রতি বিধি' এই শব্দ দুটির সংঘাতেই জাগ্রত হয়েছে তৃতীয় চরণের 'প্রতিবিধিৎসিতে'-র মতো ভারী শব্দ। এখানে অভ্যন্তরীণ রুদ্ধদলটি মেঘাবৃত বজ্রের মতো সহসা গর্জে উঠেছে। এবং খণ্ড-তকে মাত্রা গণনায় উপেক্ষা করার ফলে যে দীর্ঘ স্বরতরঙ্গের সৃষ্টি হল তা সংকল্পময় রাবণের সুদৃঢ় ঘোষণার যোগ্য। অন্যদিকেও আভিধানিক অর্থকে ছাড়িয়ে এই মন্থর অথচ সুদৃঢ় ছয়মাত্রা বিধির বিপরীতে রাবণের সুদীর্ঘ সংগ্রামের সংকল্পকে ঘোষণা করছে। শেষ আকুল সম্বোধন 'রাণী মন্দোদরি'-র পরে আর দীর্ঘ বাক্য নেই। নিরুদ্ধ শোক আর জ্বলন্ত ক্রোধ তিনটি একপংক্তিক বাক্যে—তিনটি অতিশয়োক্তির সাহায্যে ব্যক্ত করেছে রাবণের মানসিক অবস্থা। এখানে আর প্রবহমানতার প্রয়োজন নেই। কিন্তু প্রাধান্য বা emphasis দেওয়া হল তিন পংক্তিতে তিন ভাবে। 'শাল' শব্দে এবং 'শৃঙ্গ' শব্দে মেঘনাদই উদ্দিষ্ট। কিন্তু শেষতম চরণে রাবণের বেদনা মেঘনাদের মৃত্যুকেই চূড়ান্ত বলে জেনেছে—তাই প্রাধান্য এল 'রাহু' শব্দে। এই Verse Paragraph-এর সমস্ত ঈদৃশ বৈচিত্র্য রাবণের চরিত্র-বৈচিত্র্যের স্মারক। পক্ষান্তরে পঞ্চম সর্গে প্রমীলার সংলাপে সমস্ত ছন্দটিই হয়ে উঠেছে নারীস্বভাবী—

> 'ভেবেছিনু যজ্ঞগৃহে যাব তব সাথে :
> সাজাইব বীরসাজে তোমায়। কি করি ?
> বন্দী করি স্বমন্দিরে রাখিল শাশুড়ি।'

'কি করি'-র 'কি' বাক্‌ছন্দে দুমাত্রা দাবি করলেও এখানে একমাত্রাতেই তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এখানে অন্তঃপুরচারিণী প্রমীলার প্রথানুগত্যই বড় কথা—সেই রাঘবীয় চমূলঙ্ঘনকারী প্রতিজ্ঞা এখানে অবান্তর। তাই 'কি করি'-র মধ্যে যে দ্বিধা তা আনুষ্ঠানিক রীতিগত দ্বিধা। 'কি' এখানে অস্পষ্টে উচ্চারিত। এ পুরুষের উচ্চারিত 'কী' নয়।

দুই

মধুসূদনই প্রথম জেনেছিলেন ছন্দের সেই রহস্য যা তাকে পারঙ্গম করে ছিল গীতিপ্রস্বর এবং বলপ্রস্বরকে সহযোগী করে তুলতে। বীরাঙ্গনার চরিত্র-কল্পনা এ বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করেছে প্রচুর। বীরাঙ্গনাতেই দেখা গেল তাঁর আবেগময়ী নায়িকাদের প্রেম এবং প্রত্যয়, গীতলতা ও দৃঢ়তাকে পরস্পরের প্রতিবাদী করে ফেলল না। ছন্দও হতে পেরেছে সেই একই কারণে শব্দের সঙ্গীত-তরঙ্গে আন্দোলিত, আবার কখন অগোচরে সে আন্দোলন রূপ নিয়েছে

এক বজ্রস্তনিত জলস্তম্ভের। সোমের প্রতি তারা, নীলধ্বজের প্রতি জনা এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে প্রামাণিক। দশরথের প্রতি কেকয়ী অবশ্যই সর্বাগ্রগণ্য। বীরাঙ্গনাতেই জানা গেল মধুসূদন 'লয়ে তিলোত্তমায়—অতুলা ধনী রূপে'—বা 'বিকল হৃদয়/ডোবে শোক সাগরে, মৃণাল যথা জলে'—প্রভৃতির মতো **যুক্তপাদিক** পংক্তির পক্ষপাতী হবেন না। অথচ যে **যুক্তপাদিক** পদের বৈচিত্র্যের ও অভিনবত্বের স্রষ্টা মধুসূদন তা ধ্বনির উত্থান-পতনে এবং লয়ের ধীরতায় ও অধীরতায় অভূতপূর্ব সংগীতের জন্ম দিয়েছে বীরাঙ্গনায়। বিষয় নয়, হৃদয়, হৃদয় নয় **চরিত্রই** এতদিনে হয়েছে এই ছন্দের যোগ্য আশ্রয়। এবং যে কথা বলা হয়, অর্থ এবং আবেগের মধ্যে মধুসূদন অর্থকেই 'অগ্রগণ্য' করেছিলেন —সে পক্ষপাত অন্তত 'সোমের প্রতি তারা' বা 'নীলধ্বজের প্রতি জনা'য় ঘুচে গিয়েছিল। সৃষ্ট চরিত্রপাত্রের টান এ ব্যাপারে টেকনিকের সীমাবদ্ধতা মোচনে সাহায্য করেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রবহমান পয়ার—চৌদ্দ এবং আঠারো মাত্রার দুই ধরনেরই—তার যাত্রা শুরু করেছে এখান থেকেই। মধুসূদনের হাতে ছন্দের ক্ষেত্রে অর্থ যেমন আবেগকে গৌণ করে এগিয়ে যেতে চাইত, এবং তাকে পূরণ করতে গিয়ে মধুসূদনের যুক্ত ব্যঞ্জনেরা যেমন একের আকর্ষণে অন্যকে টেনে আনত—রবীন্দ্রনাথ তা হতে দিলেন না। তাঁর ছন্দে অর্থ ও আবেগকে তিনি কিছুতেই বিচ্ছিন্ন হতে দিলেন না। তার ফলে তাঁর যুক্তাক্ষরেরা স্বাধীন থেকেছে। সংগীতজ্ঞ বলেই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ এটা বুঝেছিলেন যে গানও শ্রোতার কাছে একধরনের বাক্ নিবেদন। সে বাক্য অর্থ নিরপেক্ষ নয়। আবেগ নিরপেক্ষও নয়। মধুসূদন যেটা বুঝেও বোঝেন নি রবীন্দ্রনাথ সেটা সহজেই বুঝেছিলেন যে সমুদ্রঝঙ্কার বাঙালির কানে বিস্ময় সৃষ্টি করলেও, মাধুর্যের স্বাদ দেবে না। সমুদ্র নয়, বরঞ্চ নদীই বাঙালির কানে নানা ধ্বনি-তরঙ্গের সৃষ্টি করে—রবীন্দ্রনাথের এ উপলব্ধি অভ্রান্ত। বর্ষায় শরতে হেমন্তে শীতে সে নদীর ডাক পৃথক হয়েও সংগীতময়।

তথাপি মধু-রবি দুজনেই পুরোদস্তুর বাক্ছন্দকে তাঁদের কাব্যের জগতে স্বাধিকার দেন নি। মধুসূদনের চরিত্রের স্বর, এবং রবীন্দ্রনাথের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্বরে গদ্যের জগৎ অপেক্ষা কাব্যের জগতের আভাই বেশি ফুটে ওঠে। তার একটা আশ্চর্য প্রমাণ এই যে, এই দুই প্রধান কবি, এবং এঁদের প্রভাবিত অন্যেরা, প্রবহমান পয়ারে চরণের শেষ মাত্রাকে যুক্তব্যঞ্জন করতে চাইতেন না। পারতপক্ষে চাইতেন না। পুরনো পয়ারেও আমরা শুনেছি চরণান্তিক যুক্তব্যঞ্জনটির ফলে লাইনটিকে কেমন গদ্য-গদ্য শোনায়—যদি তাকে আবৃত্তি করা যায়ঃ

"কৃত্তিবাস পণ্ডিত যে সুখী সর্বদণ্ডে
বানরের জন্ম এবে গায় আদ্য কাণ্ডে ॥"

অথবা :

"কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কি কহিব শিক্ষা।
আদ্যকাণ্ডে গাইল সীতার হৈল রক্ষা ॥"

প্রভৃতি চরণ এক্ষেত্রে স্মরণীয়। কিন্তু পুরনো বাঙলায় গানের সুরের প্রাধান্য অস্বীকৃত হয় নি বলেই চরণান্তিক যুক্তাক্ষর সুরে মিশে গিয়ে আত্মরক্ষা করেছে। এবং চরণ-মিত বাক্য বলেই শেষ যুক্তাক্ষর কোনো বাধা সৃষ্টি করে না। কিন্তু সুর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পয়ার যেদিন আবৃত্তি-নির্ভর হতে চেয়েছে, সেদিন থেকেই সে যুক্তব্যঞ্জনকে চরণপ্রান্তে স্থান দিতে নারাজ হয়েছে। এই কাব্যময়ী তরুণী যেন হোঁচট খাবার ভয়ে বড়ই সতর্ক। প্রবহমান পয়ারে যে চরণে প্রথম পদে বা পদাভ্যন্তরে ছেদ পড়ে যাচ্ছে সেখানে ভিন্ন বাক্য শুরু করেও চরণান্তিক যুক্তব্যঞ্জনের প্রতি এই বিমুখতা যায় না। তবে কি এই সন্দেহই সংগত যে, প্রবহমানতার মধ্যেও চরণকে একক বিচারের ঐতিহ্য দুর্মর, এবং যুক্তাক্ষরের ভারি স্বর বোঝা বলে গণ্য হওয়ায় চরণ প্রান্তিক যুক্তব্যঞ্জন কবিতায় কাব্যিক বাক্যকে প্রবহমান হতে বাধা দেয়? চরণপ্রান্তিক যুক্ত-ব্যঞ্জনে ভাব এবং কাব্যিক বাক্য থেমে যেতে চায়? কাজেই যাঁরা চাইলেন পংক্তি লঙ্ঘক অথচ কাব্যিক বাক্য রচনা করতে, তাঁরা আর চরণপ্রান্তিক যুক্তব্যঞ্জনের পক্ষপাতী হতে চাইলেন না। যে চরিত্র কাব্যভূমিতে জাত তার বাক্য কাব্যময় বলেই চরণপ্রান্তিক যুক্তব্যঞ্জন পরিহৃত হল, যেমন 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র সন্ন্যাসী! কাব্য নাটকেও আবার যে চরিত্র গদ্যভূমিতে জাত তার বাক্য গদ্য ঘেঁষা বলেই চরণান্তিক যুক্তব্যঞ্জনে আপত্তি হল না। যেমন 'রাজা ও রানী'র দেবদত্ত।

কিন্তু এর থেকেও গুরুতর একটা কারণ এই ব্যাপারটার পিছনে বিদ্যমান! মধু-ছন্দে ও রবি-ছন্দে অমিল সমিল প্রবহমান পয়ারে চরণের প্রথম পর্বে, অর্থাৎ আট-এর শেষে, যদি ছেদ ও যতি মিলে যায় তাহলে সেখানে পদান্তিক যুক্তব্যঞ্জনে আপত্তি নেই! যেমন :

ক. "হেরিয়া শশাঙ্কে পুনঃ তারাদল সহ,
হাসিল কনক লঙ্কা।" [মেঘনাদবধ কাব্য]

খ. "অরণ্য নীরব,
শতশত বিহঙ্গের সুপ্তি বহি শিরে
দাঁড়ায়ে রহিল স্তব্ধ।" [পরিশোধ/'কথা']

এমন কি আপত্তি নেই পদান্তর্গত যুক্তব্যঞ্জনিক বাক্য সমাপ্তিতে। বলা যায় সাধারণত আপত্তি শুধু চরণের শেষ মাত্রাটিকে যুক্তব্যঞ্জন করায়। রবীন্দ্রনাথ প্রবহমান 'নিয়মিত শ্লোকবন্ধমুক্ত' ছন্দেও চরণপ্রান্তিক যুক্তব্যঞ্জনকে প্রশ্রয় দেননি। পলাতকা অথবা বলাকা দুই ছাঁদে লেখা হলেও একথা সত্য। এর কারণ, যতই আমরা বাক্ছন্দের কাব্য রূপায়ণ চাই না কেন, যে অপূর্ণতায় কাব্যছন্দের প্রাণ নিহিত, চরণান্তিক যুক্তব্যঞ্জন সেই অপূর্ণতাকে অবাঞ্ছিত ভাবে ঘুচিয়ে দেয়। চরণান্তিক যুক্তব্যঞ্জনকে সরিয়ে নাড়িয়ে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ বাক্ছন্দের আহ্বানকে মেনে নিতে নিতেই কাব্যছন্দের প্রাধান্যকে স্বীকৃতি দিয়ে রেখেছেন। একথা খুবই সংগত যে সাধু রীতির পয়ার প্রবহমান হবার কালেও রবীন্দ্রনাথ কথিত সেই 'অনুচ্চারিত মাত্রা'র জের কাটাতে পারে নি, এবং ভুলতে পারে নি যে যুক্তব্যঞ্জন-অন্তিক শব্দের স্বরটি তুলনায় বড়ো। এবং এই দুয়ের যে কোনো একটির জন্যই মধু-রবীন্দ্র চরণান্তিক যুক্তাক্ষরকে প্রশ্রয় দিলেন না।

তিন

'রেখাই মোটা করে দাও, রঙ হয়ে যায়"—বলেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। ছন্দই জমাট হয়ে সৃষ্টি করে কাব্যভাষা। এই গাঢ়তা-সাধনের কৌশলেই এক এক চরিত্র—কাব্যনাট্যে, নাট্যকাব্যে—এবং ফ্রস্ট-কথিত যে কোনো কবিতাতেই ভিন্ন ভিন্ন রঙ ধরায়। কোথা থেকে এই গাঢ়তা আসে? আসে চরিত্রের উপলব্ধি থেকে। 'গান্ধারীর আবেদন' কবিতায় ধৃতরাষ্ট্রের বেদনার রঙ আর গান্ধারীর বেদনার রঙ পৃথক হল বলেই দুজনের ভাষার মধ্যে এসেছে ভিন্নতা। ধৃতরাষ্ট্রের বেদনা জড় এবং নিষ্ক্রিয়। গান্ধারীর বেদনা অভিভূতের বেদনা নয়। সেই বেদনার তীব্রতা তার মধ্যে যে জ্বালা সঞ্চার করেছে তা-থেকেই এসেছে মাতা গান্ধারীর প্রচন্ড সিদ্ধান্ত! সে-এক নিষ্ক্রিয় বেদনা বলেই ধৃতরাষ্ট্রের বেদনার ভাষা কিছুতেই যেন আবেগান্বিত হতে চাইছে না। সে সংলাপ যেন কখনো দুর্যোধনের ভ্রান্ত উল্লাসকে, কখনো বা পত্নী গান্ধারীর অভ্রান্ত সিদ্ধান্তকে প্রতিহত করার জন্যই প্রযুক্ত। তার ফলে ধৃতরাষ্ট্রের সংলাপে এক বিশিষ্ট বাক্ছন্দ সৃষ্টি হয়েছে। দুর্যোধনের ভ্রান্ত উল্লাসকে তিনি ভয়ের দ্বারা সংযত করতে চেয়েছেন বলেই তাঁর উচ্চারিত বাক্যের বিশেষ বিশেষ শব্দে ঝোঁক পড়েছে :

"ওরে বৎস শোন্,
নিন্দারে রসনা হতে দিলে নির্বাসন
নিম্নমুখে অন্তরের গূঢ় অন্ধকারে
গভীর জটিল মূল সুদূরে প্রসারে,
নিত্য বিষতিক্ত করি রাখে চিত্ততল।"

এবং গান্ধারীর তীব্র সিদ্ধান্তকে তিনি যখন যুক্তির দ্বারা প্রতিহত করতে চেয়েছেন গৃহীত হয়েছে তখনও একই প্রকরণ :

"পাপী পুত্র ত্যাজ্য বিধাতার,
তাই তারে ত্যজিতে না পারি—আমি তার
একমাত্র। উন্মত্ত তরঙ্গ মাঝখানে
যে পুত্র সঁপেছে অঙ্গ, তারে কোন্ প্রাণে
ছাড়ি যাব ? উদ্ধারের আশা ত্যাগ করি
তবু তারে প্রাণপণে বক্ষে চাপি ধরি—"

এই দুই ক্ষেত্রেই বাক্যের ছন্দ অনুসারে বড় অক্ষরের শব্দগুলির উপরই প্রাধান্য দেওয়া সমীচীন। ধৃতরাষ্ট্রের চরিত্র-ন্যায় অনুসারেই তাঁর সংলাপের কাব্যছন্দে দীর্ঘ বাক্য গঠিত হয়েছে বটে, কিন্ত তার মধ্যে পৃথক লয়-বৈচিত্র্য নেই ; কোনো বিশিষ্ট স্বরের উত্থান-পতন নেই। শোকার্ত রাবণের অন্তর্গত পিতৃ-চরিত্র আর পুত্রের জন্য ব্যথিত ধৃতরাষ্ট্রের অন্তর্গত পিতৃ-চরিত্রে প্রভূত পার্থক্য। একজন দৃঢ় সিদ্ধান্তে প্রতিশোধমুখী! আরেকজন আত্মপক্ষ সমর্থনে ব্যস্ত। তাই প্রথমোক্তের সংলাপের ছন্দে এত বৈচিত্র্য, এত আবেগের মিশ্রসুর ধ্বনিত হল। ধৃতরাষ্ট্রের সংলাপে সাধারণ বাক্ছন্দ এবং আটপৌরে সুর। তিনি যেন দীর্ঘ কাল ধরে ঐ উক্তিগুলি ভেবে রেখেছিলেন, সাজিয়ে গুজিয়ে তুলে রেখেছিলেন। তাঁর উচ্চারিত ক্রিয়াপদগুলিই প্রমাণ করছে তাঁর আবেগের নিম্নগ গতি। পক্ষান্তরে, গান্ধারীর সিদ্ধান্ত গান্ধারীর কাছে নাটকীয়ভাবেই আবির্ভূত হয়েছে! তাই গান্ধারীর বাক্ছন্দে যে আর্তি, যে ক্ষোভ দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে তা চরম মুহূর্তে সৃষ্টি করেছে এক বিচিত্র ধ্বনি-তরঙ্গের। যেমন ঃ

"হায় নাথ, সেদিন যখন
অনাথিনী পাঞ্চালীর আর্ত কণ্ঠরব
প্রাসাদ পাষাণভিত্তি করি দিল দ্রব
লজ্জা ঘৃণা করুণার তাপে, ছুটি গিয়া
হেরিনু গবাক্ষে তার বস্ত্র আকর্ষিয়া

খল খল হাসিতেছে সভা-মাঝখানে
গান্ধারীর পুত্র পিশাচেরা—ধর্ম জানে
সেদিন চূর্ণিয়া গেল জন্মের মতন
জননীর শেষগর্ব।"

এই অংশে কোনো বিশেষ শব্দের উপর বা বাক্যাংশের উপর জোর পড়ে না —জননীর শেষগর্ব চূর্ণিত হল কীভাবে সেই কাহিনীই এখানে মূল বেদনার উৎস। ক্ষুব্ধ আর্তনাদের ধ্বনি-প্রতিবিম্ব রচিত হয়েছে দীর্ঘস্বর, বিশেষ 'আ'-ধ্বনির সুমিত প্রয়োগে। এখানে লয় মন্থর হয়েছে ঘটনার ভারে নয়, বেদনার ভাবে। সুদীর্ঘ বাক্যটি 'জননীর শেষগর্ব' উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে কান্নায় ভেঙে পড়েছে।

দুর্যোধন-ধৃতরাষ্ট্র সংলাপে ধৃতরাষ্ট্রের উক্তি মন্থর, গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের সংলাপেও ধৃতরাষ্ট্রের। ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে স্বমতে আনতে পারেন নি। গান্ধারী পারেন নি ধৃতরাষ্ট্রকে। এই নাট্যকাব্যের নানা অংশে প্রাণীজগতের হিংস্রতার ও দৈন্যের প্রসঙ্গ চিত্রকল্পের উপাদান জুগিয়েছে, যেমন, সর্প, ভেক, মার্জার, কুক্কুর, ব্যাঘ্র, সিংহ, বৃশ্চিক। যে সময়-পটে 'গান্ধারীর আবেদন' লিখিত, তার প্রত্যক্ষ বাস্তবতায় ছিল মানবতা ও পশুশক্তির প্রবল দ্বন্দ্ব। কবিতার চরিত্রগুলির সংঘাতের ভিতর দিয়ে তৎকালীন নৈতিক সংকটের যে চেহারা ফুটে উঠেছে, জীবজগতের অন্ধকার, অজ্ঞেয় আচরণের ইঙ্গিতে তারই কাব্যময় পটভূমি।

চার

ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর মতো কোনো প্রত্যক্ষ ঘটনা বর্ণনা করেন নি, কোনো প্রত্যক্ষ সিদ্ধান্তও উচ্চারণ করেন নি। তাঁর বক্তব্য পরিস্থিতির একটা সাধারণ মূল্যায়ণ—ব্যক্তিগত মূল্যায়ণ মাত্র। কিন্তু গান্ধারী মূল্যায়ণে সময় বেশী ব্যয় করেন নি। যেটুকু মূল্যায়ণ তিনি করেছেন তা ধৃতরাষ্ট্রের মতো ব্যক্তিগত নিষ্ক্রিয়তায় আচ্ছন্ন নয়। তাই গান্ধারীর কথিত কাব্যছন্দে একাধিক স্বর ধ্বনিত হয়েছে। মাতা, পত্নী, পরিবার-কর্ত্রী বা শাশুড়ী এবং একজন সচেতন নাগরিক হিসাবে গান্ধারী এ নাটিকায় নানা ভূমিকায় কথা বলেছেন। এবং তাঁর নানা ভূমিকায় নানা বাস্তব ঘটনা, প্রত্যক্ষ প্রস্তাব মূর্ত হয়েছে। তবু গান্ধারীর কথিত কাব্যছন্দে শেষ দিকে এসেছে এক ক্লান্তির ভার। সে ছন্দও যেন হাঁপিয়ে পড়েছে। তাতে বাগ্‌বাহুল্য আছে বটে—সব আশ্বাস, সব

আশীর্বাদ তথাপি নিষ্প্রাণ। আসলে এ কাব্যে ফুটে উঠেছে এক বিখণ্ডিত পরিবার। পুত্র পিতার কথা শোনে না, পতি পত্নীর অনুরোধ রক্ষা করে না। মাতা পুত্রকে ত্যাগ করতে চাইছেন। পুত্র মাতার সম্মুখে আসতে চাইছে না। পুত্রবধূ শাশুড়ীর নির্দেশ মান্য করেছেন এমন স্পষ্ট কোনো প্রমাণ নেই। কিন্তু রাবণের চূড়ান্ত বিপর্যয়ে তার রোহভূমি বাইরের আঘাতে ক্ষয়ে গেলেও, ভিতরে ভিতরে তার অখণ্ডতা ছিল অনাহত। বিক্ষুব্ধ চিত্রাংগদা অন্তঃপুর থেকে এসে আবার অন্তঃপুরেই ফিরে যায়। মেঘনাদ মন্দোদরী রাবণেরই অনুগত। প্রমীলা-মন্দোদরী সম্পর্কটিও স্মরণীয়। বিভীষণের প্রধান অপরাধ, সে এই খ্যাতিমান বংশের শৃংখলা ভংগ করেছে। এ কারণে রাবণের ভাষায়, সে ভাষার ছন্দে নাটকীয় ঝোঁক স্বাভাবিক। কেননা স্বপক্ষ প্রতিপক্ষ সম্বন্ধে রাবণের জ্ঞান স্পষ্ট। গান্ধারীর ক্ষেত্রে তা নয়। তিনি কাউকে সংগে পেলেন না। নাটকীয় চূড়ান্তে আরূঢ় হয়েই তিনি রংগমঞ্চে প্রবেশ করেছেন। কিন্তু প্রথম থেকেই তিনি নিজ একাকিত্ব সম্বন্ধে সচেতন। পত্নী মাতা শাশুড়ীর স্বর এবং একজন সচেতন নাগরিকের স্বর গান্ধারীর কাব্য-ছন্দে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে মিশ্রিত হতে পেয়েও শেষবেলায় রুদ্ধশ্বাস। মেঘনাদবধ কাব্যের নায়ক রাবণের সেই জাতীয় কোনো একাকিত্ব ছিল না—কিন্তু সংগ্রাম ছিল। তাই রাবণের উচ্চারিত উক্তিতে নাট্য প্রস্বর অধিক। এই একাকিত্বের কারণে গান্ধারীর বেদনা সহজ বহির্মুখ পায়নি। তাই তাঁর উক্তিতে গীতি-প্রস্বর তুলনায় অধিক। 'গান্ধারীর আবেদনে' কবি, দুর্যোধন ও ধৃতরাষ্ট্রের বাগ্‌ভঙ্গিতে উভয়ের মেজাজ, মানসিকতা ও ঘটনার প্রতিক্রিয়া অনুসারে পার্থক্য এনেছেন। দুর্যোধনের কাটা কাটা কথার ধাতব ঝংকার উদ্ধত তার্কিক ভঙ্গি, ধৃতরাষ্ট্রের অনুপায় অসহায়তা, কাব্যছন্দেই পৃথক বাক্‌ছন্দ সৃষ্টি করেছে। গান্ধারীর ক্ষেত্রে বিষয়টা একটু পৃথক। যত এ নাট্যকাব্য সমাপ্তির দিকে এগিয়েছে তত গান্ধারীর ক্ষেত্রে ছন্দ হয়ে উঠেছে বৈচিত্র্য-বিহীন। প্রথম প্রবেশের সঙ্গে সংগে তাতে কিন্তু ছিল নানা পর্বগত বৈচিত্র্য, লয়ের হ্রাস-দৈর্ঘ্য, ধ্বনিতরংগের ওঠা-পড়া। আর গান্ধারী যত বুঝতে পেরেছেন তাঁর প্রয়াসের আপাতত বিফলতা, যত তাঁকে বিশ্বাস রাখতে হয়েছে ভবিষ্যৎ নামক অনির্দেশ্য অনাগতের উপর, ততই হারিয়ে গেছে ছন্দের পংক্তিগত বৈচিত্র্য। স্বরস্বাতন্ত্র্য-গুলিও আর নিজেদের রক্ষা করার জন্য সচেষ্ট হয়নি। চরণে চরণে শব্দ সমাবেশ তখন গীতিময় না হয়ে আর উপায় কী?

আর এই জাতীয় নাটকীয় বল-প্রস্বর এবং গীতি-প্রস্বরের কথা স্মরণ রেখেই বলা যায় মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথের কাব্যে-কাব্যনাট্যে যে স্বর ফুটে উঠতে চেয়েছে,

তা কাব্যের জগতের অধিবাসীর, বা সেই জগতের জাত ব্যক্তিপাত্রের স্বর। যে গদ্যময় জীবন কবিতায় প্রত্যক্ষ হতে চাইলে ব্যক্তিপাত্রের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সত্তার কারণে বাগ্‌বিন্যাসে আসে বিভিন্নতা, আসে অনভ্যস্ত সংশ্লেষণের দুঃসাহস, আসে চরণপ্রান্তিক যুক্তব্যঞ্জনকে এড়িয়ে চলার প্রবণতা পরিহার করার প্রয়োজনকে স্বীকৃতিদান—এক কথায় বাক্‌ছন্দের নিরঙ্কুশ আধিপত্য, রবীন্দ্রোত্তর বাংলা আধুনিক কবিতাতেই তা কথঞ্চিৎ প্রবলতা পেয়েছে। এই কাব্যক্ষেত্রে যে চরিত্রপাত্র কথা বলতে চেয়েছে সে একান্তভাবেই কবিতার জগতের মানুষ নয়। তার ভাষাই তার অভিজ্ঞান। বিষ্ণু দে-র 'বারোমাস্যা' কবিতায় চরিত্রপাত্র কীভাবে ঈপ্সিত বাক্‌ছন্দকে মানসিকতা ও মেজাজ, বাচ্য এবং তাৎপর্য অনুসারে বিশিষ্টতা দিয়েছে তার আলোচনা এক্ষেত্রে অবান্তর হবে না। 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার'-এর 'বারোমাস্যা' কবিতার এই অষ্টম অংশটি উল্লেখ্য ঃ

তোমারও হৃদয়ে তাই হাত পাতি। আজকে শরতে
বর্ণাঢ্য পৃথিবী বটে, তবু অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি
স্মৃতির পরম্পরা ঘুলিয়েছে অঘ্রাণের দৃষ্টি
পরগণার ঘরে ঘরে, যদিচ নীলায় মরকতে
কুসুমার টিলা জ্বলে, তবু দূর দিগন্তে দিগন্তে
মন খোঁজে নিশ্চিতের ভবিষ্যৎ বর্ষায় হেমন্তে।

ছন্দ এখানে চরিত্রের বাক্‌ছন্দেরই অনুগামী—সে অনুগমনে স্বীকৃত সমকালীন সমাজ, সামাজিক কথ্যরীতি এবং ব্যক্তির হৃদয়দর্পণ। তাই এর বাগ্‌বিন্যাসেও আছে এক অবৈকল্য সন্ধানী জীবনের মতোই সজীবতা। 'পরম্পরা' 'স্মৃতির' সঙ্গে যুক্ত লয়ে মাত্রার ক্ষেত্রে না হলেও স্বরের ক্ষেত্রে আট মাত্রা গুণে দিল—বিশিষ্ট বাক্‌রীতি গদ্য পদ্যের পুরাণো আবৃত্তিসম্ভব বেড়াকে মানল না বলেই, এ আধুনিক চরিত্রপাত্র পুরাতন স্বরমোহকে প্রশ্রয় দিল না। তাই চরণান্তিক যুক্তাক্ষর এখানে বোঝা বলে বিবেচিত হল না। সে প্রশ্নই এখানে উঠল না। এ শক্তি এ কবিতার চরিত্রপাত্রের জীবন সম্বন্ধীয় সামগ্রিক বোধ থেকে উদ্ভূত। 'বারোমাস্যা' কবিতার প্রথম অংশের স্তবকে দৃশ্য শ্রুতি এবং ঘ্রাণের পরস্পর সহযোগিতায় এই কবিতার মূলের নান্দী হয়েছে উপভোগ্য। সেই প্রগাঢ় এবং বিস্তৃত জীবনই এই কবিতার অসামান্য ছন্দোময়তাকে পরম স্বাভাবিক করে তুলেছে। 'বারোমাস্যা'য় জীবনের ছন্দ—'স্মৃতিসত্তা ভবিষ্যৎ'-এ জীবনের যন্ত্রণা কারুদক্ষতার মুখাপেক্ষী হল না, সেখানে ছন্দে যন্ত্রণার অকৃত্রিমতাই ফুটে উঠেছে। চরিত্রপাত্রের গাঢ় অভিজ্ঞতা এবং যন্ত্রণার স্বর জন্ম দিয়েছে এক শান্ত প্রত্যয়ের। 'মাটির যেমন ক্লান্তি আসন্ন ফসলে/সেই ক্লান্তি আমাদের

আকাঙ্ক্ষিত মহাশয় !'—এখান থেকে 'চাই সেই ক্লান্ত অবসর' পর্যন্ত অংশে চরিত্রপাত্রের মুখে যে ক্লান্তির কথা আমরা শুনলাম তা আসলে অক্লান্ততার সমতুল। সম্বোধন-রীতির বিশিষ্টভঙ্গির, সম্বোধিতের প্রতি সচেতনতা এখানে যে ব্যক্তিগত স্বরক্ষেপ সৃষ্টি করেছে তা ব্যক্তির যতটা সামাজিকেরও ততটাই। পরম আকাঙ্ক্ষায় এখানে যে 'শ্লোকবন্ধমুক্ত' পয়ার মন্দ্রিত হয়ে উঠেছে, সে আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই বাদী সুরের মতো ঢেউ তুলেছে আমাদের সকলের জীবনের যুগব্যাপী নিরুদ্দেশ অন্বেষার ক্লান্তি। এখানে বাক্‌স্পন্দ জীবনস্পন্দনের সঙ্গে রচনা করেছে অপূর্ব অভেদ। এর পরেই রবীন্দ্রনাথের গল্পের সেই আশ্চর্য রূপকার্থ নিষ্কাশনে আমাদেরই জীবনছবি ফুটে উঠল সাধারণ্যেরই ভাষায়—কিন্তু তার তলায় একটা অসামান্য আবেগগত শক্তি রয়েছে বলেই সেই ভাষাছন্দই হয়ে উঠল উন্নীত আবেগের ভাষা। সেই ভাষাতেই ফুটে উঠল চরিত্রটির ইতিহাসগত স্মৃতির প্রাজ্ঞ বিধুরতা, প্রৌঢ় বিষণ্ণতা—'এরই ব্যথা এনে দেয় মিথ্যা লোভ, ভুল আত্মঅভিমান···' এই অংশে।

প্রায় পনেরো বছর আগে লেখা 'জলদাও' কবিতায় যে চরিত্র কথা বলেছিল, আর 'স্মৃতিসত্তা ভবিষ্যৎ'-এ যে চরিত্র কথা বলেছে তাদের দুয়ের মধ্যে কালগত ব্যবধান ছাড়াও আছে আর এক ব্যবধান। তা হল উপলব্ধিগত। 'জলদাও' কবিতায় সন্ধেয় ছিল উজ্জীবন—জল যার প্রতীক। 'স্মৃতিসত্তা ভবিষ্যৎ'-এ অন্বেষার বিষয় হল সত্তার অবৈকল্য—স্বরূপের অভিজ্ঞান। তাই 'জলদাও' কবিতায় যন্ত্রণার নির্দিষ্টতায় স্বরে এসেছে নাট্যবেগ। ছন্দেও এসেছে লয়ের বৈচিত্র্য, প্রবহমান শ্লোকবন্ধমুক্ত সাধু পয়ারে কখনো ফুটেছে বেগের আভা, কখনো স্বগত মন্থরতা। ছন্দ আপন তৎপরতায় কবিতার ভাষাকে, অর্থাৎ চিত্রকল্পকে গাঢ় করে তুলেছে। 'হয়তো বা যন্ত্রণাই সার'···এই অংশের এই সব জটিলতাকে অভিব্যক্তি দিতে গিয়ে ঃ

কিংবা যেন ফাল্গুন চৈত্রের প্রস্তুতির
পাতাঝরা নূতন পাতার আঁকশিতে অঙ্কুরে
শিরায় শিরায় শিকড়ের প্রচ্ছন্ন উৎসবে
অধরা অথচ তীব্র প্রাণের স্ফূর্তির
অনিবার্য যতির স্তব্ধতা
শ্রুতির আক্ষেপস্পন্দে
কবিতার ছন্দের মতন
কিংবা যেন উত্তোলিত পদক্ষেপে

যখন সামনে দেখি সেতুর ফাটলে
অতলের প্রত্যাখ্যান এবং আহ্বান

সৃষ্ট হয়েছে ছন্দে প্রগাঢ় পরস্পর গ্রথিত চিত্রকল্প—যা একদিকে দীর্ঘতান ছন্দে ধ্বনিত করছে দীর্ঘ প্রস্তুতির পর্বকে, অন্যদিকে আভাস দিচ্ছে জীবনের স্বান্দ্বিক সমগ্রতার।

পক্ষান্তরে 'স্মৃতিসত্তা ভবিষ্যৎ'-এ যে চরিত্র-স্বর ধ্বনিত হয়েছে সে বাস্তবকে জেনেছে আরো নিবিড়তায়—বাঙালি মধ্যবিত্তের দুশো বছরের বিড়ম্বনা এবং উত্তরণের অভীপ্সা, আকাঙ্ক্ষা এবং অদম্যতা যেমন সেই সচেতন চরিত্রপাত্রের পরম বেদিতায় ধরা পড়ে, তেমনি এ ইঙ্গিতও এ কবিতায় স্পষ্ট যে, যে জানে চারিদিকের ভগ্নমূর্তির অসম্পূর্ণ ছায়াপুঞ্জকে, সেই জানে পূর্ণ-মূর্তির গৌরবকে। সত্তার চরিতার্থতাকেই, সেই অবৈকল্যকেই এই কবিতায় বলা হয়েছে বর। এখানে নাট্যস্বরক্ষেপের প্রয়োজন নেই। এখানে আছে তারো চেয়ে বেশী এক একান্ত সম্ভাষণ।

প্রথম যুগল সম্ভাষণ উচ্চারিত হয়েছে শ্লোকবন্ধন যুক্ত তিনটি নিয়মিত স্তবকে। এই যুগলের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত উক্তিই সমগ্র বক্তব্যের মুখপাত। এই প্রত্যক্ষ সম্ভাষণ কবিতার দ্বিতীয়াংশে প্রত্যক্ষতা ছেড়ে দিয়ে একটু নির্লিপ্ত হয়েছে। ছন্দও নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে অমিল মুক্তকে। কিন্তু তা খুব ধীরে ধীরে দীর্ঘচ্ছন্দে রূপায়িত হল। 'আজ শুধু একদিকে মুমূর্ষু বিকার' এই অংশে আকাশ-সম্ভাষণই চরিত্রকে নিয়ে গেল এক মানবিক জনান্তিক উচ্চারণে —'প্রাণ খুলে যে ঘৃণা করব এমন দেখি উপায় নেই'। স্বরবৃত্তের অন্তরঙ্গতায় সে জনান্তিক ভাষণ চরিত্রকে আবার ফিরিয়ে দিল প্রত্যক্ষ সম্বোধনের ঋজুতায় —'এ নরকে/মনে হয় আশা নেই জীবনের ভাষা নেই'—এই অংশে। সেই নরক প্রসঙ্গই চলতে থাকে, বুঝি থমকে থাকে অনড় বর্তমান– হঠাৎ, এক ঝলক হাওয়া তোলে সেই প্রেমিক যুগল। রূপকথার আদলে সাতমাত্রার বিলম্বিত লয়ে স্বপ্ন ও বাস্তবের দ্বৈতরূপ এক আশ্চর্য স্বগতোক্তির জন্ম দিয়েছে। প্রত্যক্ষ ভাষণ, জনান্তিক ভাষণ, স্বগতোক্তি এবং আবার সমবর্তীদের প্রতি সম্ভাষণ এ কবিতার অনাটকীয় অনুধ্যানকে অথচ নাট্যশৈলীকে পূর্ণতা দিল। ঐ স্বগতো-ক্তির পরেই চরিত্রপাত্র উজ্জীবিত হল ভবিষ্যৎ স্বপ্নে—এক সীমাভাঙ্গা মহাপয়ারে শ্রম এবং শ্রান্তির অন্বয়-ধ্যানে উচ্চকিত জীবন-চেতনাই অতঃপর বর-কনের অব্যর্থ রূপককে খুঁজে নিল। চরিত্রপাত্র সম্বন্ধে কবির ধ্যানই কবিতার তৃতীয় স্বরকে দিয়েছে মুক্তির ছন্দসংযত নান্দনিক রূপ—'জল দাও'-এ তার এক

অধ্যায়—'স্মৃতিসত্তা ভবিষ্যৎ'-এ তার আর এক অধ্যায়।* এই অধ্যায়ে উন্মোচিত হল ঐ চরিত্রের বিশ্বগ্রাহী কৌতূহল এবং তার স্বাদেশিক রূপ।

বাক্‌ছন্দ জীবনছন্দেরই বাণীরূপ। বড়ো কবি মাত্রেই সেই জীবনছন্দকে আবিষ্কার করতে চান। সেই আবিষ্করণের তাৎপর্যে ও লক্ষ্যে গড়ে ওঠে ঐ কবির ছন্দোবৈশিষ্ট্য। তিনি তো শব্দকে খোঁজেন জীবনার্থেরই তাগিদে। তাই বিষ্ণু দে 'সাধারণ বাংলা শব্দ দুইমাত্রা বা তিনমাত্রার'—এই সত্যের সঙ্গে বিবাদ ঘটান না, আবার সংস্কৃত বা বিদেশী চার পাঁচমাত্রার শব্দকে পাংক্তেয় করে নেবার অসামান্য সিদ্ধিও তাঁর করতলগত। তাই 'ওফেলিয়া' বলার সময় বাঙালি উচ্চারণই তিনি মেনে নেন—লরেন্স অলিভিয়া-র মতো 'ওফেলিয়া' উচ্চারণের প্রয়োজন নেই। মাত্রাশুদ্ধির সঙ্গে তাঁর বিবাদ নেই—কিন্তু তার একটা নিজস্ব প্রস্বর বিন্যাস আছে, আছে লয় সম্বন্ধীয় এক বিশিষ্ট অভিনিবেশ। 'কোণার্ক দেউল' কবিতার দ্বিপদীকে ব্যবহিত করার ফলে প্রতি দ্বিতীয় পদে লয়ের মন্থরতায় এক বিবিক্ত সৌন্দর্যের স্তুতি ধ্বনিত হল। সেটা তাঁর অন্তর্গূঢ় প্রশান্ত ব্যক্তিত্বের দান। তা দৃঢ় হতে জানলেও, উচ্চৈঃস্বর হতে চায় না;—যেমন 'স্মৃতিসত্তা ভবিষ্যতে':

আজ শুধু একদিকে মুমূর্ষু বিকার
আর অন্যদিকে নাটুকে প্রলাপ নির্বোধ নিষ্ঠুর অমানুষিক অভদ্র
কে দেবে ধিক্কার কাকে আঠারো তলায়
সারাদেশে চতুর্দিকে যত অবান্তর
উন্মাদ বিলাসী খেলা!

মধুসূদন তাঁর নিজের যুগের অন্তর্বিরোধ মেটাতে গিয়েই ছেদ ও যতির বিরোধ ও সম্বন্ধকে গভীর পরীক্ষায় ফেলেছিলেন; রবীন্দ্রনাথ চতুর্দিগ্‌বর্তী অপূর্ণতার মাঝারে তাঁর ধ্যানের নীলিমাকে আকর্ষণ করতে চেয়ে সদাই সতর্ক থেকেছেন তাঁর কাব্যছন্দ যেন না নেমে যায় গদ্যময় জগতে, না উঠে যায় গানের উপাদান নিরপেক্ষতায়; বুদ্ধদেব বসু বাংলা শব্দের মাত্রাদৈন্যকে মোকাবেলা করেছেন আভিধানিক অভিনিবেশে; কবি জীবনানন্দ ছন্দকে গৌণ করেছেন চিত্রল মুগ্ধতায়। সে ক্ষেত্রে বিষ্ণু দে এই যুগেরই কথ্যছন্দ থেকে আহরণ করেছেন তাঁর অন্তরঙ্গ ভাষণের স্বর। শব্দকে ঘিরে তাঁর সে প্রস্বর ছন্দের কাছেই প্রশ্রয় পায়। সে শব্দও স্বরাট হয়ে ওঠে তাঁর চরিত্রপাত্রের Total meaning বা সমগ্রার্থের প্রসাদে। আর সে সমগ্রার্থের অরবিন্দ সৌরভ এনে দেয় জীবন—জীবন এবং—জীবন।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকল্প ও প্রতীক

এক

অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করতে গিয়ে সংহত হবার প্রয়োজনে চিত্রকল্পের জন্ম। যদিও অভিজ্ঞতা স্মৃতিকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকে, তথাপি স্মৃতি নিপুণ-গৃহিণীর মতোই, অভিজ্ঞতার আকাঁড়া সঞ্চয়কে যথাতথা মেলে ধরে না। অথচ তার বিপুল ভাণ্ডারে কী জমা হল, কী হল না, সে সংবাদ মনের সচেতন কর্মশালা শুধু প্রয়োজনের সময়েই জানে। আবার পরিবর্জনের ভিতর দিয়ে স্মৃতি অভিজ্ঞতাকে ব্যক্তি-মানসের সেই স্বতন্ত্র আধারে ধারণ করে—যে স্বাতন্ত্র্যে রাম শ্যামের থেকে দূরে, শেলি কীট্‌স থেকে এবং রবীন্দ্রনাথ শেলি-কীট্‌স থেকে। কাজেই একজন কবির স্মৃতিলোক বা তার অভিজ্ঞতার জগতকেই আমরা তাঁর শিল্পকর্মে অনুভব করে থাকি। অভিজ্ঞতা এবং স্মৃতির বিশিষ্টতায় এবং বিশিষ্ট আচরণে কবি বিশিষ্ট হয়ে ওঠেন। স্মৃতিধৃত অভিজ্ঞতা মূল্যবোধের প্রেরণায় প্রকাশের জন্য অনিবার্য আবেগে কল্পনার ন্যায়ে সৃষ্টি করে চিত্রকল্পের পুষ্পরাশি। তাই কবির প্রতিটি চিত্রকল্প কবির অভিজ্ঞতার নিদর্শন। জীবন এবং জগতকে তিনি যে ভালোবেসেছেন এবং অনুভব করেছেন, তার সাক্ষ্য তাঁর ব্যবহৃত চিত্রকল্পরাশিতে। তাঁর জীবনকে ভালোবাসার এবং অনুভবের অনন্য মূল্যকে উপলব্ধি করার জন্যই তাঁর ব্যবহৃত চিত্রকল্পের, রূপকের বা প্রতীকের আলোচনার আবশ্যিকতা। ফলতঃ চিত্রকল্পের আলোচনা ব্যতীত একজন কবির মনোলোকের সমগ্র সৃজনী ক্রিয়াটির তাৎপর্যকে হৃদয়ঙ্গম করার অন্য কোন পন্থা নেই। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বড় কবিদের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার আকার এবং প্রকার, বিপুল এবং জটিল বলেই তার প্রকাশের বহুধা বিস্তারের মধ্যে উক্ত 'মনোলোকের সমগ্র সৃজনী ক্রিয়ার তাৎপর্য' সন্ধান কষ্টসাধ্য। তথাপি এ পথের কষ্টভারও পদে পদে কবি-কীর্তির প্রসাদেই লাঘব হয় বলে, পথের প্রলোভন কখনও হ্রস্ব নয়।

স্মৃতির কাজই হচ্ছে অনুষঙ্গ-সৃজন। অনুষঙ্গ-সৃজন ব্যতিরেকে চিত্রকল্প গঠিত হয় না, কবির বিক্ষিপ্ত অভিজ্ঞতাগুলি একটি প্রসঙ্গে সূত্র-সম্বন্ধ হয় না। অনুপ্রাণিত কাব্যসৃষ্টি বলতে আমরা তাকেই বুঝি যেখানে স্মৃতির অনুষঙ্গ-সৃজনী ক্ষমতা অব্যাহত। আবেগ এবং মননের সুসমঞ্জস সমন্বয়ের অনুকূল পরিবেশে অনুষঙ্গ-সৃজন ক্রিয়া কতকটা স্বাধীন এবং স্বচ্ছন্দ। কিন্তু এটাও তর্কাতীত যে, শ্রেষ্ঠ কবিতা রচনার প্রয়োজনীয় পূর্বাবস্থা তখনই গঠিত হয়,

যখন মন অব্যর্থ শৃংখলায় শিল্পলক্ষ্য হয়ে নিজের সমগ্রতাকে বেঁধে ফেলতে পারে ; অথচ মনের অনুষঙ্গ-সৃজনী-ক্ষমতায় স্বাচ্ছন্দ্য থাকে অব্যাহত। বলা যেতে পারে এই দ্বৈতে শ্রেষ্ঠ শিল্পের জন্ম। মনের উপরের স্তর যখন একটা নির্দিষ্ট শিল্পলক্ষ্যের বশীভূত, মনের অবচেতনাংশ তখন নেপথ্য-ক্রিয়ায় ব্যস্ত অনুষঙ্গের পরম্পরা সৃজনের জন্য। মনের চেতনেতর অংশ বিধৃত থাকে লেখকের অভিজ্ঞতার বিস্তৃত ভাণ্ডারে। যে কোনো বড় কবির চিত্রকল্পের আলোচনায় এই সূত্রগুলি স্মরণে রাখা বর্তব্য। কেননা, তাহলে বোঝা যায় যে, মাত্র সদৃশ উদাহরণ সরবরাহ কবা চিত্রকল্পের কাজ নয়। এবং সাদৃশ্যে তাদের সার্থকতাও নয়। যেহেতু এটা সমগ্র মানসের সৃজনী ক্রিয়ার অনিবার্য প্রকাশ, সেইহেতু এর বিচারও হবে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে। স্মৃতি, আবেগ এবং যুক্তি-ন্যায়ের ত্রি-ধাতুতে কল্পনা গঠিত ; তাই, মনের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় এই দুই শক্তির যোগাযোগ এবং সহযোগ ঘটে কল্পনার সাহায্যে। সুতরাং চিত্রকল্প এবং প্রতীকে কল্পনার বস্তুরূপায়ণ। জীবন সংক্রান্ত মনোভাবের পরিবর্তনে এই রূপায়ণেরও পরিবর্তন ধ্রুব।

সে-কারণে প্রাচীন মহাকাব্যের কবিরা যখন বস্তুসাদৃশ্য বিবৃত করতে গিয়ে উপমামূলক বাণীচিত্র রচনা করেছেন, তখন তাঁদের ব্যবহৃত উপমারাশিতে আভাসিত হয়েছে জীবনের বহুধা-বৈচিত্র্য। সিংহতুল্য গতি, নগেন্দ্রতুল্য বিক্রম, কাশ্মিরী তুরঙ্গমীব ন্যায় সুন্দর—প্রভৃতি উপমা যখন প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল তখন এগুলি জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে কবির বাস্তব আগ্রহকে ধারণ করেছিল, জীবনের ঐশ্বর্যের বিপুলতাকে ব্যক্ত করাই ছিল এদের কাজ। যুদ্ধের সাগরে দ্বীপের সদৃশ অবিচল বীর, বিচ্ছিন্ন পিপীলিকাপুঞ্জের মতো সেনাপতিহীন সৈন্য, বল্মীক থেকে বহু সর্প নির্গত হওয়ার সঙ্গে বিশবাহু রাবণের অস্ত্র নিক্ষেপের তুলনা, অথবা ক্রুদ্ধা করিনী, মত্ত গজরাজের উপমা—জীবন সম্বন্ধে মহাকবির বাস্তব অভিজ্ঞতার নিদর্শন। এই সমস্ত চিত্রকল্পে প্রাচীন কবির এই দৃঢ় বিশ্বাসও নিহিত ছিল যে কাব্য-রস-ভোক্তা-সমাজও কবিরই মতো জীবনের বহুধা বিস্তৃত রূপ সম্বন্ধে ছিলেন সমান আগ্রহী এবং সচেতন। আকাশপথে পীত কৌষেয় বসনা সীতাকে রাবণ যখন হরণ করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন ব্যাপারটাকে বোধ হচ্ছিল যেন অগ্নিদীপ্ত পর্বত, সন্ধ্যা রাগ-রঞ্জিত মেঘ, কাঞ্চন-কাঞ্চী-ভূষিত নীল হস্তী। চেড়ী বেষ্টিতা সীতা যেন কুক্কুরী বেষ্টিতা যূথভ্রষ্টা হরিণী। প্রাচীন কবি অধিকাংশ উপমা সংগ্রহ করেছেন অরণ্য জীবন থেকে। সঙ্গে সঙ্গে এও লক্ষণীয় যে, অরণ্য-জীবনের অকস্মাৎ সংস্পর্শে উদ্ভূত বিষয় অপেক্ষা, সার্বজনীন অরণ্য-স্মৃতিই মহাকাব্যের

যুগের এবম্বিধ চিত্রকল্প সৃজনের মূলে। কাজেই প্রাচীন কবি যখন "বিদ্যুৎ পতাকা ও বলাকার মালায় শোভিত গিরিশৃঙ্গাকার মেঘ রণভূমিস্থ মত্ত গজেন্দ্রের ন্যায় গর্জন করছে"—এই বর্ণনা করেন তখন রণভূমিস্থ মত্ত গজেন্দ্রের হিংস্রতা অপেক্ষা গজেন্দ্রের গম্ভীর মর্যাদার ছবিটিই সর্বদর্শী, কেননা নিরাসক্ত, কবির স্মৃতিতে অধিক কার্যকর ছিল। তাই অকস্মাৎ প্রকৃতিতে নারী সৌন্দর্যের সাদৃশ্য-সন্ধানেও আমরা আশ্চর্য হই না। জানি যে, প্রকৃতি অথবা নারী, সব কিছুই স্বভাব সৌন্দর্যের অঙ্গীভূত বিষয়। রামায়ণে বর্ষাকালীন বর্ণনায় কবি বলেছেন "নব তৃণাবৃত ভূমিতে স্থানে স্থানে নবজাত ইন্দ্রোগোপ-কীট রয়েছে, যেন কোন নারী লাক্ষার বিন্দুযুক্ত শুকবর্ণ কম্বল গায়ে দিয়েছে"। পূর্বোদ্ধৃত উপমাগুলির ন্যায়, এই উপমাটিতে মহাকবির উদ্দেশ্য ছিল বিষয়ের আত্মা অপেক্ষা বিষয়ের রূপকে পরিস্ফুট করা। এই প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য ছাড়া আর একটি ব্যাপকতর গভীর পরোক্ষ উদ্দেশ্য এখানে সক্রিয় ছিল। সেটি হল জীবনের বিস্তৃতির প্রতিবিম্ব রচনা। শেষ পর্যন্ত মহাকবির প্রদত্ত উপমারাশি সেই আলোকেই বিচার্য।

নিঃসন্দেহে আধুনিক কবির কাজ তা নয়। বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ের, বা বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সুপ্রযুক্ত সাদৃশ্য রচনার ভিতর দিয়ে জীবনের বিশাল বিকল্পরচনার চিত্রপটকে তিনি পূর্ণ করেন না। তাঁর লক্ষ্য বস্তুরূপের পরিভাষায় আত্মভাবনাকে ব্যক্ত করা। বিষয়পুঞ্জের আপাতসাদৃশ্যের সুপ্রযুক্ততা সেখানে একান্তই বহিরঙ্গ ব্যাপার। বাণী-চিত্র বা চিত্রকল্পের মাধ্যম কবির অনুভূতিকে ব্যাখ্যার উপায়ক্রম হিসাবে এখানে ব্যবহৃত। কীভাবে দেখেছেন, তদপেক্ষা কীভাবে অনুভব করেছেন, আধুনিক কবির কাছে চিত্রকল্প সেই তাৎপর্যের সন্ধান দেয়। তাই কবিতার সমগ্রতার টানে এর প্রস্ফুটন, আবার সেই প্রস্ফুটিত চিত্রকল্প তার বিনিময়ে কবিতার সমগ্রতাকেই সমৃদ্ধ করে। বাস্তবতার গভীরকে সন্ধান করাই এর উদ্দেশ্য। তাই কীট্স যখন পাঠকের কাছে রসসিদ্ধ কবিতার সার্থক চিত্রকল্পের প্রসঙ্গে তাকে সূর্যোদয়, মধ্য-সূর্যের কিরণসম্পাত এবং অস্ত-সূর্যের উত্তরগরিমার সঙ্গে উপমিত করেন তখন কবিমানসে চিত্রকল্প প্রস্ফুটনের ব্যাপারটা কতকটা আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন, "না বলা বাণীর আভাসের মত নীলাম্বরের প্রান্ত"—তখন আমুদিত নয়নের অনুক্ত বাণীর আভাসের সঙ্গে নীলাম্বরের প্রান্তের তুলনা দেওয়া হচ্ছে না। তাহলে একে মিলিয়ে নেওয়া হবে দুরূহ। প্রকৃত পক্ষে নীলাম্বরের প্রান্ত প্রসঙ্গে কবির অভিজ্ঞতা কী আকারে রূপ পরিগ্রহ করেছে, কবি কীভাবে ব্যাপারটাকে অনুভব করেছেন, এখানে সেটাই প্রধান কথা। রবীন্দ্রনাথের

বিখ্যাত কবিতা 'রাত্রে ও প্রভাতে'র শেষ স্তবকে—"দেবী, তব সিঁথিমূলে লেখা নব অরুণসিদুঁর রেখা। তব বাম বাহু বেড়ি শংখ বলয় তরুণ ইন্দুলেখা"—এই চিত্রকল্পে শংখবলয়ের আভাসের প্রসঙ্গে তরুণ ইন্দুলেখার কল্পনা বাংলা কাব্যধারায় বৈষ্ণব পদকারদের দৌলতে আমাদের সুপরিচিত। কিন্তু এই পূর্ব পরিচিতির জন্য চিত্রকল্পটি পাঠকদের কাছে তার তাৎপর্য হারায় না। এ তাৎপর্য কবিতাটির সমগ্রে বিধৃত প্রসঙ্গের সংগে অঙ্গাংগী সম্পর্কে যুক্ত। স্বার্থপর ব্যবহারের অতীত, আসক্তি-হীন সৌন্দর্যের কল্পনাসঞ্চারিণী নারী-মূর্তিতে তরুণ ইন্দুলেখার অনুভব সুন্দরের সম্বন্ধে মানবিক শ্রদ্ধার দ্যোতক। সমগ্র কবিতার মৌল ভাবপ্রেরণার আকর্ষণে এর জন্ম। চিত্রকল্পের সার্থকতায় পাঠের পরিসমাপ্তিতেও তা অস্তাভার দিব্য গরিমার মতো আলোক-সম্পাতী। এবং সেটাই কবিতার উদ্দিষ্ট রস-লক্ষ্য।

গভীরের আহ্বানে গভীরের জাগরণ না হলে শ্রেষ্ঠ কবি-কর্মের জন্ম সম্ভব নয়। সচেতন কবিকর্মের সঙ্গে মনের চেতনেতর অংশ কেমনভাবে এক সমগ্রতায় ধৃত হলে কাব্যের উৎকর্ষ সাধিত হয়, আবার কেমনভাবে আবেগের আতিশয্যে মনের অনুষঙ্গ-সৃজনী ক্ষমতা বিকল হয়ে কবিতার রস-লক্ষ্যের ব্যত্যয় ঘটায়, রবীন্দ্রনাথের বহু পঠিত 'দুঃসময়' কবিতাটি তার একটি নিদর্শন। ব্যক্তি-জীবনগত অনিশ্চয়তা-বোধ, শিল্পীর তপস্যা এবং বরলাভের মধ্যবর্তী দুরতিক্রম্য ব্যবধান এই কবিতার নেপথ্য-ভূমি। ক্লান্ত এবং উড্ডীন পাখি কবির চেতনেতর মনে তৎকালীন সমগ্র অভিজ্ঞতাকে জাগ্রত করেছে এবং জীবনের সমগ্র বেদনা ও রুদ্ধশ্বাস-সংগ্রাম অন্ধ পাখির বেদনাকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করেছে বলে কবিতাটি চিত্রকল্পের প্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠতে পেরেছে। 'সঞ্চয়িতা' গ্রন্থে পাণ্ডুলিপির আলোক-চিত্রে দেখা যায় 'দুঃসময়' কবিতাটির একটি পূর্বরূপ ছিল। তখন এর নামকরণ হয়েছিল 'স্বর্গপথে'। স্বর্গ বা লক্ষ্যাভিসারী বিহঙ্গকে কবি তখন উদ্দিষ্ট রসমূর্তিতে ধারণ করতে পারেন নি। পাণ্ডুলিপির কবিতাটিতে দেখা যায় "ওরে বিহংগ, ওরে বিহংগ মোর" এই ধুয়া শুধু মাত্র শব্দঝংকারের বশবর্তী হয়ে প্রত্যয়-সিদ্ধ হয়ে উঠতে পারে নি। 'দুঃসময়' রূপে পরিবর্তিত কবিতার প্রথম চার স্তবকে সেই রস-প্রত্যয় জাগ্রত হয়। কারণ, পরিবর্জিত 'স্বর্গপথে' কবিতাটির মতো এখানে কবি বহু অভ্যাসে বিজীর্ণ ধ্বনিহীন শব্দমালার উপর নির্ভরশীল নন। প্রসঙ্গোৎ-সারিত চিত্রকল্পমালায় কবিকল্পনা এখানে সুপরিস্ফুট। প্রথম স্তবকের মধ্যমণি এই চিত্রকল্পটি ঃ 'মহা-আশঙ্কা জপিছে মৌনমন্তরে / দিক্ দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা।' ক্লান্ত-পাখির ব্যর্থতা ও অচরিতার্থতা-বোধ-সঞ্জাত অনিশ্চয়তা

আশংকা-উদ্বেলচিত্তে শুধু যেন স্বীয় অস্তিত্বকে ধারণ করে রয়েছে। 'জপিছে' এই ক্রিয়াপদ ভয়াবহ রাত্রির অনুষঙ্গে রবীন্দ্র-চিত্রকল্প-মালায় কতখানি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছিল 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থের আলোচনা-কালে তা পরিস্ফুট হবে। বিপন্ন অস্তিত্বের প্রতিটি মুহূর্ত-গণনা জপমালার অক্ষগণনার অনুষঙ্গ সৃজন করেছে। অবগুণ্ঠিত দিক্ দিগন্তের চিত্রকল্পে চতুষ্পার্শ্বস্থ দুরূহ বিমুখতার গভীর প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন। মহা-আশংকার মন্ত্র জপের চিত্রকল্পে যেন আত্যন্তিক বিনষ্টির ছায়া কম্পমান। পাখির প্রতি মুহূর্তের প্রয়াস এবং প্রতি মুহূর্তের সংগ্রামের দ্বন্দ্ব ক্লান্তির অনুভূতি প্রথম দুই স্তবকে প্রধান। পরবর্তী দুই স্তবকে সংগ্রামের প্রেরণা ক্লান্ত পরাভবের অনুভবকে ধীরে ধীরে অতিক্রম করার প্রয়াস পেয়েছে। দ্বিতীয় স্তবকে কবিকল্পনা প্রথম স্তবক অপেক্ষা সংহত হওয়ার ফলে অনুষঙ্গ সৃজন স্বচ্ছন্দতর। 'এ নহে মুখর বনমর্মর গুঞ্জিত'—এই চরণের বনের স্মৃতির আকর্ষণে পরবর্তী চরণে অজগরগর্জিত হিংস্র সাগরের ছবি ফুটে উঠেছে —'এ যে অজাগর-গরজে সাগর / ফুলিছে'। এটি প্রথম স্তবকে আভাসিত পাখির আত্যন্তিক বিনাশের ভীতিঅনুভবের সার্থক চিত্রকল্পগত অনুসরণ। এই পথেই এই কবিতার সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ চিত্রকল্পের উদ্ভব ঘটেছে তৃতীয় স্তবকে। তৃতীয় স্তবকের প্রথমে পাখির প্রতি মুহূর্তের বিপন্ন অস্তিত্বের অনুভূতি, ভয়াল রাত্রি প্রসঙ্গে পুনরায় প্রহরগণনার চিত্রকে আকর্ষণ করেছে, এবং সম্বৃত-নিঃশ্বাসবায়ু ও স্তব্ধ আসনের উল্লেখে বোঝা যায় যে জপমালার অনুষঙ্গ তখনও ক্রিয়াশীল। 'বিশ্বজগৎ নিঃশ্বাস বায়ু সম্বরি / স্তব্ধ আসনে প্রহর গণিছে বিরলে'—এই প্রহর গণনার চিত্রকল্পের পরেই—'সবে দেখা দিল অকূল তিমির সন্তরি / দূর দিগন্তে ক্ষীণ শশাঙ্ক বাঁকা'—এই চিত্রকল্পে সমগ্র কবিতার মূল সুরের সাক্ষাৎ মেলে। কবিতাটি রচনাকালে কবির সচেতন সৃজনীবৃত্তি এখানে যে ব্যঞ্জনা সঞ্চারিত করতে চেয়েছে তার ব্যাখ্যা সহজ। স্তবকটির দ্বিতীয় চরণে 'ঘুমায় অরুণ সুদূর অস্ত-অচলে' —একে অনুসরণ করে এই বক্তব্যে কবি উপনীত হতে চেয়েছেন যে, পাখির সম্মুখে এখনও দীর্ঘ যাত্রাপথ—সূর্যকরোজ্জ্বল দিনের এখনও অনেক বিলম্ব। কিন্তু যে আত্যন্তিক বিনষ্টির আশংকায় আতুর অস্তিত্বের যন্ত্রণা কবিতাটির কেন্দ্রস্থ ভাব, তার আকর্ষণে কবির সচেতন অভিপ্রায়কে লঙ্ঘন করে চিত্রকল্পটি স্বচ্ছন্দে বিকশিত হতে পেরেছে বলে কবিতার প্রসঙ্গে এর অর্থ অন্যতর। অকূল তিমির সন্তরণের পর যে ক্লান্ত ক্ষয়িষ্ণু চাঁদ দিগন্তরেখায় দেখা দিল সে আকাশ অতিক্রম করতে পারবে কিনা এই সংশয় চিত্রকল্পটির প্রাণবস্তু। ক্ষীণ

চন্দ্রাবশেষ এ-স্থলে একদিকে অসামান্য প্রয়াসের প্রতিনিধি, অন্যদিকে সম্মুখবর্তী ব্যর্থ বিলুপ্তির ইঙ্গিত। এই বিপন্ন অস্তিত্ব-বোধকে রূপময় করতে চেয়ে চতুর্থ স্তবকে প্রয়াস ও আশংকার দ্বন্দ্বকে ঊর্ধ্ব আকাশের নক্ষত্রের প্রেরণা, ও নিম্নে (গভীর উচ্ছলতাকে) শততরঙ্গের রূপকে ধারণ করা হয়েছে। এই পর্যন্ত আশ্চর্য চিত্রকল্প পরম্পরায় পাখির অশেষ প্রয়াস সার্থকভাবে রূপায়িত। কিন্তু কবির ব্যক্তিগত শান্তি-বাসনার স্মৃতি আবেগের আতিশয্যে কল্পনার ন্যায়কে অকস্মাৎ খণ্ডিত করেছে। এবং এতক্ষণ যে পাখি কবিতায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তার প্রত্যয় বিনষ্ট হয়েছে। "বহুদূর তীরে কারা ডাকে বাঁধি অঞ্জলি/ 'এস এস' সুরে করুণ মিনতি মাখা"—এই চরণের ভাবাতিরেকে ইতঃপূর্বে সুগঠিত প্রত্যয়ের খণ্ডীভবন শুরু হয়েছে, এবং কবিতাটির শেষ স্তবক একেবারেই ব্যক্তিগত আক্ষেপের সুরে ধ্বনিত হয়ে উঠল। 'ওরে বাসা নাই নাই ফুলশেজ রচনা'—কল্পনা এখানে ন্যায়ক্রম অনুসরণ করে নি। কেননা প্রশ্নটা যেখানে বিলুপ্তির অথবা অস্তিত্বের সেখানে 'নাই ফুলশেজ রচনা'—এ আক্ষেপ একান্তই নিস্তেজ এবং মূল ভাবের বিরোধী। তাছাড়া অঞ্জলিবদ্ধ হাত উড়ন্ত পাখিকে মিনতি করে ডাকছে এ যদি বা পাখির পক্ষে প্রাসঙ্গিক, ফুলশেজ-রচনার উল্লেখে স্পষ্টই প্রতীয়মান যে পাখি কবির কল্পনা থেকে হারিয়ে গেছে এবং আবেগাতিরেকে কবি স্বকণ্ঠে কথা বলতে চেয়ে রূপকের রসহানি ঘটিয়েছেন।

দুই

আমরা এ পর্যন্ত চিত্রকল্পের সাধারণ ধর্ম প্রসঙ্গে আমাদের আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রেখেছি এবং এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতাকে চিত্রকল্পের স্বভাব উপলব্ধির জন্য ব্যবহার করেছি। এখন আমরা এই কবির চিত্রকল্পের বিশেষ স্বভাব ও বিবর্তনের আলোচনায় প্রবেশ করব। 'কড়ি ও কোমল' পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রয়াসে যে খঞ্জতা তার মূলে কবির কল্পনার অপ্রস্তুতি। তখনও পর্যন্ত কবির আবেগ অভিজ্ঞতার বিস্তৃত সমর্থনে পুষ্ট হতে পারে নি। 'সোনার তরী'-র পূর্বে রবীন্দ্র-জীবন সেই সচল অভিজ্ঞতার আভাস মাঝে মাঝে লাভ করলেও, তাকে হৃদয়ঙ্গম করেছেন তিনি 'সোনার তরী'-'ছিন্নপত্রে'র কালে। এখানে রবীন্দ্রনাথ স্বাধীন। বিহারীলালের কবি-কৃতির ভিতরে রবীন্দ্রনাথ কিছু পথের ইঙ্গিত পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু বিহারী-লালের কাব্যে ভাষার কাব্যিক আভিজাত্যকে লঙ্ঘনের ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থীয় প্রয়াস

কল্পনার নির্বস্তুক চালের জন্য তাৎপর্যহীন। তাই বিহারীলালের কাব্যে খণ্ডীভূত নগর-জীবনের প্রতিক্রিয়া যদিও কখনো কখনো উপস্থিত তথাপি তার মূল-ভূমিতে ছিল শিথিলতা। মানুষের স্বার্থপরতাকে দেখে অরণ্যবাসের অভিলাষ, প্রকৃতি-প্রেমিকতা নয়। দৃশ্য-মুগ্ধতাও প্রকৃতি চেতনা নয়। সে সময়ে রমেশ দত্তের সামাজিক উপন্যাসে ছিল—'শহরে চল নতুবা উন্নতি নাই'—এই মনোভাব; পাশাপাশি বিহারীলালে ছিল মানুষ জন্তুর ভয়ে নির্জনবাসের বাসনা। গদ্য-কাহিনী ও কবি-কল্পনার এই বিপরীতাচরণের হেতু আমাদের নগর-জীবনের উদয়ের মূলে যে অষ্টাবক্রতা তার মধ্যে অনুসন্ধেয়। তথাপি কল্পনার সদৃশ-সূত্রের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও চাকুরি-লক্ষ্য মধ্যবিত্ত নায়কদের অপেক্ষা বিহারীলালের অনুভূতিতে ব্যক্তিজীবনের যন্ত্রণার ঝঙ্কার বেজেছিল বেশী। কল্পনার বিস্তৃত সৃজনভূমির অপরিণত গঠনের জন্য তিনি সে অনুভূতিকে বস্তুরূপময় করে তুলতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি সে-ক্ষেত্রে কিছুর প্রতিক্রিয়ালব্ধ ব্যাপার নয়। এখানে প্রতিক্রিয়ার সে জাতীয় কোনো সর্বাঙ্গীণ পটভূমিও ছিল প্রশ্নের বাইরে। স্মরণীয় যে রমেশ দত্তের উৎসাহ এবং বিহারীলালের যন্ত্রণার বাস্তব শিকড় তখনও ক্ষীণ এবং অপুষ্ট। কেননা শিল্পবিপ্লবের কালে আবিষ্কারের যুগ সম্বন্ধে ওয়ার্ডসওয়ার্থের আক্ষেপোক্তিতে যে great change এর কথা বলা আছে (I grieve when on the darker side of the great change, I look) সেই great change-এর অস্তিত্ব ব্যতিরেকে এই উৎসাহ আর যন্ত্রণা দুইই হয়ে দাঁড়ায় অমূল তরু।

রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থটি সে বিচারে কবির তৎকালীন অভিজ্ঞতার শুদ্ধ দান। এখানে প্রকৃতি-চেতনা কখনও নগর-জীবনের নেতিতে কল্পিত নয়। জীবনের দ্বন্দ্বকে উপলব্ধি করার মুকুর হিসাবে রবীন্দ্রকাব্যে প্রকৃতির ব্যবহার। বলা যায় তিনি জগৎ ও জীবনের প্রাণস্পন্দনকে প্রতিষ্ঠা করবেন বলেই প্রকৃতির শত শত প্রতিমা গড়ে তুলেছেন। 'সোনার তরী' কবিতাটি যে অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল বাঙালী পাঠককে কাব্য-রসামৃত দান করে চলেছে তার মূল এইখানে। কেন এই কবিতাটি আমাদের শান্ত আনন্দ দান করে, কিসে ঘটে চিত্তলোকের গভীর বিস্তৃতি, তার সন্ধান করতে গেলেই দেখা যাবে, সে শক্তির উৎস এ কবিতার রূপক-নির্মাণের সাহসিক অভিনবত্বে। কৃষক, ধানের ক্ষেত, এবং বর্ষার আকাশ—এই সমস্ত কিছুর মিলনের ভিতরে লৌকিক কর্মময় জীবনের যে প্রসাদ বিদ্যমান, এই কবিতার অন্তরশায়ী কল্পনার পক্ষে তা অলৌকিক স্পর্শের স্বরূপ। রূপকের এই বিশিষ্টতায় কবিতাটি বিশিষ্ট। শ্রেষ্ঠ কবিবৃন্দ সদাই তাঁদের কল্পনাকে

অভিজ্ঞতা-নিষ্কাশিত মূল্যে করে তোলেন পরম। যে মূল্যে ধৃত হলে সেই পরম প্রসন্নতা হয় কাব্যের সম্পদ তারই অভিব্যক্তিকে খুঁজি আমরা কাব্যের আত্মায় ও টেক্‌নিকে। এখানে দেশজ, প্রাকৃত জীবনাশ্রয়ী অভিজ্ঞতা কবি-কল্পনাকে সজীব করেছিল বলেই এর অবয়বে এসেছে এক গাঢ়-বন্ধ চিত্রল সংহতি। 'চারি দিকে বাঁকাজল করিছে খেলা'—কৃষকের প্রতিকূল বাস্তবতার আশ্চর্য ছবি। জলের বঙ্কিমতায় স্রোতের কুটিলতা এবং তদনুষঙ্গে সাপের বাঁকা গতির কথা মনে পড়ে। 'তরুছায়ামসী-মাখা' (বিশূন্য-ভবিষ্যৎ) কিংবা 'ঢেউগুলি নিরুপায় ভাঙে দুধারে' (ব্যর্থ আকুলতা) এবং 'শ্রাবণ গগন ঘিরে ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে' (বন্ধ্যা প্রাত্যহিকতা), সবই সেই চিত্রল পারম্পর্য, যা সংহত কল্পনার বহিঃপ্রকাশ। কবিতাটি রবীন্দ্র-কাব্য-পর্যায়ে গভীর তাৎপর্যে পূর্ণ। সোনার ধানের সঙ্গে বিচ্ছেদের এই স্মৃতি রবীন্দ্র-মানসের সমগ্রে জড়িয়ে যাওয়ার ফলে অতঃপর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিচ্ছেদকল্পনায় স্বর্ণবর্ণ স্বাভাবিক অনুষঙ্গ হিসাবে আকৃষ্ট হয়েছে। বাস্তব অভিজ্ঞতা কেমনভাবে কাব্যে ধৃত হল এবং কাব্য-ধৃত অভিজ্ঞতার স্মৃতি কেমন করে পরবর্তী কবিসৃষ্টিকে প্রভাবিত করল এ ব্যাপার তারও একটা নিদর্শন বটে। কাব্য রসিকদের কাছে এ কথা অজ্ঞাত নয় যে স্বর্ণবর্ণ 'সোনার তরী'-'চিত্রা'-পর্যায়ে বহু ব্যবহৃত বর্ণ-প্রসঙ্গ, এবং এই প্রসঙ্গে বিচ্ছেদের সুর কেমন বিজড়িত হয়ে রয়েছে সেটাও লক্ষণীয় বটে ঃ

ক. আকাশ সোনার বর্ণ সমুদ্র গলিত স্বর্ণ
পশ্চিম দিগ্বধূ দেখে সোনার স্বপন,
সন্ন্যাসী আবার ধীরে পূর্বপথে যায় ফিরে
খুঁজিতে নূতন করে হারানো রতন।

খ. মেঠো সুরে কাঁদে যেন অনন্তের বাঁশী
বিশ্বের প্রান্তর-মাঝে। শুনিয়া উদাসী
বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে
দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া···

গ. কখন যে সায়াহ্নের শেষ স্বর্ণরেখা
মিলাইয়া গেছে···
অন্তরের অন্তহীন অশ্রুপারাবার
উদ্‌বেলিয়া উঠিয়াছে হৃদয়ে আমার।

ঘ. অসীম রোদন জগৎ প্লাবিয়া দুলিছে যেন
তারি' পরে ভাসে তরণী হিরণ
তারি পরে পড়ে সন্ধ্যাকিরণ—

ঙ. শুধু এ সোনার সাঁঝে বিজনে পথের মাঝে
কলস কাঁদিয়া বাজে কাঁকনে।

এ-তালিকার কলেবরের ইচ্ছামতো বৃদ্ধি ঘটিয়ে দেখানো চলে যে স্বর্ণবর্ণ ও বিচ্ছেদ-বেদনা কবিকল্পনায় জড়িত থাকার ফলে স্বর্ণবর্ণের প্রসঙ্গে রোদন, অশ্রু প্রভৃতির অনুষঙ্গও ব্যবহৃত হয়েছে। অপরাহ্ন-সায়াহ্নের সূত্রে স্বর্ণবর্ণের ক্ষণস্থায়িত্ব এবং কৃষকের সঙ্গে সোনার ধানের বিচ্ছেদের স্মৃতি এ বিষয়ে কবি-কল্পনায় প্রভাব বিস্তার করেছিল। সোনার ধান সম্বন্ধে কৃষকের ভালোবাসায় যে অনুভূতি জড়িত—'আমি একে চিরস্থায়ী সঞ্চয় করে রেখে দিতে পারব না', অপরাহ্ন-সায়াহ্নের স্বর্ণসৌন্দর্য সম্বন্ধে কবি-অনুভূতির মূল কথাও সেই জাতীয়—'একে এখনি বিদায় দিতে হবে'। কৃষক শ্রমে যাকে রচনা করেছে, পাগল যন্ত্রণায় যাকে সন্ধান করেছে, কবির কাছে তাই ভালো-বাসায় সুন্দর। তা কখনও স্বার্থপর ব্যবহারের মুঠিতে ধরা দেয় না। তাই, স্বর্ণশস্য, স্বর্ণালোক, স্বর্ণাভা, স্বর্ণসন্ধ্যা প্রভৃতি শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়ায় জীবনেব ঐশ্বর্যময় অমেয় সম্ভাবনার প্রতীক। সেই সম্ভাবনা এবং স্থিতাবস্থার দ্বন্দ্বে জীবনের যন্ত্রণাময় অগ্রগমনের ব্যাপারই রবীন্দ্রকাব্যের আত্মা।

'সোনার তরী' কবিতাটি রবীন্দ্রকাব্য-ব্যাখ্যায় আরো একটি দিকে আলোক-সম্পাত করে। 'সোনার তরী' এবং 'চিত্রা'-যুগে দেখা যায় যে কবিকল্পনার বিকাশের দুই ধারা বিদ্যমান। এক ধরনের কবিতার সাক্ষাৎ মেলে যেখানে প্রত্যক্ষ জীবন কবিকে কল্পনার মূর্তি-গঠনে সাহায্য করেছে বেশী। সঙ্গে সঙ্গে আর এক ধরনের কবিতার ধারা বিদ্যমান যেখানে কবি কল্পনার মূর্তিগঠনে প্রত্যক্ষ জীবন অপেক্ষা, কাব্য-স্মৃতির দ্বারস্থ হয়েছেন অধিক। শেষোক্ত কবিতাগুলির ক্ষেত্রে কল্পনা যাদের অবলম্বনে অভিব্যক্ত, সেই সব চিত্রকল্পের গঠনে কিছুটা সাদৃশ্য-সূত্র আছে। মাল্য, মন্দির, মালঞ্চ, প্রদীপ, আরতি প্রভৃতির ব্যবহারে বৈষ্ণব পদকারদের কাব্য-ধৃত পরিমণ্ডল আভাসিত—তাদেরই সাহায্যে রবীন্দ্র-নাথের কল্পনামূর্তি এসব ক্ষেত্রে প্রাণবন্ত হবার প্রয়াসী। অথচ এটাও লক্ষ্য না করে উপায় নেই যে 'সোনার তরী'-'চিত্রা' পর্যায়ের অপেক্ষাকৃত অসংহত কবিতাগুলির সঙ্গেই এই মাল্য, মন্দির, মালঞ্চ, প্রদীপ, আরতি প্রভৃতির রূপক বিজড়িত। উদাহরণ স্বরূপ 'মানসসুন্দরী' ও 'সান্তবনা' কবিতার নাম করা চলে। কবিতাগুলি রীতিমতো কাব্যিক, এমনকি, কবি-আবেগের বিপুল আতি-

শয্যে যেন তারা মৃত্তিকার অনাত্মীয় কেউ—এমনও মনে হয়। কিন্তু প্রথমোক্ত কবিতাগুলিতে প্রকৃতির প্রত্যক্ষ ছোঁয়া লেগেছে বলেই তাদের বৃন্তলগ্ন দৃঢ়বন্ধ পাপড়িতে বর্ণের ও বৈচিত্র্যের সমারোহ। তাই 'সোনার তরী', 'হৃদয়-যমুনা', 'পরশ পাথর', 'নিরুদ্দেশ যাত্রা', এবং 'চিত্রা'-র 'দিনশেষে' কবিতায় দেখা যায় যে, এইগুলিই হচ্ছে সেই সব কবিতা যেগুলি প্রথাসিদ্ধ কাব্য-সংস্কারের উপর নির্ভরশীল নয়। কবি বিষ্ণু দে যাকে বলেছেন রবীন্দ্রকাব্যের অধিষ্ঠাতা আবেগ, সেই প্রকৃতির প্রত্যক্ষ ভাবাকাশে কবি-কল্পনা এখানে ধৃত এবং প্রতিটি কবিতার রূপকেই ব্যক্তির নৈঃসঙ্গ্যের যন্ত্রণার দীপ্তি। 'সোনার তরী' এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রকাব্যে কবির নিজস্ব অভিজ্ঞানের সূচক-নিদর্শন।

তিন

লক্ষণীয় যে কবিকল্পনায় সন্ধ্যার আলো-আঁধার বা মেঘময় দুর্যোগ বা ঘন আবর্ত-সংকুলতা তরীর প্রতীককে সদাই সাহায্য করেছে। জ্যোৎস্না-পুলকিত রাত্রি বা নির্মল সূর্যালোকিত দিনের প্রসঙ্গে তরীর ব্যবহার যে ঘটেনি তা নয়। কিন্তু সেখানে তরী প্রতীকের শক্তিতে গুণান্বিত হয় নি। তরীর অনুষঙ্গে এই দুর্যোগের স্মৃতি পুষ্ট হতে হতে স্বাধীনভাবে 'খেয়া'-'উৎসর্গ' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথকে নবীন রূপচিন্তার সন্ধান দিল। এই পর্যায়ে দেখা যায়—রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন বিরাট চিত্তের সঙ্গে মানবচিত্তের ঘাত-প্রতিঘাত, যাকে বলা যায় জীবনের দ্বান্দ্বিক সমগ্রতা, তাকে উপলব্ধির প্রয়াস আকর্ষণ করেছে একদিকে রাজা প্রভু প্রভৃতির রূপক, আর একদিকে শিব বা রুদ্রের রূপক। এই দুই রূপকেরই আধারভূমিকে পুষ্ট করেছে ঝঞ্ঝা-ঘন দুর্যোগের কল্পনা। বিশ্বজীবন রাজার মতো দাবি করে ব্যক্তিজীবনের সর্বস্ব, যেমন দুর্যোগের রাত্রি দাবি করে রুদ্ধার্গল ঘরের সুখসুপ্তি এবং শান্তি। নিঃসন্দেহে পরাধীন স্বদেশের বিক্ষুব্ধ জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত কবির তৎকালীন ব্যক্তিজীবন এই কল্পনায় অনেকখানি প্রাণশক্তির সঞ্চার করেছে। রাজা, প্রভু, রুদ্র, ঝড় এই সময়ের উপযুক্ত রূপকল্পনা। ইতঃপূর্বে মেঘ ঝড় দুর্যোগ বাংলা কাব্যে ছিল শুধু প্রকৃতিমুগ্ধতার উপাদান। জীবনের তাৎপর্যে মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথই তাদের মূল্য অনুভব করলেন প্রথম, এবং আমাদের শেখালেন সেই মূল্যে তাদের ভালোবাসতে। ঝড়ের প্রসঙ্গে 'দুয়ার' রবীন্দ্রনাথের প্রিয় প্রতীক। দুয়ার বিশ্বজীবন ও ব্যক্তি-জীবনের মধ্যবর্তী বাধার চিহ্ন। দুয়ার সংশয়ের নিদর্শন :

এই মেঘ-বজ্র-ঝঞ্ঝার মূল্যকে উপলব্ধি করার কালে, রাজা বা প্রভুর বৃহৎ

চেতনার ভাষানুষঙ্গে 'রথ' হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের প্রয়োজনীয় প্রতীক। জীবনের স্থিতাবস্থায় প্রচণ্ড বিশ্বজীবনের সংঘাতে উত্থিত আলোড়নের সঙ্গে রাজার রথের অনিবার্য আবির্ভাব জড়িত। তরীর এবং পাখির প্রতীকের মধ্যে ক্লান্তি এবং অতিক্রমণের প্রয়াস নানাভাবে অর্থসঞ্চার করেছে। তরীর তীরে ফিরে আসায় এবং পাখির নীড়ে ফিরে আসায় ক্লান্তি, ঝড়ঝঞ্ঝায় উভয়ের যাত্রায় অতিক্রমণের অসামান্য প্রয়াসের ইঙ্গিত। লক্ষণীয় যে, এই ঝড় বা বৃষ্টির দুর্যোগের পট-ভূমিকায় কবিমানসে পুনরায় বাদলাভিসারের স্মৃতিতে বৈষ্ণব পদকারদের কাব্য-ধৃত পরিমণ্ডল জাগ্রত হয়েছে বলে অভিসারিকা নায়িকার চিত্রকল্প ব্যবহৃত হয়েছে বারে বারে। 'ঝড়ের দিনে' নামক অল্পখ্যাত কিন্তু সুসার্থক কবিতাটি রচিত হয়েছে এই সময়েই।

তথাপি 'কল্পনা' থেকে 'উৎসর্গ'-'খেয়া' পর্যন্ত বিস্তৃত পর্যায়ে পুনরায় দেখা গেল যে, 'ক্ষণিকা'-র প্রত্যক্ষ জীবনেব হাওয়াতেই রবীন্দ্রনাথের মুক্তির নিঃশ্বাস। 'ক্ষণিকা'-কাব্যের অলৌকিক শক্তি লৌকিক জীবনেব মৃত্তিকা হতে রসসংগ্রহ করেছে। সে কারণে রবীন্দ্রকাব্য-পর্যায়ে 'ক্ষণিকা' অসামান্য। জীবনের সহজ ধারার অনুবর্তী হবার যে-বাসনা 'ক্ষণিকা'-র মূল সুর, তার মধ্যে প্রকৃতিকেই মুখ্য এবং ঋজু আবেগে ধারণ করার প্রয়াস সক্রিয়। 'ক্ষণিকা'-র রসরূপের বিশিষ্টতা উপলব্ধির জন্য 'আষাঢ়' কবিতাটিকে প্রতিনিধি স্থানীয় বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। অলংকরণের প্রয়াসহীন, স্বচ্ছন্দগতি ভাষা এবং প্রকৃতির সহজ রূপ ও জীবনের সরল স্পন্দনের ত্রিবেণী সংগম ঘটেছে এই কবিতায়, এই কাব্যগ্রন্থে। সংস্কৃত ক্লাসিকের কাব্য-খ্যাত বর্ষার রূপ রবীন্দ্রকাব্যে বারে বারে দেখা দিয়েছে। মেঘদূতের প্রসঙ্গে অথবা স্বাধীনভাবেও 'বর্ষামঙ্গল' কবিতায় কবি বর্ষার কাব্য-খ্যাত মূর্তিকেই গঠিত করেছেন ক্লাসিকের ছায়ায়। অবশ্যই সে সব কবিতায় কবির ঐতিহ্যমুখী মনের চেহারা আমাদের কাছে দিব্য স্ফূর্তি লাভ করেছে। কিন্তু 'সোনার তরী' কবিতাটির মতো 'আষাঢ়' কবিতায় পুনরায় কবি প্রচলিত কাব্যসংস্কারকে পরিহার করে জীবনের লৌকিক ও প্রত্যক্ষ স্পন্দনকে ধারণ করেছেন। কবিতাটিতে কোনো শঙ্কাতুর গৃহস্থমাতা পরিবারের কর্মিষ্ঠ সন্তানগুলির জন্য বৃষ্টি-ঘন আসন্ন অকাল আঁধারে ভাবনাকুল চিত্তে কথাগুলি উচ্চারণ করছেন। স্বভাবতই মায়ের আশঙ্কা-বাণীর তন্নিষ্ঠ রূপায়ণে কল্পনার অভিজাত আচরণ পরিহৃত। চিত্রকল্পের প্রয়াস অপেক্ষা চিত্রকে বিবৃত করার প্রবণতা অধিক। 'কালীমাখা মেঘে ওপারে আঁধার ঘনিয়েছে দেখ চাহিরে' কিম্বা 'দরদর বেগে জলে পড়ি জল ছলছল ওঠে বাজিরে'—এসব চরণে চিত্র-কল্পের সচেষ্টতা নেই। কল্পনার কাজ এখানে মাতৃহৃদয়ের ছবিটিকে প্রস্ফুট

করা। সরল ছবিগুলি সে উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হয়েছে বলে শেষতম স্তবকে 'বেণুবন' শব্দেও মাতৃবচনের বাস্তবতা খণ্ডিত হয়নি। 'ক্ষণিকা'-প্রসঙ্গে একথা বহুশ্রুত হলেও পুনরুক্তি দোষাবহ নয় যে 'কল্পনা' কাব্যে 'দুঃসময়', 'অসময়' প্রভৃতি কবিতায় যে সঙ্কট-চেতনা কবিকে অধিকার করেছিল 'ক্ষণিকা'-য় তার মুক্তি ঘটল জীবন ও প্রকৃতির উষ্ণ সান্নিধ্যে। 'কল্পনা'-র 'অশেষ' কবিতার যে ব্যাখ্যাই রবীন্দ্রনাথ দিন (এ আহ্বান তো শক্তিকেই আহ্বান, কর্মক্ষেত্রেই এর ডাক, রসসম্ভোগের কুঞ্জকাননে নয়) এখানেও শিল্পী-জীবনের সঙ্কটের কথাই প্রধান।

জীবনস্নানেই মুক্তি, এই অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে 'ক্ষণিকা'-য় বর্ষার চিত্রকল্পের ব্যবহার ঘটেছে বারেবারে। কিন্তু 'সোনার তরী'-'চিত্রা' পর্যায় থেকে কবিকল্পনা যে অগ্রসর হয়েছে তা বোঝা গেল বর্ষার অভিজ্ঞতা থেকে নবমূল্য নিষ্কাশিত করায়। 'ক্ষণিকা'-য় বর্ষা ব্যবহৃত হয়েছে বারেবারে—কিন্তু ভাবানুষঙ্গে বিরহকে আকর্ষণ করে নি। বর্ষা এখানে ব্যবহৃত হয়েছে কর্মের উল্লাসের এবং নবসমাগমের উচ্ছ্বাসেব অনুষঙ্গকে জাগ্রত করে। এই ভাবেই ভারতবর্ষের এই মহত্তম আধুনিক কবি ঐতিহ্যকে ব্যবহারের মাধ্যমে নবীন মূল্যে অর্থবান করে তুললেন। বুঝলেন যে ঐতিহ্য শুধু মেঘদূতে নয়, বাণভট্টে কালিদাসে নয়—দেশের প্রাণবন্ত আবেগের প্রবহমান ধারাকে উপলব্ধি করায় তার তাৎপর্য বোঝা যায়, সেই জীবনযুক্ত আবেগকে কল্পনার উপাদানে মূর্ত করে তোলায় কবি-কীর্তির সার্থকতা ভবিষ্য-প্রভাবী হয়। তাই 'নববর্ষা' কবিতায় ধৃত নায়িকাদের সৌখিন অথচ উচ্ছ্বসিত মূর্তির পাশে 'কৃষ্ণকলি' কবিতার লৌকিক নায়িকার সরল প্রাণময়তাকে প্রকৃত মূল্যে হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। প্রথম কবিতাটির কল্পনার ঐ অভিজাত আচরণ দ্বিতীয়ে মুক্তির আকাশকে না পেলে সেই সর্বালিঙ্গন প্রয়াসী কলাপী আবেগ 'আবির্ভাব'-এর চিত্রকল্পে সংহত হয়ে উঠতে পারত না।

অথচ নির্দ্বন্দ্ব স্নিগ্ধতার জন্য 'ক্ষণিকা'-য় কবিকল্পনার আকুলতা সত্ত্বেও বিস্তৃতির সঙ্গে সংহতির দ্বন্দ্বে তিনি যে কোনোদিন বিশ্রাম নিতে পারেন নি, এও সত্য। সত্যই, তিনি যেন জীবনকে বলেছেন —তুমি নবনব রূপে এস প্রাণে। এই বিস্তৃতির সঙ্গে সংহতির দ্বন্দ্বে রবীন্দ্র-চিত্রকল্পের জন্ম। 'ক্ষণিকা'য় প্রত্যক্ষ প্রকৃতি-ধৃত ছোট ছোট অসংখ্য ছবির স্মৃতি ক্ষণে ক্ষণে জীবনের বিস্তৃত পটকে উন্মোচিত করেছে বটে, কিন্তু 'বলাকা'তেই দেখা গেল সেই বিস্তৃত জীবন স্মৃতি-সঞ্জাত আবেগ প্রকাশে সংহত হতে চায়। দেশের নদীকূলে-কূলে ক্ষণে ক্ষণে প্রকৃতি-জীবনের অজস্র বিকাশ এবং অন্যদিকে আন্তর্জাতিক মানুষের

অন্তহীন প্রয়াস কবি-কল্পনাকে স্পর্শ করেছে। কল্পনা মুক্তি চেয়েছে টেকনিকের সাযুজ্যে—ছন্দে, ভাষাযোজনায়, চিত্রকল্পের অভেদে। আবার এই টেকনিকের বিকাশেই জীবনের চলিষ্ণু স্বরূপকে উপলব্ধি করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে। তিনি এতদিনে স্থিরপ্রত্যয় হয়েছেন যে 'সিন্ধুপারে' কবিতার কোলরিজীয় অতিপ্রাকৃত তাঁর অনাত্মীয়, রক্ত আলোর মদে মাতাল হয়ে ঝড়ের সন্ধানে শেলী-উপম কল্পনাচারিতাও তাঁর আপন নয়, এবং তাঁর 'তাজমহল' হয়ে উঠল না গ্রীসীয় পানপাত্রের মতো সত্যসুন্দরের বাণীবহ। তাই 'বলাকা'-র ভাবনায় 'ক্ষণিকা'-র প্রশান্তির প্রশ্রয় না থাকলেও সেই ভাবনাকে মূর্ত করার জন্য 'ক্ষণিকা'-য় ব্যবহৃত প্রকৃতিগত বিচিত্র অভিজ্ঞতারই ডাক পড়েছে—যেখানে বিধুরতা নেই। 'আমার যা শ্রেষ্ঠ ধন সে তো শুধু চমকে ঝলকে / দেখা দেয় মিলায় পলকে'—'বলাকা'-র এই চিত্রকল্পের পশ্চাতে 'ক্ষণিকা'-র—'নদী জলে পড়া আলোর মতন ছুটে যা ঝলকে ঝলকে'—এই চিত্রের স্মৃতি ক্রিয়াশীল। 'বলাকা'-র রক্তসন্ধ্যা, রক্ত-জবা, রক্ত আলো, লাল চেলি সমস্তই পর্যায়ান্তরে যাত্রার প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত। বিবাহের লাল চেলির অনুষঙ্গেই 'বলাকা'-য় লালরঙের তাৎপর্য অনুসন্ধেয়। বিবাহ বধূর প্রসঙ্গে একটি অধ্যায়ের অবসান ও নবজীবন-যাত্রা। রবীন্দ্রকল্পনায় বিবাহ কখনও কখনও মৃত্যুর রূপক কেননা মহৎ মৃত্যুকে তিনি সমাপ্তি বলে মানেন না। এও যাত্রা। তাই যাত্রার অনুষঙ্গে 'বলাকা'-র লাল রঙের ব্যবহার। যাত্রার ভাবানুষঙ্গেই আবার 'বলাকা'-য় কবির প্রিয় প্রতীক নদী আর পাখি। অথচ নদী পাখির অনুষঙ্গে 'ক্ষণিকা'-র যুগের পদ্মার জীবন-স্মৃতি বহুভাবেই প্রকাশিত। 'আলোর আনন্দ নিয়ে জলের তরঙ্গে এরা নাচে' কিংবা 'যেদিন শ্রাবণ নামে দুর্নিবার মেঘে / দুই কূল ডোবে স্রোতোবেগে' কিংবা 'সন্ধ্যা-রবির স্বর্ণকিরীট ফেলে দিল অস্তপারে'—এই সমস্ত চিত্রকল্পে তার নিদর্শন। 'সে আনন্দ থেমে যেত যদি / এই নদী / হারাত তরঙ্গবেগ'—এ যেমন 'বলাকা'-র উপযুক্ত ভাষা-চিত্র, তেমনি এ-পরিণতির মূলেও বিস্তৃত জীবনস্রোত। কবির কল্পনার পক্ষেও এই উক্তি সত্য। আর 'শব্দময়ী অপ্সর রমণী / গেল চলি স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি'—এই চিত্রকল্পে তো কবির হাতে দেশের ক্লাসিক আর দেশের প্রকৃতির প্যাশন সমভাবে স্ফূর্তি-লাভ করেছে। রবীন্দ্রকল্পনার মধ্যগগন বললে ঠিকই আখ্যাত হয় এই পর্যায়।

তথাপি 'বলাকা'-র ৪১ সংখ্যক কবিতাতে, 'পূরবী'-র কালের সূচনাতেও 'ক্ষণিকা'-র জীবনস্মৃতির সুস্পষ্ট স্বাক্ষরই আবার পাওয়া গেল। শিল্পীর যন্ত্রণা, নৈঃসঙ্গ্য-পূরণের প্রয়াস ও সহজ জীবনপ্রীতিতে 'বলাকা'-র ৪১ সংখ্যক কবিতাটি গ্রন্থের অনেক কবিতায় ধৃত তীব্র দার্শনিক ভাবনার সম্পূর্ণ বিরোধী।

'চলে কি না চলে / ক্লান্ত স্রোত শীর্ণ নদী, নিমেষ-নিহত / আধো জাগা নয়নের মতো'—এই চিত্রকল্পে যে অবসন্নতার ব্যঞ্জনা তা যেন উজ্জীবিত হতে চাইছে সেই পথে যে পথ—'চলেছে মাঠের ধারে, ফসল ক্ষেতের যেন মিতা / নদী সাথে কুটিরের বহে কুটুম্বিতা'। এই পথেই 'বলাকা'-য় রবীন্দ্রনাথ চিত্রকল্পের যে প্রধান গুণ আয়ত্ত করেছেন, তা পরিপূর্ণ হয়ে উঠল 'পূরবী'-তে। তাঁর চিত্রকল্পই হয়ে উঠল ভাবনার ভাষা। 'সোনার তরী'-'চিত্রা'-য় চিত্রকল্পরাজির কাজ ছিল কবির কল্পনাকে সাহায্য করা। কিন্তু 'বলাকা'-র ঐ অপরিচিত পংক্তিকয়টির মধ্যেই দেখা গেল যে ধীরে ধীরে কবি ভাবানুভূতির প্রকাশকে চিত্রকল্পমাধ্যমী করে তুলতে চাইছেন। 'সোনার তরী'-র বিখ্যাত কবিতা 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'-য় দিনান্তের পশ্চিম আকাশ রবীন্দ্রনাথের হাতে হয়ে উঠেছে—'ওই যেথা জ্বলে সন্ধ্যার কূলে দিনের চিতা।' পৃথক চিত্রকল্প হিসাবে এর সাদৃশ্য-বাচকতাকে কেউ সন্দেহ করবে না। কিন্তু কবিতাটির মূল রসকল্পনা প্রসঙ্গে চিতা শব্দে রসাভাসের অভিযোগ উঠতে পারে। কেননা চিতাগ্নি যে ভাবানুষঙ্গের ধারক, তা বিদেশিনী সুন্দরীর যিনি সহযাত্রী তাঁর বিস্ময়ঘন মানসিক অখণ্ডতার পক্ষে প্রক্ষিপ্ত শব্দ। 'পূরবী'-তে সন্ধ্যা বর্ণনায় সেক্ষেত্রে—'যেথা অস্তগামী রবি / সন্ধ্যা মেঘে রচে বেদী নক্ষত্রের বন্দনা সভায়, / যেথা তার সর্বশেষ রশ্মিটির রক্তিম জবায় / সাজায় অন্তিম অর্ঘ্য'—এই চিত্রকল্প শুধু চিত্রকল্প নয়, এই তার অভিজ্ঞতার ভাষা। আরো লক্ষণীয় যে 'বলাকা'-'পূরবী'-র কালেই দেখা গেল রবীন্দ্রনাথের চিত্রকল্প এতকাল উপমা ও রূপকের হাত ধরে চলতে চলতে এইবার জীবনের ভাবনাগত জটিল গভীরের বিশিষ্ট ধ্বনি হতে পেরেছে। সে কারণে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' থেকে উদ্ধৃত চিত্রকল্পটির স্বতন্ত্র সম্মান থাকলেও 'পূরবী' থেকে উদ্ধৃত অংশটির পূর্ণরসভোগে কবির তৎকালীন সমগ্র অভিজ্ঞতাই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। 'সাজায় অন্তিম অর্ঘ্য'—সেই আশ্চর্য ভাষার একাংশ। মন্দির, আরতি, প্রদীপ প্রসঙ্গে 'সোনার তরী'-'চিত্রা'র যুগে কাব্য-সংস্কারগামী কল্পনা কিছুটা যে অসংহত ছিল সে কথা পূর্বে বলা হয়েছে; কবির নিজ অভিজ্ঞতাসিদ্ধ জীবন-প্রসঙ্গে তারাই 'পূরবী'-র কালে হয়ে উঠল নবীন অর্থ-গৌরবে সমৃদ্ধ। 'প্রতিমা না হয় হয়েছে চূর্ণ, বেদীতে না হয় শূন্যতা' কিংবা 'সন্ধ্যারতি লগ্নে কেন আসিলে না নিভৃত মন্দিরে / শেষ পূজারিনি' কিংবা আরো পরবর্তী কালে 'তবু ভাঙা মন্দির বেদীতে / প্রতিমা অক্ষুণ্ণ রবে সগৌরবে—তারে কেড়ে নিতে / শক্তি নাই তব' —সমস্ত ক্ষেত্রেই মন্দিরের রূপকে নিজ বিস্তৃত জীবনের কথা ভাবা হয়েছে। প্রাচীনার্থ-বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করে এরা এতদিনে হয়েছে যথার্থ কল্পনা-

সিন্ধ। অন্যদিকে, 'তারায় তারায় খোঁজে তৃষ্ণার আতুর অন্ধকার / সঙ্গসুধারস' কিংবা 'ঝঞ্ঝার মদিরামত্ত বৈশাখের তান্ডব লীলায় / বৈরাগী বসন্ত যবে আপনার বৈভব বিলায়' প্রভৃতি চিত্রকল্পের তাৎপর্য বিষয়ের আত্মাকে আবিষ্কার এবং কল্পনার বিকল্পবিহীন ভাষা হয়ে ওঠা। 'পূরবী' পর্যায়ে কবি যে বেদনার ঝঙ্কারে অনুপম রসসিদ্ধির পথে পদার্পণ করেছিলেন তার উৎসে যদিও ব্যক্তিজীবনের সুখের স্মৃতি, শোকের স্মৃতি, যদিও আসন্ন মৃত্যুবোধের ছায়াই তাদের জন্মভূমি, তথাপি যন্ত্রণাটির পরিণত আকারে শিল্পীর নিজস্ব দ্বন্দ্ব-বেদনার উপস্থিতি—'বহুদিন মনে ছিল আশা / অন্তরের ধ্যানখানি / লভিবে সম্পূর্ণ বাণী'। 'পূরবী'-তে এই অকৃতার্থতার বোধ থেকেই সৃজিত হয়েছে উদ্ধৃত চিত্রকল্পের মতো অসংখ্য চিত্রকল্প।

চার

'পূরবী'-পাঠে 'পূরবী'-র কতকগুলি লক্ষণ রসিকমানসে রেখাপাত না করে পারে না। প্রথম—'পূরবী'-তেই কবিজীবনের নতুন এবং শেষ অধ্যায়ের সূচনা। কেননা, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে প্রথানুগত নয় এমন সব আপাতগদ্যস্বভাব বিষয় কাব্যের বিষয়ীভূত হচ্ছে এ 'পূরবী'-তেই প্রথম দেখা গেল। যেমন পশুর কঙ্কাল বা আকন্দের ন্যায় কাব্যে-উপেক্ষিত বিষয়ের কথা বলা যায়। দ্বিতীয় —সমকালীন দেশীয় ঘটনা কবিচিত্তে প্রত্যক্ষ ছায়াপাত করেছে এও 'পূরবী'-তেই প্রথম দেখা গেল, যেমন 'চিঠি' কবিতাটি। কিন্তু প্রথম এবং দ্বিতীয় এই দুই লক্ষণই বিকশিত হয়েছে 'পূরবী'-পর্যায়ের বিশিষ্ট কবিমানসের বহিঃপ্রকাশ হিসাবেই।

'পূরবী'-র সেই বিশিষ্ট কবিমানসের প্রধান কথা, ভারমুক্তি। 'পূরবী'-র পূর্বে 'উৎসর্গ' থেকে 'বলাকা' পর্যন্ত কবিমানসে যে অরূপতত্ত্ব আধিপত্য বিস্তার করেছিল, 'পূরবী'-তে তা পরিহৃত হতে চলেছে একথা নিশ্চিত।

'পূরবী'-র আপাত-দৃশ্যে দেখি যে শরৎ বা আশ্বিন তার স্থায়ী ঋতু। 'পূরবী'-র জগৎজীবনে মেঘমুক্তি বা বর্ষণ-মুক্তির বার্তা বারংবার বিঘোষিত হয়েছে। বসন্ত অপেক্ষা শরৎ-প্রকৃতির উল্লেখ 'পূরবী'-তে সংখ্যার দিক দিয়ে অধিক। 'বলাকা'-'মহুয়া' বা 'সোনার তরী'-'চিত্রা'-য় বসন্ত বা বসন্ত-বাচক ফাল্গুনের ব্যবহার হয়েছে বেশি। সংখ্যাগত তুলনায় (ঐ কাব্যগ্রন্থগুলির সঙ্গে) 'পূরবী'-তে শরৎ বা শরৎবাচক শব্দের আধিক্য দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না। শরৎ-আশ্বিন-কাশফুল-সাদামেঘ-নীল আকাশের এই যে প্রাধান্য কবিকল্পনায়

তখন বিরাজ করছিল, তার জন্যও ঐ ভার-পরিবর্জনের অভিজ্ঞানে চিহ্নিত। নীল ও শুভ্র এই দুই শরৎবাচক রঙের ব্যবহার বসন্তবাচক রক্ত বা স্বর্ণ বর্ণের উল্লেখের অপেক্ষা এই কারণেই 'পূরবী'-তে বেশি।

'পূরবী'তে এই যে মেঘমুক্তির বিঘোষিত বাণী, তা আসলে তত্ত্বমুক্তির প্রতিনিধি। কবিজীবনের তত্ত্ব-সাধনার বা অরূপ-উপলব্ধির যুগে কবিমানসের সচেষ্ট ভূমিকাকে কবি যে-সাফল্যের সঙ্গেই ব্যবহার করে থাকুন না কেন, অবচেতনের মৃত্যু-চিন্তাজনিত ত্বরান্বিত নিছক জীবনপ্রীতিই কবিকে শেষ পর্যন্ত অধিকার করেছে। 'পূরবী'-র মেঘমুক্তি তারই বাণীবহ। সেইজন্যই ঝড়-বাদলের রূপকে 'খেয়া'-'বলাকা'-র কাব্যসাধনায় দুঃখরাতের রাজার যে তত্ত্ব আমরা উপলব্ধি করি, সেই ঝড়-বাদলের কোনো প্রকার চিত্রকল্পের ব্যবহার 'পূরবী'-তে পাওয়া যায় না। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, রবীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রিয় ঋতু বর্ষার উল্লেখমাত্র নেই 'পূববী' কাব্যগ্রন্থে। প্রথানুগতভাবে বর্ষা-বসন্তের শাব্দিক উল্লেখ আছে হয়তো, কিন্তু সেটা দ্বৈত-ভাবদ্যোতক শব্দ-যুগলমাত্র, তার বেশি কিছু নয়। বর্ষা পৃথকভাবে কোনো চিত্রকল্পে ব্যবহৃত হয় নি। একটিমাত্র ঝড়ের কবিতা আছে 'পূরবী'-তে, কিন্তু সে কবিতার সঙ্গে 'বর্ষশেষ' বা 'বলাকা'-র 'ঝড়ের খেয়া' কবিতার কোনো তুলনা হয় না। 'পূরবী'-র 'ঝড়' নামক কবিতায় কোনো ইমেজ পুষ্পান্বিত হয়ে ওঠে নি। ইমোশনের দ্বারা কৃত্রিমভাবে প্রাধান্য স্থাপনের যে ঝোঁক তা কবিমানসের ভাবানুষঙ্গ সৃজনের স্বাধীন ক্ষমতাকে ব্যাহত করে—এবং এরই অপরিহার্য ফলে চিত্রকল্প-সৃজন সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। এ থেকেই বোঝা যায় যে. ঝড় বা বর্ষা 'পূরবী'-পর্যায়ে কবিকল্পনার আত্মীয় নয়। উক্ত কবিতাটিতে মৃত্যুপ্রসঙ্গ বা গতির প্রতীকরূপে ঝড়ের ব্যবহার ঘটেছে বটে, কিন্তু এমন কোনো চিত্রকল্প এ কবিতাটিতে পাই না যাতে ঝড় সম্বন্ধে কবি-কল্পনার নতুন কোনো প্রসাদ আমরা লাভ করি। বলা যেতে পারে—যে-মানসবৈশিষ্ট্য 'পূরবী'-তে শরৎ বা শরতের চিত্রকল্পকে স্থায়িত্ব দিয়েছে, অথবা শারদাকাশের নীলিমা এবং বর্ষণরিক্ত মেঘ ও কাশ-শিউলির শুভ্রবর্ণকে 'পূরবী'-র স্থায়ী রঙ হিসাবে ব্যবহার করেছে, সে মানস-বৈশিষ্ট্য বর্ষাবাদলের মনোভাবকে প্রশ্রয় দিতে পারে না। আদিগন্ত মেঘাড়ম্বর বা বর্ষণ আমাদের অন্তর্মুখী করে তোলে, বিশ্বসংসার থেকে বিচ্ছিন্ন করে আমাদের। এই বিচ্ছিন্নতা পরিহার করাই 'পূরবী'-তে কবির উদ্দেশ্য। তত্ত্বভারমুক্তির এই পটভূমিই 'পূরবী'-র পরিমণ্ডল-সৃজনের মূলে কবিমনের অখণ্ড সহযোগী হিসাবে সক্রিয়।

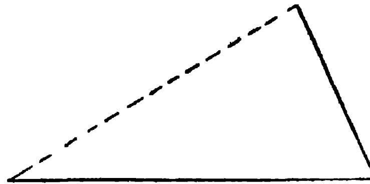
পাঁচ

এরই নেপথ্যে 'পূরবী'-র আকাশের সর্বত্র এক অপরূপ শূন্যতার বোধ। বর্ণরিক্ত মেঘের চিত্রকল্প বা নীলরঙের প্রাধান্য সেই 'শূন্য'—বোধকেই সমর্থন করছে। সমগ্র 'চিত্রা' বা 'কল্পনা' বা 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থে যতবার 'শূন্য'-শব্দের প্রয়োগ ঘটেছে 'পূরবী'-কাব্যের প্রথম এক শত পৃষ্ঠার মধ্যে তার চেয়ে অনেক বেশিবার এর আবির্ভাব। শূন্য-শব্দের সম্ভাব্য তালিকা 'পূরবী'-তে এই ঃ

শূন্যবালু ॥ শূন্যে নবীনসূর্য ॥ শূন্যতারে সাজাই নানা সাজে ॥ শূন্য দিল ভরে ॥ শূন্য শাখে ॥ শূন্যকক্ষ ॥ শূন্যের অকূল ॥ শূন্যে গেল ভেসে ॥ শূন্য তোমার অঙ্গনে ॥ শূন্যে জাগায় বন্দনাগান ॥ শূন্যতা॥ শূন্যতার সীমাশূন্য ভারে ॥ শূন্যে দেখা দিবে ॥ শূন্য শূন্য নয় ॥ জনশূন্য ॥ শূন্য মাঝে ॥ সঙ্গশূন্য ॥ শূন্যতল ॥ শূন্যে ভরে গানে ॥ শূন্য দীর্ঘশ্বাস ॥ শূন্য এ প্রাঙ্গণ ॥ শূন্যে শূন্যে রূপ ধরে ॥ শূন্যে দিল হানা ॥ শূন্য প্রাণের পাত্র ॥ শূন্যঘর ॥ শূন্যতরী ॥ শূন্য পথে ॥ শূন্যতার উপহাস ॥ শূন্যময় আঁধার প্রান্তর ॥ শূন্যময় ॥ সঙ্গশূন্য ॥

উপরের তালিকাটি পরীক্ষাকালে যা অনায়াসে দৃষ্টিগোচর হয় তা হল এই যে শূন্য শব্দের প্রত্যক্ষ অর্থে বিশেষণরূপে ব্যবহার, বিশেষ্যরূপে পরোক্ষ অর্থে ব্যবহারের চেয়ে আনুপাতিক হিসাবে বেশি। "শূন্য' রিক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ২১ বার, আকাশ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ১৩ বার। সে জায়গায় 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থে যে কয়েকবার 'শূন্য' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তার মধ্যে আকাশ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সংখ্যায় বেশি। রিক্ততা বা শূন্যতা শরৎ-আকাশের শূন্যতাকে দ্যোতিত করার ফলেই 'পূরবী'-তে আকাশেও বারবার শূন্য আখ্যা পেয়েছে।

শূন্য—(অবচেতনের রিক্ততাবোধ)



আকাশ-শূন্য-নীলিমা-
শাদামেঘ-কাশ-শিউলি-হেমন্ত

রিক্ত
॥
নঞর্থক শব্দ

এই শূন্যতাবোধের সমর্থনে 'পূরবী'-তে আমরা নঙর্থক-শব্দের বহুল সাক্ষাৎ পাচ্ছি। দেখা যায়, এই শব্দসমষ্টির আবৃত্তিও একটা বিশেষ কবি-চিন্তাকে সুস্পষ্ট করে তুলেছে। শব্দগুলি এই ঃ

অজানা পথ ।। অশান্ত নিশীথরাতে ।। অকৃতার্থ আশা ।। অসিদ্ধ সাধনা ।। অসমাপ্ত সঙ্গীতের ডালি ।। অকূলে ।। অযত্নে ।। অগীত সংগীত ।। অযত্নে ।। অকিঞ্চন ।। অশ্রুত ।। অকূলে ।। অজানা ।। অনিত্য ।। অযাত্রাপথ ।। অচিন ।। অধরা স্বপ্ন ।। অস্পষ্ট ।। অসাড় ।। অব্যক্ত ।। অখ্যাত ।। অসম্পূর্ণ নৈবেদ্য ।। অসমাপ্ত পরিচয় ।। অবিশ্বাসী ধূলি ।। অজানা কক্ষ ।। অপূর্ণের রেখা ।। অচেনার মরীচিকা ।। অজানা দেশ ।। অনাদর ।। অব্যক্তের অস্থির গর্জন ।। অলক্ষ্য ।। অতলে ।। অমূর্ত আধারে ।। অতৃপ্ত আশার ধূলিস্তূপ ।। অজানা ক্রন্দন ।। অসম্পূর্ণ ।। অজানা রজনী ।। অপূর্ণের যত দুঃখ ।। যত অসম্মান ।। অকূলে ।। অদেখা দূর পারে ।। অজানা ।। অন্ধকার অজানা ।। অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস ।। অজানা ভাষা ।। অবেলা ।। অজানা ।। অকূল অন্ধকার ।। অশান্ত চোখ ।। অসম্পূর্ণ লেখা ।। অবিচিত্র আমি ।। অনির্দেশ ।। অলক্ষ ।। অতল ।। অকিঞ্চন ।। অকূল ।। অশান্ত অনাদর ।। অভাব ।

তালিকাটি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে এর মধ্যে কতকগুলি শব্দ রয়েছে যেগুলি রবীন্দ্রনাথের প্রিয়-পরিচিত, পূর্বব্যবহৃত শব্দাবলীর অন্তর্ভুক্ত, যেমন 'অজানা' 'অদেখা' 'অধরা' 'অচিন' প্রভৃতি। কিন্তু রবীন্দ্র-প্রথানুগত শব্দগোষ্ঠির কথা বাদ দিলে যে সমস্ত শব্দের সাক্ষাৎ 'পূরবী'-কাব্যগ্রন্থে পাওয়া যায় সেগুলি প্রায়ই অসমাপ্তিবাচক। যেমন, 'অকৃতার্থ' 'অসিদ্ধ' 'অসম্পূর্ণ' 'অতৃপ্ত' প্রভৃতি। বলা বাহুল্য 'অধরা' 'অচিন' প্রভৃতি শব্দ কবির অরূপাকৃতিকে ব্যক্ত করছে। কিন্তু শেষোক্ত শব্দগুলি তা করছে না। এদের কাজ হল কবির নবলব্ধ বেদনাকে রূপায়িত করা। বলা যায় 'পূর্ণ-অপূর্ণের' সম্পর্কে যে অপূর্ণের কথা উৎসর্গ-গীতাঞ্জলি পর্যায়ে কল্পনা করা চলে, 'অসম্পূর্ণ' শব্দটির দ্বারা সে অর্থ দ্যোতিত হচ্ছে না। সেখানে 'অপূর্ণ' শব্দটি রবীন্দ্র-অধ্যাত্মবোধের একটি প্রিয় পারিভাষিক শব্দ হতে পারত। এখানে অপূর্ণ আর অসম্পূর্ণ একার্থবাচক নয়। 'অসম্পূর্ণ' এখানে কোনো দার্শনিকের ভাষা নয়। এ অসম্পূর্ণতা সম্যক অর্থে মানবিক অসম্পূর্ণতা। মানবজীবনের অন্তিম চূড়ান্ত পরিণতির সম্মুখে দাঁড়িয়ে কবির বিশ্ববীক্ষার এবং তার রূপনির্ণয়ের যে অসম্পূর্ণতা, তাকেই কবি নানা ধরনের নঙর্থক-শব্দের সাহায্যে ব্যক্ত করেছেন। যে মৃত্যুবোধ থেকে 'অনির্দেশ' 'অলক্ষ্য' প্রভৃতির সংশয়ভাব গঠিত হয়েছে, সেই মৃত্যুচেতনাই কবির অসম্পূর্ণতার

বেদনাকে তীব্র করেছে একালে এবং গঠিত করেছে একালের শ্রেষ্ঠ ইমেজ-গুলিকে। এই অসম্পূর্ণতার বা অকৃতার্থতার বেদনাই 'শূন্য' শব্দের জনক—এই 'শূন্যাকর্ষণেই' শরতের বিশূন্য আকাশ-প্রকৃতির অনুষঙ্গ সৃজিত হয়েছে।

শূন্যতাবাচক শব্দের প্রতি কবির যে পক্ষপাতকে 'পূরবী'-পর্যায়ের বিশিষ্টতা বলে মনে করা হচ্ছে, নিচের শব্দাবলীও নিঃসন্দেহে তারি দিকে অঙ্গুলিসংকেত করছে :

রিক্ত ।। রিক্ততা ।। রিক্ত বৃষ্টি ।। নামহারা ।। চিহ্নবিহীন ।। শান্তিবিহীন ।। সর্বহারা ।। স্পর্শহারা ।। নামহীন ।। দীপ্তিহীন ।। তৃপ্তিহীন ।। নিশ্চল ।। নিস্তব্ধ ।। নিদ্রাহীন ।। রিক্ত ।। গীতহীনা ।। নির্জন ।। শব্দহীন ।। নিঃশব্দ নিশা ।। জনহীন ।। সঙ্গিনীহীন পাখি ।। চিহ্নহারা ।। রূপনিঃস্ব ।। নিঃসীম ।। মূর্তিহীন ব্যর্থতা ।। খ্যাতিহারা ।। স্মৃতিহারা ।। লক্ষ্যহীন ।। নিদ্রাহীন ।। তন্দ্রাহীন ।। তারাহারা ।। নামহারা ।। পথ-হারানো ।। বাসাহারা ।। সঙ্গীহীন ।। শ্রীহীন ।। চিন্তাহীন ।। রিক্ত ।। সবহারাবার ।। বিত্তরিক্ত ।। সর্বস্বান্ত ।। বীণাহারা ।। দীপহীন ।। অর্থহারা ।। সর্ববন্ধহীন ।। বিত্তহীন ।। ভিত্তিহীন ঘর ।। মূল্যহীন খেলা ।। নিঃস্ব ।।

শূন্যতার অনুভূতি কবিচেতনায় কতটা দৃঢ়ীভূত, তা 'রিক্ত' শব্দের পুনরাবৃত্তি থেকেই পরিস্ফুট হয়। এ তালিকাতেও রবীন্দ্রনাথের পূর্বব্যবহৃত শব্দরাজির সাক্ষাৎ মেলে—যেমন 'নামহারা' 'পথহারানো' 'সবহারাবার' 'বাসাহারা' প্রভৃতি। কিন্তু এ যুগের বিশিষ্টার্থক কবিবচন, যথা, 'তৃপ্তিহীন' 'সর্বস্বান্ত' 'মূল্যহীন খেলা' 'ভিত্তিহীন ঘর' 'মূর্তিহীন ব্যর্থতা' এদের প্রয়োগ লক্ষ্য করার মত। পরবর্তী অধ্যায়ে—পরিশেষে—যে রাত্রিবাচক শব্দের পুনঃ পুনঃ ব্যবহার ঘটবে 'মূর্তিহীন ব্যর্থতা' 'মূল্যহীন খেলা' প্রভৃতি শব্দে তারি পূর্বাভাস।

ছয়

এ সমস্তের একমুখী অঙ্গুলিসংকেত এই কথাই জানাচ্ছে যে 'পূরবী'-তে রবীন্দ্র-মানস যে-বেদনার পটভূমিতে বিধৃত ছিল, সে বেদনা একান্তই লৌকিক রবীন্দ্রনাথের বেদনা। এ বেদনা শারীরিক অস্তিত্ব বিলুপ্তির পূর্বের মানবিক যন্ত্রণা। সে কারণেই দেখা যায় 'পূরবী'-র প্রেমের কবিতা নিছক প্রেমের কবিতাই। কবির জীবনই কবির প্রেম। তাই জীবনোপলব্ধির অসম্পূর্ণতা প্রেমের অসম্পূর্ণতার বেদনাকেই তীব্রতর করেছে। এ কারণেই 'পূর্ণতা',

'অপরিচিতা', 'কৃতজ্ঞ' প্রভৃতি কবিতার (যেগুলি নিছক প্রেমেরই কবিতা) নেপথ্য-ইতিকথায় রিক্ততার ও শূন্যবোধের এত প্রাধান্য। এই সঙ্গে এটাও উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত প্রেম-কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতায় এক নব আস্বাদ সৃজন করেছে। এটা পূর্ব পর্যায়ের কোনো প্রেমের কবিতায় আভাসিত হয় নি। প্রেমের কবিতাগুলি কবির ব্যক্তিস্পর্শের ফলেই অনন্য হয়েছে। ইমোশনের সজীব প্রাণবত্তা অবচেতনের অনুষঙ্গ-সৃজনের ক্ষমতাকে অব্যাহত রেখে কবিকল্পনার অখণ্ড মূর্তিকেই বারংবার চিত্রকল্পের মাধ্যমে কাব্যায়িত করেছে। ঐ জাতীয় কবিতার কতকগুলি অংশ পরীক্ষা করা যাক ঃ

ক. সেদিনের চুম্বনের 'পরে
কত নববসন্তের মাধবীমঞ্জরী থরে থরে
শুকায়ে পড়িয়া গেছে। (কৃতজ্ঞ)

খ. বিধুর হয়েছে সন্ধ্যা মুছে-যাওয়া তোমার সিন্দুরে। (কৃতজ্ঞ)

গ. কবে সে যে এসেছিল আমার হৃদয়ে যুগান্তরে
গোধূলিবেলার পান্থ জনশূন্য এ মোর প্রান্তরে
লয়ে তার ভীরু দীপশিখা। (ক্ষণিকা)

ঘ. তাহলে পড়িত ধরা রোমাঞ্চিত নিঃশব্দ নিশায়
দুজনের জীবনের ছিল যা চরম অভিপ্রায়। (ক্ষণিকা)

ঙ. এল আমার অধরপারে
ক্লান্ত ভীরু পাখির মত কম্পিত চুম্বন। (কিশোর-প্রেম)

উপরের কবিতার চিত্রকল্পগুলি যে ব্যঞ্জনা বহন করছে তার সব কটিই অনিচ্ছিত অবসানের ইঙ্গিত। প্রত্যাগমন, সন্ধ্যা প্রভৃতি সমাপ্তিবাচকতা এর কালগত রূপকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। যে অসম্পূর্ণতাবোধ 'পূরবী'-র 'শূন্য' ভাবনাকে গঠিত করেছে সেই বোধই এই চিত্রকল্পগুলির পশ্চাতে সক্রিয়। অসম্পূর্ণতাবোধই তত্ত্বভার-মুক্তিকে ত্বরান্বিত করেছে। প্রেমের কবিতাগুলির সংকেতও সেই দিকেই।

শুধু প্রেমের কবিতার ব্যাপারে নয়—দেখা যাবে 'পূরবী'-র শ্রেষ্ঠ চিত্রকল্পের প্রায় সর্বত্রই এই শূন্যতাজনিত অসম্পূর্ণতার দ্যোতনা। এই দ্যোতনার শিয়রে রয়েছে মৃত্যুবোধ। এই বোধ যে 'পূরবী'-পর্যায়ে কতখানি বদ্ধমূল কোনো কোনো কবিতার গঠনের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেও তা পরিষ্কার হয়। 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতার (এ ধরণের ব্যক্তিগত-বিষয়মূলক কবিতাও 'পূরবী' থেকেই শুরু হল ; 'জন্মদিন' 'অগোচরে' কবির শেষজীবনের নিছক মর্ত্য-প্রীতিরই প্রতিনিধি-স্থানীয় চিন্তা) মুখ্য আবেদন মৃত্যু-বিমুখ জিজীবিষার

কাছে। কিন্তু এই প্রোজ্জ্বল প্রদীপ্ত কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে যেন অপ্রাসঙ্গিক ভাবে এক ম্লানিমার ছায়া নামে।—প্রভাত-বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ কুত্রাপি এমন বিষণ্ণতা সৃজন করেন নি ঃ

দিগন্তে আরক্ত রবি
অরণ্যের ম্লান ছায়া বাজে যেন বিষণ্ন ভৈরবী।
শাল তাল শিরীষের মিলিত মর্মরে
বনান্তের ধ্যান ভঙ্গ করে।
রক্তপথ শুষ্ক মাঠে
যেন তিলকের রেখা সন্ন্যাসীর উদার ললাটে।[১]

এর পরবর্তী স্তবকেই সুর অকস্মাৎ পরিবর্তিত হয়েছে। এখন এই স্তবকের চিত্রকল্পটি পরীক্ষা করা যাক। দেখা যাচ্ছে, অরণ্যের ম্লান ছায়ার বিষণ্ণতা আরো স্থিরীভূত হয়েছে শুষ্ক মাঠের রিক্ততার উল্লেখে, এবং একেই একটি অব্যর্থ সুসঙ্গত 'চিত্রকল্পে' ফোটানো হয়েছে—'যেন তিলকের রেখা সন্ন্যাসীর উদার ললাটে'। সন্ন্যাসী বৈরাগ্যের তথা বিমুক্ত অবসানের পূর্ব-প্রদত্ত আভাসকেই পরিস্ফুট করে তুলেছে। এইভাবে শেষ চরণের সার্থক চিত্রকল্পটি 'পূরবী'র মূল বোধের সঙ্গে উপযুক্ত আত্মীয়তার নিদর্শন হিসাবেই গণ্য হতে পারে।

'পূরবী'-র অন্যান্য চিত্রকল্পগুলির সাক্ষ্যও এই কালের বিশেষ তাৎপর্যের দ্বারা চিহ্নিত। নিম্নোদ্ধৃত চিত্রকল্পগুলি তার প্রমাণ ঃ—

ক. নীলকান্ত আকাশের থালা
তারি 'পরে ভুবনের উচ্ছলিত সুধার পেয়ালা।

খ. যেথা অস্তগামী রবি
সন্ধ্যামেঘে রচে বেদী নক্ষত্রের বন্দনাসভায়,
যেথা তার সর্বশেষ রশ্মিটির রক্তিম জবায়
সাজায় অন্তিম অর্ঘ্য, যেথায় নিঃশব্দ বেণু-'পরে
সংগীত স্তম্ভিত থাকে মরণের নিস্তব্ধ অধরে।

গ. আশ্বিনের রৌদ্রে সেই বন্দী প্রাণ হয় বিস্ফুরিত
উৎকণ্ঠার বেগে, যেন শেফালীর শিশিরচ্ছুরিত
উৎসুক আলোক।

১. জন্মদিনের সঙ্গে বিষণ্নতা এযুগের প্রত্যক্ষ মৃত্যুবোধের জন্যই সুসঙ্গত। এ মৃত্যুবোধ স্থায়ী বলেই এর এমন অসতর্ক আবির্ভাব ঘটেছে। স্তবকটি বিচ্ছিন্নভাবে বিকেলের স্মৃতিবহ।

ঘ. আলোক চুম্বনে নীল জল
করে ঝলমল।
দিগন্তে মেঘের জালে বিজড়িত দিনান্তের মোহ,
সূর্যাস্তের শেষ সমারোহ।

ঙ. শরতের দিগন্ততলে
ছলছলে
তোমার যে অশ্রুর আভাস
আমার সংগীতে তারি পড়ুক নিশ্বাস।

'পূরবী'-পর্যায়ের বিশিষ্ট মৃত্যু-চেতনাই এই চিত্রকল্পগুলির নেপথ্য-রচয়িতা। খ-চিহ্নিত অংশ প্রসংগত পরীক্ষা করা যাক। অস্তগামী রবি নক্ষত্রের বন্দনা-সভায় সন্ধ্যামেঘের বেদী রচনা করছে, অর্ঘ্য রচনা করছে, সর্বশেষ রশ্মির জবাফুলে। এই চিত্রকল্পের প্রতি অংগের সম্মিলিত সৌষম্য একটি অকম্প্র কাব্যমূর্তি গড়ে তুলেছে। কিন্তু এর অঙ্গুলিসংকেতও কবির আসন্ন সমাপ্তি-বোধের দিকে। অস্তগামী রবির অবসন্নতার ব্যঞ্জনা কবি-জীবনের অবসন্ন অপরাহ্নের সংগে সমার্থক। এই সন্ধ্যা-বর্ণনার কালে কবির স্মৃতিতে নিঃসন্দেহে সাড়া দিয়েছিল কবিরই ব্যবহৃত এক পুরানো চিত্রকল্প—'ঐ যেথা জ্বলে সন্ধ্যার কূলে দিনের চিতা' (নিরুদ্দেশ যাত্রা)। সেই স্মৃতিই কবিমানসের অবচেতন থেকে সৃজন করিয়েছে এই চিত্রকল্পটি—'যেথা তার সর্বশেষ রশ্মিটির রক্তিম জবায়'। 'সর্বশেষ রশ্মির' 'রক্তিম জবা' নিঃসন্দেহেই অন্তিমতা-বাচক—স্পষ্টত মৃত্যুচিন্তাদ্যোতক। সন্ধ্যার দৃশ্যে যে কোনো ভাবুকেরই মৃত্যুর কথা মনে পড়তে পারে। কথা উঠবে, রবীন্দ্রনাথ বা কোনো বড় কবির সংগে সেই সাধারণ ভাবুকের পার্থক্য কোথায় ? পার্থক্য এইখানে যে, বড় কবির সুব্যাপক এবং শক্তিশালী অনুষংগ-সৃজনীক্ষমতা বিচিত্র বিষয়সমূহকে সূত্রগ্রথিত করতে পারে—সুসংগত ইমেজ-রচনার মূলীভূত উৎসই এখানে। তাই রশ্মির রক্তিমতার পিছনে চিতাগ্নির রক্তিমাভা অনুসন্ধান নিরর্থক নয়।

'দিগন্তে মেঘের জালে বিজড়িত দিনান্তের মোহ'—আসলে বার্ধক্য-ব্যাকুল কবিরই পৃথিবী-প্রীতি ও প্রেমের ব্যঞ্জনা বহন করছে। এই চিত্রকল্পটি এবং 'শরতে দিগন্ততলে ছলছলে তোমার যে অশ্রুর আভাস' কবির 'পূরবী'-যুগের অবসান-বোধের দ্বারা চিহ্নিত। শূন্যতা-বোধের অপ্রতিরোধ্য অনুষংগরূপে শরতের ব্যবহার ও নীল শব্দের প্রয়োগও লক্ষ্য করার মত।

অনুপ্রাণিত [illegible]: মূল কথাই এই। স্মৃতির সংগে আবেগের সহযোগিতা। কবিমানস যখন উদ্দেশ্যের বশবর্তী হয়ে সমস্ত মানসিক

ক্ষমতাকে এক অপরূপ শৃঙ্খলায় বেঁধে ফেলে এবং একই সময়ে মনের অনুষঙ্গ-সৃজনীক্ষমতা সেই শৃঙ্খলাকে ব্যাহত না করে যথাসম্ভব স্বাধীনতা উপভোগ করে—তখনই এবং কেবলমাত্র তখনই মহৎ শিল্প-রচনার প্রথম সোপান পার হওয়া যায়। রবীন্দ্রকাব্যের স্বরূপ-বিচার এই তাৎপর্যের আলোকেই করণীয়।

এই পুনরার্জিত নিছক বিশ্বপ্রীতি, এই অবসান-বোধজনিত পৃথিবীপ্রেম 'পূরবী'-পরবর্তী সমগ্র কাব্যসৃষ্টির নিয়ামক। পৃথিবীর তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপার-সমূহকে অথবা আপাতদৃষ্টিতে অকাব্যিক বিষয়সমূহকে কাব্যভাত করার জন্য কবিতার বহিরঙ্গের পরিবর্তনের যে প্রেরণা কবি পরে অনুভব করেছিলেন তার মূলসূত্রও 'পূরবী'-তেই সন্ধানযোগ্য। এমন কি জগৎ-জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার ঝোঁকও এই 'পূরবী'-পর্যায় থেকেই ত্বরান্বিত। পরবর্তীকালে 'প্রশ্ন' প্রভৃতি কবিতার পটভূমিকাও এখানেই—'চিঠি' কবিতাতেই তার আভাস মেলে। তীব্র মানব-সচেতনতার স্বাক্ষরে রবীন্দ্র-কাব্যের শেষ পর্যায় চিহ্নিত। স্বীয় ব্যক্তিজীবনের বেদনাকে কাব্যস্থ করে 'পূরবী' থেকে সে কালের শুরু হল।

'পূরবী'র প্রধান সুর বেদনার। এমন কি 'পঁচিশে বৈশাখে'-র জন্ম দিবসেও প্রভাত-বর্ণনায় অরণ্যের ম্লান ছায়ার বিস্তার, বিষন্ন ভৈরবীর আলাপ। অবশ্যই একে অতিক্রম করে প্রাণের কেন্দ্রে প্রকৃতির হাত ধরে ফিরে আসতে চাওয়াকে তিনি বনবাণীর 'নীলমণি লতা' কবিতায় ধারণ করেছেন। 'নীলমণি লতা' রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির একটি। এই কবিতায় কল্পনা, সুশৃংখলতার সঙ্গে স্বাচ্ছন্দ্যকে সার্থকভাবে মিলিয়ে নিতে পেরেছে বলেই এখানে রঙের অনুষঙ্গে মানবিক সম্পর্কের স্মৃতি-জাগরণ এত সংহতভাবে প্রকাশিত হতে পেরেছে। চাঁপার সোনার বর্ণে কার কণ্ঠস্বর, করবীর রক্তিমতায় কার কংকণ-ঝংকার—এবং শেষপর্যন্ত নীলমণি লতা কী প্রাণময় বিস্ময়ের বাণীবহ। চরম নৈঃশব্দ্যকে ভেঙে নীলমণি মঞ্জরী যেন বিশ্বের আনন্দোক্তি। এর লাবণ্যে স্নাত ক্লান্ত নিঃসঙ্গ কবি-আত্মা যেন আর একবার পুনরুজ্জীবন-প্রয়াসী। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও আসন্ন মৃত্যুর কম্পমান ছায়া তখন রবীন্দ্রনাথকে নানাভাবে স্পর্শ করেছে। অসামান্য জীবনপ্রীতির উপর অনিবার্য মৃত্যুর যবনিকা নেমে আসতে চাইছে, আর অন্যদিকে স্বদেশ ও বিশ্বের পরিস্থিতিতে ক্ষমতামত্ত প্রবলের অত্যাচার ও অবিচারের কৃষ্ণবর্ণ ছায়া ঘন হয়ে উঠেছে।

সাত

রবীন্দ্রনাথের স্থায়ী চিন্তাগুলির মধ্যে কতকগুলি মৌল ধারণা সদাসর্বদা সক্রিয়। মৃত্যু চিন্তা তার মধ্যে অন্যতম। "মানুষের সব থেকে বড় ভয় মৃত্যু

ভয়।" এই ভয় মৃত্যু ভয় বটে—তা ছাড়াও আরো কিছু। অমেয় জীবনপ্রেমই কবিকে জীবনের সঙ্গে বিচ্ছেদের চিন্তায় মাঝে মাঝে আকুল করে তুলেছে। পৃথিবীকে এত ভালবাসা সত্ত্বেও এবং সে ভালবাসার বিন্দুমাত্র ন্যূনতা না ঘটা সত্ত্বেও বিদায় নিতে হয়, এটা কবির কাছে বিশেষ বেদনার ছিল। 'মধুর তোমার শেষ যে না পাই' এটা কবির আনন্দের ঘোষণা, কিন্তু 'প্রহর হল শেষ' এই মৃত্যুচেতনাও কবিকে একই সঙ্গে স্পর্শ না করে পারে নি। এই প্রহর শেষ হওয়ার বার্তা 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থের কাল থেকে উচ্চ ও তীব্র হতে থাকে। 'পরিশেষ', 'আকাশপ্রদীপ', 'সেঁজুতি', 'প্রান্তিক' প্রভৃতি নামকরণের মধ্যে এই প্রহর শেষ হওয়ার সুরই ধ্বনিত হচ্ছে। 'পরিশেষ' এই পর্যায়েরই প্রথম কাব্যগ্রন্থ।

অবশ্য 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থে এই মৃত্যুবোধের একটা অন্যতর প্রকাশ ঘটেছে। 'পরিশেষ' কাব্যে কবির স্বীয় মৃত্যুচিন্তা তো আছেই এবং তার সঙ্গে অন্য কিছুও আছে। এই মৃত্যু চিন্তা প্রত্যক্ষ কবিমানসের নেপথ্য থেকে এই কাব্যগ্রন্থের বহু শব্দচিত্রের, উপমার ও রূপকের জনক হয়েছে। কিন্তু 'পরিশেষের' শেষমূল্য সেখানে নয়। বরং বলা চলে যে স্বীয় ব্যক্তিজীবনের একটা সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন কবি তদানীন্তন বিশ্ব ইতিহাসে। তারই মূল্যে 'পরিশেষ' মূল্যবান।

রবীন্দ্রকাব্যের নিষ্ঠাবান পাঠকেরা জানেন যে, কবির কাব্যের বিশেষ বিশেষ পর্যায়ে বিশেষ বিশেষ রঙের প্রতি অনুরক্তি পরিলক্ষিত হয়। যেমন বলা চলে 'সোনারতরী'-'চিত্রা' যুগে লাল-সোনালী রঙের প্রাধান্য ঘটেছে, 'পূরবী'তে সাদা ও নীল রঙের। বলা বাহুল্য এ ঘটনা মোটেই বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং নানাদিক দিয়ে তাৎপর্যময়। বিবাহের ও বসন্তের রঙ লাল। কবির অপ্রকাশের কাল শেষ হবার পর যখন পার্থিব মানবিক সৌন্দর্যবোধের সুপ্রভাত হল, তখন বসন্তব্যঞ্জক লাল রঙই কবিচিত্তকে যে সর্বাধিক অধিকার করবে তাতে আর আশ্চর্য কী? বসন্তের রঙ আমাদের দেশে সবুজ না হয়ে লালই বরং বেশি। অশোক, পলাশ, কিংশুক, মাধবী, কৃষ্ণচূড়া সমস্তেই লালরঙের কেতন উড়েছে। সুতরাং আশ্চর্যের কিছুই নয় যে, এই বসন্তের লাল রঙের সঙ্গে আশার লালিমা মিশেছে বিবাহের রক্তাংশুককে জড়িয়ে। কবির সৌন্দর্য চেতনার রক্তিম প্রত্যুষেরই সঙ্গে ঐ স্মৃতিগুলো ঘনিষ্ঠ।

আবার 'পূরবীর' কাল বিষণ্ণ বার্ধক্যের কাল; প্রচুর বর্ষণ তখন কবি-জীবনের অতীতের সামগ্রী হয়ে দাঁড়িয়েছে। তখন অবসন্ন শরতের শূন্যতাকে বহন করে এনেছে ব্যক্তি জীবনের শোক, গ্লানি এবং আসন্ন মৃত্যুর পট-

ভূমিকায় অচরিতার্থতাবোধ। এই অচরিতার্থতাবোধ, অতীত তত্ত্বপ্রাণতার প্রতিক্রিয়ার ফল। পক্ষসংবরণ-প্রয়াসী কবির ক্লান্তিবোধই এ যুগের শান্তি-দ্যোতক সাদা রঙ ও শূন্যতাদ্যোতক নীল রঙে দেখেছে ছুটির প্রতিরূপ।

দেখা গেল 'অগীত', 'অসম্পূর্ণ', 'অসমাপ্ত', 'অসিদ্ধ', এই ধরনের নঙর্থক 'অ' দিয়ে ব্যবহার করা শব্দের সংখ্যা 'পূরবী'-তে বেশি। আরো লক্ষ্য করা যায় 'পূরবী' কাব্যের প্রথম ঘোষণা 'এই ভালো এই ভালো'। কী ভালো? ভালো এই সহজ মানবিক রস। কার থেকে ভালো? বিগত তত্ত্ব জিজ্ঞাসার জটিল পথের থেকে ভালো—অরূপাধিপত্যের থেকে ভালো।

ঠিক এইভাবে যদি 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থকে বিচার করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে 'পরিশেষ'-এর স্থায়ী রঙ হল কালো। রাত্রি এবং অপরিহার্যভাবে কালো-রাত্রি হল 'পরিশেষ'-এর বহু ব্যবহৃত শব্দ। রাত্রির ভাবানুষঙ্গে আহৃত শব্দরাজি, কৃষ্ণবর্ণ এবং অন্ধকার-বাচক শব্দচিত্রের যেন যথাতথাই সাক্ষাৎ মেলে 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থে। যেহেতু 'পরিশেষ' আমাদের সবিশেষ আলোচ্য সেইহেতু 'পরিশেষ'-এ রাত্রি ও রাত্রিবাচক শব্দের একটি সম্ভাব্য তালিকা নিম্নে দেওয়া হল। অবচেতন লোক থেকে প্রেরণাসঞ্জাত যে ইমেজ ও রূপকের সৃজন হয়েছে, তাদের একটি পৃথক তালিকাও পাশে দেওয়া হল ঃ—

॥ কৃষ্ণবর্ণ সূচক প্রসঙ্গ ॥

কালো গগন/নিশীথিনীর মৌন যবনিকা/নিবিড়রাত/ধূসর প্রহর / নিশীথের নৈঃশব্দ্যের পরে-দিশাহারা নিশা/রাত্রি দীপালোক-হারা/অন্ধকার পথ / আলোক যেথা নিবিয়া আসে শঙ্কাতুর প্রাণে/ম সী কৃ ষ্ণ বি ঘ্ন পু ঞ্জ/ দুর্যোগ/অ মা ব স্যা র কারা/ কপট রাত্রি ছায়ে/তিমির সিন্ধু/ গোধূলি অন্ধকারে/যবনিকা/ অবহেলার রাত/ব্যর্থ রাত/রজনী ঝঞ্ঝাহত/যবনিকা অন্তরালে/ অন্তিম তিমিরে/রাত্রির নিকষকৃষ্ণ শি লা বে দী মূ ল / নির্জন অন্ধকারে/তিমির রন্ধ্রে/অবসাদ/ আঁধার।

॥ ভদনুষঙ্গ-সূচক প্রসঙ্গ ॥

অনিদ্রা/বাসর ঘরে নিবালে দীপ/ব্যর্থ আত্মবিড়ম্বনা নিদ্রায় আবিল/পঙ্গুসৃষ্টি/অন্ধমূক দুঃখ/ পুঞ্জীভূত অনেক বোঝা/কতবার পরাভব/ পথরোধী পাষাণ-সঞ্চয়/বাদুড়ের মত কালো বর্ণ/আবর্জনার অচল পুঞ্জ/সংশয় মোহ/ভাষা-হীন দিন/বিষাইছে বায়ু/দুঃস্বপ্নের তলে/ কুৎসিত ছলনা/ নিঃস্বজনের দুঃস্বপনের/রুদ্ধ পাষাণ ভিত্তি/প্রতারণার ছুরি/আপন হানা অন্ধ মানুষেরে/দুর্ভাবনার প্রচণ্ড পীড়নে/ জড়তার পাষাণপ্রাচীর/অচল শিলার স্তূপ/ জনহীন পথ সংশয় মোহ রহে তর্জনী তুলে / বোবা মাটি/পোকা ধরা পাতা/কদর্যের কদাঘাত /কীটের দংশন/অনির্দিষ্ট শংকাগুলি/নিদ্রাহীন পেঁচা / কালমেঘ লতা / নৈরাশ্যের অলীক অত্যুক্তি/বিচ্ছুটির ঝাড়/দুষ্ট গ্রহ সেজে ভয় কালো চিহ্নে মুখভঙ্গি করে/আতঙ্কের জঙ্গল/ ভীরু কল্পনার যত জটিল কুটিল চিহ্নগুলো।

সমস্ত উদ্ধৃতিগুলি প্রথম দৃষ্টিতেই আমাদের জানিয়ে দেয় যে, এ-রাত্রি নক্ষত্রখচিত বা জ্যোৎস্নাপুলকিত কাব্যখ্যাত রাত্রি নয়। 'খেয়া'-র অরূপসাধনার দুঃখরাতের রাজার রাত্রিও এ নয়। এ রাত্রির একমাত্র পরিচয় এ মসীকৃষ্ণ। এ যেন কতকটা হতাশাব্যঞ্জক! রূপক, বিশেষণ ও শব্দচিত্রগুলির দিকে তাকালে এ-রাত্রির রূপ আরো স্পষ্ট হয়; 'প্রতারণার ছুরি', 'আতংকের জংগল' প্রভৃতি চিত্রকল্প অথবা 'কীটের দংশন' 'বিছুটির ঝাড়', 'কালো হয়ে যাওয়া ডাল', 'পেঁচা', 'বাদুড়' এ সমস্ত শব্দই ধ্বংসের, মৃত্যুর, হানাহানির ভাবদ্যোতক। এদিক দিয়ে এ রাত্রির রূপ তাৎপর্যময়। বদ্ধমূল-রাত্রির বা অন্ধকারের বোধই কবিমানসের নীচের তলা থেকে এদের সৃষ্টি করেছে।

এ তাৎপর্যকে আলোকিত করতে গেলে 'পরিশেষ'-এর কবিতাগুলির রচনা-কাল পরীক্ষা করা দরকার। ১৯২৭ থেকে ১৯৩২ সাল 'পরিশেষ'-এর রচনা-কাল। কবির ব্যক্তিজীবন এবং বিশ্বজীবন উভয়ই তখন সংকটকালের সম্মুখীন। একালের জাতীয় তাৎপর্য এবং আন্তর্জাতিক তাৎপর্য যে কোনো ইতিহাস সচেতন ব্যক্তির কাছেই স্পষ্ট। প্রথম অসহযোগ আন্দোলন অকাল সমাধি লাভ করেছে তখন—তীব্র হয়ে উঠেছে মধ্যবিত্ত জীবনের সংকটাবর্ত। পুরাতন বিশ্বাসের সুদিন সমাপ্ত—আর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধের দানবই আরেকবার 'সন্ধিপত্রের মুখোস' পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরই সংগে মিশে রয়েছে ব্যক্তি-জীবনের আসন্ন মৃত্যুর বোধ। এই দুশ্চিন্তার ছায়ায় 'পরিশেষ' ছায়াগ্রস্ত। এই কাব্যগ্রন্থে কালো রঙের যে প্রাধান্য, রাত্রির যে আধিপত্য—শব্দচিত্রে, প্রতীকে সূচিত হয়েছে, তাদের সকলের নেপথ্যে রয়েছে কবিমানসের সমকালীন দুশ্চিন্তা ও সংশয়ের ছায়া। 'পরিশেষ'-এর 'প্রশ্ন' কবিতাটিকে বলা চলে পরিচিতির দিক দিয়ে এ কাব্যগ্রন্থের প্রতিনিধি স্থানীয় কবিতা। 'অমাবস্যার কারা' এই কবিতার মূল চিত্রকল্প। কবিতাটির ইতিহাসপট পূর্বাচার্যগণ অনেকেই বিশ্লেষণ করেছেন। সুতরাং তার পুনরাবৃত্তি না করেও 'অমাবস্যার কারা' চিত্রকল্পকে বিশ্লেষণ করা যাক। অমাবস্যা বিলুপ্তির ও বিনষ্টির নিদর্শন। 'কারা' শব্দ প্রয়োগের পশ্চাতে ঐতিহাসিক প্রেরণা তো আছেই, আরো আছে কারামুক্তির ইংগিত। 'কারা' চেতন মনে ব্যবহৃত হলেই অবচেতনে কারা-মুক্তির প্রেরণা থাকেই। সে কারণে এই কবিতাটি আবৃত্তির সময় শেষ চরণের 'তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ তুমি কি বেসেছ ভাল' এখানে 'তুমি' শব্দের উপরে জোর দিলে কবির ভূমিকা স্পষ্ট হয়। অর্থাৎ তখন এই অর্থ দ্যোতিত হয় যে তুমি ক্ষমা করে থাকলেও আমি ক্ষমা করব না।

এইভাবে 'পরিশেষ'-এর সৃজিত, কল্পিত ও পরস্পর-গ্রথিত সমস্ত শব্দচিত্রের নেপথ্যের অর্ধগোচর-ইতিবৃত্ত আহরণ সম্ভব। 'প্রতারণার ছুরি' এবং 'আতঙ্কের জঙ্গল' এই চিত্রকল্প দুটির কথাই ধরা যাক। 'প্রতারণার ছুরি' এই শব্দচিত্রটি যে কবিতায় এসেছে সেটির নাম 'চিরন্তন'। জীবনের চিরন্তন মূল্যমানের পাশে মানুষের হানাহানির রূপকে উপজীব্য করে এ কবিতা রচিত। এ কবিতাটি অবশ্য শেষ হচ্ছে রবীন্দ্র স্বভাবসিদ্ধ চিরন্তন মূল্যবোধের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করে। কিন্তু সমকালীন ইতিহাস কবিমানসে যে সংশয়-বেদনাচ্ছন্ন অন্ধকারের আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে—যে অন্ধকারে ঘাতকের ছুরি ছাড়া আর কিছু কল্পিত হয় না—তার মূল খুঁজে পাই এই কবিতার একটি চরণে—'ভেবে না পাই কে বাঁচাবে আপন-হানা অন্ধ মানুষেরে'। এই ভেবে না পাওয়ার বেদনায় কবিহৃদয় বিভ্রান্ত ও বিধুর। তাই 'প্রতারণার ছুরি'-কে এড়িয়ে স্নিগ্ধছায়ার কোকিলকে বিশ্বাস করাটা অভ্যাসিকতা-গ্রস্ত না হয়ে পারে নি। এখানে শান্তির যে চরিত্র কবি ফুটিয়েছেন ('যে শান্তিটি সবার অবসানে') তাও মৃত্যুর শীতলতাব্যঞ্জক।

আবার 'আতঙ্ক' কবিতায় 'আতঙ্কের জঙ্গল' চিত্রকল্পটি সৃজিত হয়েছে আসন্ন বিনষ্টির পটভূমিকায়। কবিমানসের নেপথ্যে যে অন্ধকারের বোধ, বিলুপ্তির বোধ এ-যুগে সক্রিয় এবং প্রকৃতপক্ষে যার অপরিহার্য আকর্ষণে সমস্ত উদ্ধৃত চিত্রকল্পগুলি ভেসে এসেছে 'আতঙ্কের জঙ্গল-ও তারই সৃষ্টি। অতীতকে রক্ষার চেষ্টা কাপুরুষের চেষ্টা, এই কথা কবিতাটির প্রধান বক্তব্য। 'অনির্দিষ্ট শঙ্কা' এবং 'নৈরাশ্যের অলীক অত্যুক্তি যেন পেঁচার চিৎকার' এই কবিতার অন্যতম সার্থক উক্তি ; কবিতাটিতে কোথাও আশার সুর নেই—যা রবীন্দ্রস্বভাব বিরুদ্ধ। এই কবিতার বিষয়-বস্তু একটি ধ্বসে যাওয়া পুরানো বাড়ি। কিন্তু এই পুরানো বাড়ি আসলে তিরিশের সংকটাপন্নকালেরই ছায়া। রূপান্তরের-দিগন্ত তখনো অদৃশ্য, অথচ পুরাতন বনিয়াদ সর্বত্র নিদারুণ আঘাত পাচ্ছে। দোদুল্যমান মন ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভীত এবং অনিশ্চয়তাগ্রস্ত। এই অনিশ্চয়তার অন্ধকারে ব্যক্তিজীবনের মৃত্যুভয়ের মাটিতে 'আতঙ্কের জঙ্গল' বেড়ে উঠেছে। সমকালের ক্ষয়ের বোধ ব্যক্তিজীবনের প্রশ্নের সঙ্গে এমন করে মিলেছে বলেই 'পরিশেষ'-এর মৃত্যুচেতনা কবির অন্যত্র অনুভূত মৃত্যুচেতনা থেকে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট।

এই ভাবে 'জরতী' ও 'পোকা ধরা পাতা' এই শব্দ ও বাক্যাংশের যদি বিশ্লেষণ করা যায় তবে দেখি যে দুটিতেই অন্ধকারের পরোক্ষ ভূমিকা স্পষ্ট। জরতীর শুভ্রকেশ ও শুভ্রকান্তি 'জরতী' কবিতার মূল সুর। কিন্তু শুভ্র-

কেশের শুভ্রত্ব অন্ধকারের বোধকে মোটেই টলাতে পারে নি। জরতীর বার্ধক্যের পশ্চাতে যে মৃত্যুচিন্তা অপরিহার্যরূপে কাজ করছে তাই অবচেতন থেকে সৃষ্টি করেছে 'রাত্রির নিকষকৃষ্ণ বেদী' এই শব্দচিত্রের। ঠিক সেই ভাবেই বলা চলে যে 'পোকাধরা পাতা' এই বাক্যাংশের পোকাও অন্ধকার-বাচক। কবিতাটির নাম 'আঘাত'। প্রত্যক্ষভাবে কবিতাটিতে কোথাও আঘাতের কথা বলা নেই। আলোর কথাই সচেতনভাবে বলা আছে। কিন্তু ইতিহাস ও ব্যক্তিজীবন দুয়ে মিলে যে অন্ধকারকে কবিচিত্তে দৃঢ়বদ্ধ করেছে তার ভূমিকাও সচল। তাই অন্ধকার>গহ্বর>গর্ত>কীট বা পোকা এই বাক্যাংশের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, সংশয় ও ভবিষ্যৎ ভীতির যে ভূমিকার কথা আলোচনা করা হচ্ছে, কবির কাব্যেতিহাসে তার চূড়ান্ত মূল্য কতটুকু। বলা যেতে পারে যে জীবনের চিরকালীন মর্যাদার দিকে আদর্শবাদীর দৃষ্টিতে প্রাধান্য আরোপ কবি প্রায়ই করেছেন। কিন্তু 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থে তার বিশিষ্টতাই লক্ষ্য করার মতো। 'আঘাত' কবিতায় বর্ণিত 'কীটদষ্ট' সোঁদাল গাছ। এই গাছ আকাশের দিকে তবু তার অঞ্জলি তুলে ধরেছে : বলা হচ্ছে—

কদর্যের কদাঘাতে
দিয়ে যায় কালিমার মসীরেখা
সে-সকলি অধঃসাৎ করে
শান্ত প্রসন্নতা
ধরণীরে ধন্য করে পূর্ণের প্রকাশে।

বলা বাহুল্য উদ্ধৃত অংশে 'পরিশেষ'-এর কালো রঙের আধিপত্য থাকলেও এর ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথের স্বীয় দর্শনের আলোকেই সম্ভব। কিন্তু কবিতাটির শেষ চরণ লক্ষ করলে 'পরিশেষ'-এর বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাই।

পেয়েছে সে ধরণীর প্রাণরস
সুগভীর সুবিপুল আয়ু
পেয়েছে সে আকাশের নিত্য আশীর্বাদ।
পেয়েছে সে কীটের দংশন।

দেখা যাচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে 'পেয়েছে সে আকাশের নিত্য আশীর্বাদ' এরই সংগে সংগে কবিতা শেষ হয়েছে। 'পেয়েছে সে কীটের দংশন' আপাতদৃষ্টিতে বাড়তি কথা। এই অধ্যায়ে আছে ব্যক্তিগত ক্ষয়ক্ষতি, আছে নবাগতদের সমালোচনা ও স্বীয় অচরিতার্থতাবোধের ছায়া। 'সোঁদালের ডাল' কবি-জীবনেরই প্রতীক। সুতরাং 'কীটের দংশন' 'পরিশেষ'-এর অন্ধকার-সচেতনতার ফল। এই বাস্তব প্রভাবিত জীবনচেতনার জন্যই 'পরিশেষ' রবীন্দ্রকাব্যপর্যায়ে

একটা স্বতন্ত্র আসনের দাবি করে। ব্যক্তিজীবনের ক্ষয়বোধের সংগে তিরিশের ধ্বংস-চেতনার একীকরণের ফলে কবির সমস্ত সচেষ্ট প্রসন্নতা ঘুরে ঘুরে শেষ পর্যন্ত কীটের দংশন সম্বন্ধে দৃঢ় নিশ্চয় হচ্ছে।

আট

তাহলে কি অন্ধকারই পরিশেষ-এ শেষ কথা? নিশ্চয় না। অন্ধকারের এবং কালো রঙের আধিপত্য আছে বটে, কিন্তু অন্ধকারের সংগেই আলোকের জন্য সংগ্রামেরও একটা ভূমিকা কবির অর্ধগোচর মনে সক্রিয় ছিল। 'মালা জপের' প্রতীকের কথা এ প্রসংগে বিশেষ উল্লেখ্য। 'মালা' বা 'মালা জপের' কথা 'পরিশেষ'-এ যেখানেই উচ্চারিত হয়েছে সেখানেই কখনো একই সংগে, কখনো বা কয়েক চরণ আগুপিছু করে অন্ধকার ও আলোকের প্রসংগও আছে। মালা জপের রুদ্রাক্ষ গণনার সংগে রাত্রির প্রহর গণনা একাত্ম হয়েছে—আর প্রহর গণনার সংগেই রাত্রিকে পেরিয়ে আলোকে পৌঁছনোর প্রসংগ অনিবার্য হয়েছে।

১	পৃ ২২,	যবনি-অন্তরালে	অঙ্গুলি	মালাজপ	আলোক
২.	পৃ ২৩,	হয়ে আসে সমাপন	আবর্তন	রুদ্রাক্ষ	রৌদ্র
৩.	পৃ-২৬,	কৃষ্ণরাত	অঙ্গুলি	ধ্যানমন্ত্র	অবারিত
৪.	পৃ-৪৩,	দীপালোকহারা	×	মালা	আলোকিত
৫.	পৃ-১০৫,	নিবরে দীপের শিখা	আ-না আঁকা	গাঁথা	অরুণ-আলোক
৬.	পৃ ১২৭	ব্যর্থরাত	×	মালা	ঝলকিছে
৭.	পৃ ১৫৪	সন্ধ্যাবেলা	অঙ্গুলি	মল্লিকার মালা	আলোক
৮	পৃ-১৬৭	রাতি	×	মালা	পঙ্কজ[২]

কবিমানস যে সংশয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করতে চায় না, বরং কবির অবচেতন অর্ধগোচর মানসেও যে অন্ধকারের সংগে, রাত্রির মোহের ও সংশয়ের সংগে সংগ্রামের ভাব বিদ্যমান ছিল—অর্থাৎ অনিশ্চয় অচলাবস্থায় পরিকল্পিত অন্ধকারের হাত থেকে কবির মানবিক আন্তরিকতা যে বিশ্বাসের দিবালোকের জন্য বিশেষ সচেষ্ট ছিল, উপরের বিশ্লেষণটি সেই তাৎপর্যের দিকেই অংগুলি সংকেত করেছে।

'পরিশেষ'-এর আর তিনটি প্রতীক 'দেয়ালী' বা 'দীপারতি', 'খেলাঘর' এবং

২. এ আলোচনায় পরিশেষ থেকে সকল উদ্ধৃতি নিয়েছি বিশ্বভারতী প্রকাশিত 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩৫৪ আশ্বিন) থেকে।

'পাহাড়'। এই তিনটি প্রতীকও কবির তৎকালিক বিশিষ্ট চিন্তার প্রতিনিধি-স্থানীয়। যে অন্ধকার অনিশ্চয়তাকে 'পরিশেষ' এর মৌলবোধ বলা হচ্ছে তার সঙ্গে এই প্রতীকগুলির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। অন্ধকারের ভাবানুষঙ্গে দীপালীর উদ্ভব সহজ কথা। কিন্তু খেলাঘরের সঙ্গেও এর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠভাবে বিদ্যমান। 'খেলাঘর' অস্থায়ীত্ব দ্যোতক। ধ্বংসের নিষ্ঠুর হাতে যা ভেঙে যাচ্ছে—প্রতিকূল শক্তির কাছে যা ভঙ্গুর তাই খেলাঘর। 'পরিশেষ'-এর অন্ধকার পর্যায়ে বা রুক্ষ যুগে কবির যে ব্যক্তিক মৃত্যুবোধ ও বিশ্বগত ধ্বংসবোধ সক্রিয়, খেলাঘরের প্রতীকের সঙ্গে তার আত্মীয়তা রয়েছে। আর 'পাহাড়'-ও তাই। পুঞ্জীভূত অচলতা এবং স্থিতাবস্থা রাত্রি এবং বাধার প্রতীক। পাহাড়ের চূড়া আমাদের সাধনার লক্ষ্য পথ। তাই শিখরে শিখরে কেতন ওড়ানোর কথা পরিশেষ-এ ঘোষিত হয়েছে। এই কারণেই dualism of life সম্বন্ধে নাট্যকার কবিদের যে অভিজ্ঞতার প্রসাদ আমরা পেয়েছি—যেমন শেক্সপীয়র-এর Life and Death, Love and Hate প্রভৃতি বিরোধী ভাবাত্মক শব্দের প্রভূত প্রয়োগে—'পরিশেষ'-এ পাই তারই মতো বহু নিদর্শন। 'জোয়ার-ভাঁটা', 'আলোক-অন্ধকার', 'জীবনমরণ', 'সংশয়-বিশ্বাস' এবং শেষরাত্রির ছবি—সমস্তই যুধ্যমান বাস্তব শক্তিগুলির দ্বন্দ্বমূর্তি হিসাবেই পরিশেষ-এ এত ঘন ঘন ব্যবহৃত হয়েছে।

নয়

তাহলে দেখা যায় যে 'বক্সা দুর্গস্থ বন্দীদের প্রতি' বা 'প্রশ্ন' জাতীয় প্রত্যক্ষ ঘটনা দ্বারা অনুপ্রাণিত কবিতাগুলির মধ্যেই যে আমরা তৎকালীন বৈশিষ্ট্যের সন্ধান করবো তা ঠিক নয়। ঐ কবিতাগুলির আলোচনার প্রয়োজন অস্বীকার না করেও একথা বলা চলে যে, কবির ব্যবহৃত ইমেজ, এপিথেট—সংক্ষেপে কাব্যের বহিরঙ্গ বিচারের মাধ্যমেও কবির মানস-ইতিহাস-বিরচন সম্ভবপর। যেহেতু তা যুক্তি ও তথ্যের উপর নির্ভরশীল এবং তা কবিজীবনীর অনুমোদন প্রাপ্ত, তাই এই বিচারের মধ্যেই কবির অন্যতর পরিচয় অপেক্ষা করে আছে। উপরে জপমালা ও অন্ধকার-আলোকের যে সম্পর্কের কথা বিশ্লেষণ করা হল এরকমভাবে কবির সমুদয় প্রতীকের বিশ্লেষণ সম্ভব। এবং তা সম্ভব হলে আমরা কবির কাব্যের নূতন আলোকের সন্ধান তো পাবই, উপরন্তু কবির জীবনের উপরেও নব আলোকসম্পাত করতে পারব। সেই পথেই কবির কবি-জীবনী রচিত হবে—কবির আবেদনও সার্থক হবে: কবিরে খুঁজো না কবির

জীবনচরিতে। শব্দচিত্রে, রূপকে, উপমায়—কাব্যের শরীরিণী লীলার সর্বত্রই কবির জীবনই ছায়া ফেলেছে। সে পথেই আমরা কবিজীবনীর সন্ধান করবো। সমুদয় শিল্পসৃষ্টির ন্যায় কবি-কল্পনাও যতক্ষণ না পূর্ণতার ভাব বহনে সক্ষম ততক্ষণ তার মুক্তি নেই। শ্রেষ্ঠ কবিকর্মের ইতিবৃত্তে এই সাক্ষ্য বিদ্যমান। সেই কারণে কল্পনার অখণ্ড স্বরূপকেই আমরা খুঁজি সার্থক শিল্পে' এবং যখন চিত্রকল্পকে অনুধাবন করতে চাই, তখনও সেই অখণ্ড স্বরূপেরই সন্ধান চলে কাব্যরসের তাগিদে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে 'সোনার তরী' থেকে 'ক্ষণিকা' কবিকল্পনার প্রস্তুতি, 'বলাকা' থেকে 'পরিশেষ'-এ সেই প্রস্তুতির দিব্য পরিণাম। 'ক্ষণিকা'-র পূর্ব পর্যন্ত এবং 'ক্ষণিকা' র পরেও রবীন্দ্রনাথ রূপকে কথা বলতে ভালোবাসতেন। 'ক্ষণিকা'-য় তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি এসেছে কবি-কল্পনার মুক্তির ফলে। এই মুক্তি রবীন্দ্রনাথের কাছে বৃহত্তর সার্থকতার ফসল বয়ে এনেছিল 'বলাকা'-'পূরবী'-র কালে, তা আমরা পূর্বে বলেছি। কিন্তু 'সোনার তরী' এবং 'খেয়া'-য় রবীন্দ্রনাথের রূপক কবিতাগুলির নিটোল পরি-পূর্ণতা সদাসর্বদা স্মরণীয়। এই রূপকের দেহাধারে প্রত্যক্ষ জীবন যখন রক্ত-মাংস যোগায় নি, তখনও কল্পনার স্বচ্ছন্দ আচরণে কেমন রসানন্দের উৎস সৃজিত হয়েছে তার প্রমাণ হিসাবে সদাই 'শুভক্ষণ' কবিতাটি স্মরণীয়। 'বলাকা'-'পরিশেষ' পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের কল্পনা জীবনেব সমগ্রানুভূতিকে রূপান্বিত করতে চেয়েছে। কল্পনার ন্যায়কে অনুসরণ ক'রে স্মৃতি ও আবেগের সহযোগিতা এইখানে কবির লক্ষ্য। কবির ভাবনায় এখানে মননের দীপালোক।

সম্ভবত সে কারণেই 'বলাকা'-'পূরবী'-তে রবীন্দ্রনাথের প্রবণতা প্রধানত ছিল বড় কবিতার দিকে। কবিজীবনের প্রথম অধ্যায়ে প্রায় বড় কবিতাই অসংহতির দুর্ভাগ্য বহন করেছে। 'মানসসুন্দরী', 'যেতে নাহি দিব' প্রভৃতি কবিতাগুলি তার নিদর্শন। অপেক্ষাকৃত ছোট কবিতায় রূপকের আধারেই কবিকল্পনা সংহত হয়েছে বেশি। কিন্তু 'বলাকা'-'পূরবী'-তে দীর্ঘ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সুসংহত। একমাত্র 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থের 'প্রশ্ন' কবিতা ব্যতীত ঘনবদ্ধ ছোট কবিতা এ গ্রন্থে দুর্লভ। ভাবনার বিস্তৃত গভীরতার টানে কল্পনার শৃঙ্খলা ক্লাসিক দৃঢ়তাকে অঙ্গীভূত করেছে। 'তপোভঙ্গ', 'সাবিত্রী', 'আহ্বান' কবিতার সৌন্দর্যে তারই সাক্ষ্য। এই তিনটি কবিতায় চিত্রকল্পের পশ্চাদ্‌বর্তী কবি-আত্মার উজ্জ্বল উপস্থিতি চিত্রকল্পগুলির মধ্যে এনেছে অখণ্ডের ব্যঞ্জনা; 'কল্পনা' কাব্য-গ্রন্থে যে ধ্বনি-সম্পাদনের জন্য রবীন্দ্রনাথকে মনে হয়েছে অধমর্ণ, 'বলাকা'-'পূরবী'-তে তা হয়ে উঠল রবীন্দ্রনাথের কবিকণ্ঠ। কল্পনাকে নিয়ন্ত্রিত করার যে কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে মহৎ কবির মর্যাদা লাভ সম্ভব

নয়, সে অগ্নিপরীক্ষায় কবি এখানে উত্তীর্ণ। তার প্রমাণ হিসাবে এ যুগের চিত্রকল্পের একটি প্রধান ধর্মের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা চলে। এ যুগে যেমন ছোট কবিতার প্রাধান্য নেই তেমনি একেবারে প্রত্যক্ষ রূপক কবিতারও আধিক্য নেই। কিন্তু রূপক কবিতার শিক্ষা এক হিসাবে এ যুগে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী হয়েছে। কাব্যের দেহাধারকে কাব্যের বিষয়-পরিস্থিতির জলবায়ুতে পুষ্ট করে তোলায় কবির দক্ষতা চিরস্মরণীয়। সেই দক্ষতায় এযুগের সুদীর্ঘ কবিতা-গুলির বিস্তৃত চিত্রকল্পরাজি সুকল্পিত ও সুপ্রকাশিত হতে পেরেছে। প্রথম যুগের বড় কবিতাগুলির অসংহতির কারণ—চিত্রকল্পের দৈন্য। দুইভাবে এই দৈন্য কাব্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। চিত্রকল্পের অভাব, নতুবা, অসংখ্য ছোট ছোট চিত্রকল্প-সমাবেশের প্রয়াস। বড় কবিতার পক্ষে এই দুইই ক্ষতিকর। 'বলাকা'-'পূরবী'-র কালে দীর্ঘ কবিতায় কবির রচিত বিস্তৃত ছবিগুলি কাব্যের আত্মার প্রকৃত ধারক। 'চঞ্চলা' কবিতায় অভিসারিকার চিত্রকল্প, 'তপোভঙ্গ' কবিতায় কালের রাখালের কল্পনা, 'সাবিত্রী' কবিতার শেষ দুই স্তবকে বিধৃত একটি চিত্র, 'আহ্বান' কবিতায় তিনটি স্তবক বিস্তৃত নিশাবসানের চিত্রকল্প তার প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা চলে। জাতির আবহমান কালের স্মৃতি-ধৃত অভিজ্ঞতাগুলিকে কবি বিষয়নিষ্ঠের মতো অনুভব করেছেন এবং স্বীয় কাব্য-ধর্মে দীক্ষিত করেছেন এই সমস্ত ক্ষেত্রে। ফলে পূর্ণাঙ্গ কল্পনার অখণ্ড স্বরূপের সংস্পর্শে এসে আমাদের রসতৃপ্তিরও পূর্ণতা ঘটে। পূর্ণের জন্য যে পিপাসা মানবমনের স্বভাবসিদ্ধ তা চরিতার্থ হয়।

কল্পনাশক্তির সাধর্ম্যে রবীন্দ্রনাথ যে কোনো মহৎ কবির আত্মীয়। নিয়ত অনুধ্যান এবং সতত প্রয়াসে তিনি একদিকে যেমন কল্পনাকে নিয়ে গিয়েছিলেন শৈল্পিক পরিণতিতে, তেমনি তাঁর অনন্য একমুখিতায় কল্পনার দিব্য আলোকে কাব্যের বিষয়ের আত্মাও কখনও হারিয়ে ফেলেনি জীবনের দেহাধার। তিনি যখন ঐতিহ্যকে ব্যবহার করেছেন, তখনও তার রূপান্তরণে কল্পনার সেই শক্তিই সক্রিয় ছিল। তিনি ঐতিহ্যকে ব্যবহারের ভিতর দিয়ে কবি-অহমিকার তৃপ্তি খোঁজেন নি। তিনি তার অন্তর্নির্যাসকে আত্মস্থ করেছিলেন জীবনব্যাখ্যার নিজস্ব সুবিস্তৃত পটে। কাব্যের উপলক্ষ্য এইভাবেই দীর্ঘ অন্বেষণে তাঁর কাছে কাব্যের বিষয় হয়ে উঠেছিল। এবং কল্পনার এই দৃঢ় শৃংখলাকে তিনি কোথাও থেকে অনুকরণ করেন নি। এ বিষয়ে কেউ তাঁর প্রভাবক নন। নিজ ব্যক্তি-জীবনের দ্বন্দ্ব-যন্ত্রণাময় পথের অসাধারণ এই পথিক তা চলতে চলতেই আয়ত্ত করছেন।

তাঁর আখ্যানজাতীয় কবিতাগুলিতেও—কথা-কাহিনীর পর্যায়ে এবং গদ্য-

ছন্দের পর্যায়ে—এই কল্পনার দৃঢ় শৃংখলার উপস্থিতি। 'দেবতার গ্রাসে'র বর্ণিত ঘটনার মধ্যে যে ভয়াবহতা, তাকে প্রস্ফুট করার আকর্ষণেই বারবার সাপের চিত্রকল্প, মহৎকে হেয় করার চিত্রকল্প ব্যবহৃত হয়েছে। 'কর্ণ ও কুন্তী'তে আলোক ও অন্ধকারের, বা অবগুণ্ঠনের, বা জমাট তুষার বিগলিত হবার চিত্রকল্পে কেন্দ্রীয় ভাবের উপযুক্ত প্রতিফলন। এই একই ভাবগৌরবে 'পুনশ্চ'-র 'বাঁশী' কবিতার চিত্রকল্পের মূল্য। 'শিশুতীর্থে'-রও সার্থকতা।

'বলাকা' থেকে 'পূরবী'-'পরিশেষ'-এ কবিকল্পনার পূর্ণ পরিণত অবস্থায় ধীরে ধীরে যে নানা টানাপোড়েন প্রভাব বিস্তার করছিল—কিছু তার ব্যক্তিগত কিছু তার বিশ্বগত—এর প্রমাণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠল পরিশেষ-এর নানা ধরনের কবিতাগুলির মধ্যে। 'প্রশ্ন' যেমন বৃহত্তর জীবনের যন্ত্রণায় বলিষ্ঠ, 'আতঙ্ক' তেমনি ব্যক্তিগত শঙ্কায় পিঙ্গল। এই নানা টানাপোড়েন থেকে কবি পেঁচেছেন 'পুনশ্চ'-র গদ্যছন্দের প্রবর্তনায়। হয়তো প্রচণ্ড দুর্ভাবনার দায় এড়ানোর জন্যই তাঁর এই শিল্পলীলা। কেননা অনুরূপভাবেই একদিন জন্মলাভ করেছিল 'লিপিকা'। কিন্তু আশ্চর্য 'লিপিকা' এবং 'পুনশ্চ' উভয়ক্ষেত্রেই কবির দুর্ভাবনার কোনো স্পর্শ নেই। ঐতিহাসিক কারণে এই শিল্প-নিরীক্ষা যত মূল্যবানই হোক, রবীন্দ্রনাথের চিত্রকল্পচারিতা 'পুনশ্চ'-এ 'শেষসপ্তক'-এ স্তিমিত। প্রথম জীবনে নিজের ভাষার প্রেমে পড়েছিলেন কবি, শেষ জীবনে নিজের ছন্দের। পল্লবতা দুই ক্ষেত্রেই চিত্রলতার ক্ষতি করেছে। বিস্তৃত বিষয়ের স্থান সংকুলানের তাগিদে এর জন্ম হলে কোপাইয়ের গৃহপালিত রূপে তার প্রতীক খুঁজতে হত না। অথচ লক্ষণীয় যে, যেখানেই রবীন্দ্রনাথ এই নতুন পর্যায়ে কল্পনার সাড়া পেয়েছেন সেখানেই গদ্যের ছন্দ অপেক্ষা শব্দের ধ্বনিকেই তিনি সম্বল করেছেন। 'শিশুতীর্থ', 'আফ্রিকা' তার প্রমাণ। সে কারণেই একেবারে শেষে যখন অন্তরের সুরে কথা কইতে হয়েছে—'জন্মদিন', 'আরোগ্য' 'শেষলেখা'-য়—তখন তিনি আবার ফিরে গেছেন তাঁর নিজস্ব জগতে। অবশ্য এ যুগের কাব্য প্রয়াস একেবারেই নিরলঙ্কার। এখানে আছে শুধু শান্ত আত্মসমর্পণের আবেগ; বিশ্বের সমস্ত পরমকে বিশ্বাস করে চরমের জন্য প্রস্তুতি। যে কবিপুরুষ বাংলা সাহিত্যে টেকনিকের রাজা, জীবনকে খুঁজতে খুঁজতে মৃত্যুসিন্ধুর তীরে এসে তিনি সমস্ত অঙ্গাভরণ পরিহার করেছেন। রিক্ততাই তখন হল বাঙ্ময়। রাজা এতদিনে হলেন ঋষি।

বৎসর বৎসর চলে গেল।
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল

পশ্চিম সাগর তীরে
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়
কে তুমি ?
পেল না উত্তর ।

—এর যা কিছু মূল্য তা সেই ব্যক্তির অমেয় জীবনলীলার ভাবানুষঙ্গে অসামান্য ।

আমরা বর্তমান প্রবন্ধে দেখতে চেষ্টা করেছি কেমনভাবে সমগ্র জীবনে অভিজ্ঞতার, মূল্যবোধের প্রেরণায় কল্পনার দ্ব্যর্থহীন ভাষাকে তিনি সন্ধান করেছেন ও পেয়েছেন ; কেমনভাবে এক এক যুগের কবি-কীর্তিতে কেন্দ্রীয় কল্পনার বিশিষ্ট আচরণ কবিকে পর্যায়ান্তরে উন্নীত করেছে । তাই আধুনিক বাংলা কাব্যেরও অক্লান্ত শিল্প-কর্মিষ্ঠ অংশে বিস্তৃত জীবনের গভীরতাকে কল্পনায় সংহত করার উত্তরাধিকার । চিত্রল-মুগ্ধতায় সে সুখী হবে হয়তো, কিন্তু বিস্তৃতির সংহতি ব্যতীত তার মুক্তি নেই । রবীন্দ্রনাথই এই দুরূহ কর্তব্যভার প্রথম বহন করেছেন ।

দীর্ঘ কবিতা ও চিত্রকল্পের সংলগ্নতা

এক

কবির সাধনায় চিত্রকল্পের বিশিষ্ট সাফল্য কখনো উদ্দিষ্ট নয়—সমালোচকও চিত্রকল্পের পৃথক ব্যাখ্যায় কুত্রাপি রস-সিদ্ধির গূঢ় রহস্যকে ব্যাখ্যা করতে পারেন না। চিত্রকল্পরাশি একটি বৃক্ষের ফুলের বা ফলের সঙ্গে তুলনীয়। বৃক্ষ-পরিচিতি অবশ্যই সেই ফুলের বা ফলের উপর নির্ভরশীল। তথাপি বৃক্ষ-লগ্ন ফল বা বৃন্ত-লগ্ন ফুলের মহিমা যেমন সমগ্রের সঙ্গে মিলিয়েই অনুভববেদ্য, সার্থক চিত্রকল্পকেও পূর্ণভাবে লাভ করা যায় কাব্য বিষয়ের সমগ্রের প্রেক্ষাপটে তাকে রেখে। দীর্ঘ কবিতায় যেখানে কবি-কল্পনা তন্ময়তায় ব্যক্ত হবার জন্য প্রয়াসশীল, যেখানে গীতি-কবির সংক্ষিপ্ত গভীর অন্তর্মুখীনতা অপেক্ষা ব্যাপ্তিকে বিস্তারকে গভীর করে তোলার জন্য প্রচেষ্টা, সেখানে কবিকে উপলব্ধির জন্য চিত্রকল্প-স্রোত অনুসরণ ব্যতীত নান্যঃ পন্থা। কল্পনাকে, কাব্যের উপকরণসঞ্জাত আবেগকে, শিল্পরূপে বাঁধতে গিয়ে অভিজ্ঞতা এবং স্মৃতির টানে কবি তাঁর নিজেরই বিস্তৃত জীবনপটের সম্মুখীন হন। চেতন-অবচেতনের দ্বৈতাদ্বৈতে, কখনো গ্রহণে কখনো বর্জনে, দ্বন্দ্বে সমন্বয়ে তাঁর নির্দিষ্ট কবিকর্মে সিদ্ধি আসে। সে যন্ত্রণা কবিকে একা পোহাতে হয়—সেটা তাঁর ব্যক্তিগত। কিন্তু তার দান ছড়িয়ে থাকে বিস্তৃত কাব্যপটে। একটি দীর্ঘ কবিতায় বাইরে থেকে আমরা পাই, গল্প-কাহিনী-চরিত্র অথবা সময়কে। তবে যে কারণে সেটা কবিতা—আবেগের সেই সূক্ষ্ম গভীর কল্পনাকে চিত্রকল্প ব্যতিরেকে কোথাও পাব না।

কিন্তু চিত্রকল্পের একক সার্থকতায় আবেগের সেই সমগ্রতাকে, গভীরতাকে কীভাবে সন্ধান করে থাকি? কখন চিত্রকল্পের একক সার্থকতা বিশিষ্ট-কোনোকিছু না হয়ে হয়ে ওঠে কবিতার মূলরসের, কবিভাবনার শিল্পসিদ্ধ রূপাধার? তাকে উপলব্ধির জন্য দীর্ঘ কবিতার চিত্রকল্পরাশির তালিকা প্রণয়ন অপেক্ষা চিত্রকল্পগুলির পরস্পর সংলগ্নতার মূলটিকেই সন্ধান করতে হয়। তাহলে সমুদ্রমুগ্ধ বালকের লুব্ধতা যেমন কড়ি-ঝিনুক সংগ্রহেই নিঃশেষিত হয় তেমন না হয়ে, আমাদের সন্ধিৎসু-চেতনা আহরিত শঙ্খের গহ্বরে সমুদ্রের গভীরের দীর্ঘশ্বাসই শুনতে পাবে। এই সংলগ্নতাকে অনুধাবনই চিত্রকল্প আলোচনার উদ্দেশ্য। ক্রোচে এই বিষয়ে বলেছেন—What is called image is always a nexus of images, since

image-atoms do not exist any more than thought-atoms। দীর্ঘ কবিতায় কবি-ভাবনার গতি, বিবর্তন ও পরিণতির চেহারাকে স্বরূপতঃ উপলব্ধির জন্যই চিত্রকল্পগুচ্ছের বিন্যাস লক্ষণীয়, পরীক্ষণীয়। এ শুধু ইঁটের দৃঢ়তা এবং স্থাপনা-চাতুর্য দেখে টাওয়ারের মহিমাকে হারিয়ে ফেলা নয়। একটি কবিতার পূর্ণ রস-গ্রহণ তখনই সম্ভবপর যখন চিত্রকল্পগুচ্ছের ফলন্ত দ্রাক্ষাপুঞ্জ, কোন্ ভাবনার আবেগের কুঞ্জবনের অসহ রসোচ্ছ্বসিত ফল, এ কথার সম্যক প্রতীতি জন্মাচ্ছে। কিন্তু সর্বদা স্মরণীয় যে আমরা সন্ধান করতে যাই দ্রাক্ষাপুঞ্জেরই, দ্রাক্ষাহীন দ্রাক্ষালতার কোনো মহিমার কথা আমরা শুনিনি।

দুই

কাব্যে দীর্ঘ তন্ময়তার কালে কবিরা চিত্রকল্প রচনার জন্য স্বাভাবিক প্রতীক natural symbol-গুলিকেই উপাদান হিসাবে গ্রহণ করে থাকেন। পাহাড় অনড়তার প্রতীক, আর্চ বা খিলান শক্তির বা ভার বহনের স্বাভাবিক প্রতীক। এই স্বাভাবিক প্রতীক নিজে নিজেই কোনো চিত্রকল্প নয়। স্বাভাবিক প্রতীকের অনুষঙ্গে যে সমস্ত স্মৃতি জাগ্রত হয়ে থাকে, এই প্রতীকগুলি থেকে যে ব্যঞ্জনা কবি নিষ্কাষিত করেন, তারই সাহায্যে গঠিত হয় কবির চিত্রকল্প। স্বাভাবিক প্রতীকগুলি জাতিগত, বিশ্বগত। ঝড়ের প্রতীকী অর্থ সকল দেশেই এক। কবি সেই সব জাতিগত এবং বিশ্বগত প্রতীকের সাহায্যে নিজস্ব চিত্রকল্পের জগৎ সৃজন করেন। Kite ইংলণ্ডে বা ইউরোপে চিরদিন কাপুরুষতা, নীচতা, নিষ্ঠুরতা ও মৃত্যুর প্রতীক। চিল এবং ঘোড়া অথবা নৌকা আমাদের জাতীয় মানসে লোককাব্য, লোক সাহিত্য মারফত দৃঢ়মূল স্বাভাবিক প্রতীক। জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে অথবা রবীন্দ্রনাথে এই স্বাভাবিক প্রতীকের ব্যবহার ঘটেছে কবিদের ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী, বক্তব্য অনুযায়ী, সমস্যা অনুযায়ী বিভিন্নভাবে। দীর্ঘ কবিতায় এই স্বাভাবিক প্রতীক-ব্যবহৃত চিত্রকল্পরাশির সঙ্গত সংলগ্নতার পাশে পাশে ছোট কবিতায় কবিদের লিরিক অন্তর্মুখীনতায় উচ্চারিত প্রথাবিমুক্ত চিত্রকল্পগুলির অভিনবত্ব অনুধাবন-যোগ্য। 'পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসান রুটি' অথবা 'বেতের ফলের মত ম্লান চোখ'—প্রভৃতি উক্তিতে চিত্রকল্পের অভিনবত্ব দীর্ঘ কবিতার পক্ষে বেমানান। ছোট কবিতার মিতায়তনে এরা কার্যকরী। কেননা সেখানে একটি সার্থকতম চিত্রকল্পই একটি প্রদীপ-ভাতির মতো কল্পনাকে আলোকিত করার পক্ষে যথেষ্ট। পক্ষান্তরে মাত্র-চিত্রলতা নয়, চিত্রলতার সংহতিই দীর্ঘ কবিতাকে

সার্থক করে তোলে। আমাদের বর্তমান নিবন্ধে সেই সংহতির বিষয়টিই আলোচ্য। তার জন্যে আমাদের বক্তব্যের সহায়ক গুটিকতক কবিতা আমরা ব্যবহার করব। অবশ্যই কবি এবং কবিতার নিঃশেষিত তালিকা প্রণয়ন আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

স্বাভাবিক প্রতীক কেমনভাবে চিত্রকল্পগুচ্ছের (Image-cluster) পধান উপাদানগুলিকে আকর্ষণ করে, কেমন করে স্বাভাবিক প্রতীকের আকর্ষণে চিত্রকল্পগুচ্ছের এক-একটি চিত্রকল্প সমগ্র কাব্য-কৃতির রচনায় অংশগ্রহণ করে, শেক্সপীয়রের Kites and Coverlets চিত্রকল্পগুচ্ছে ত.র প্রমাণ মেলে। শেক্সপীয়রের আরো অনেক এ-জাতীয় চিত্রকল্পগুচ্ছের ন্যায় এখানেও, একটি স্বাভাবিক প্রতীকের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে, কবির নিজস্ব অনুষঙ্গ সৃজনী ক্ষমতার অব্যাহত শিল্পসিদ্ধ প্রকাশ ঘটেছে। Kite-এর প্রতীকী অর্থের আকারগত ভেদ ইউরোপ ভূখণ্ডে অবশ্যই উপস্থিত—কিন্তু প্রকারগত ভেদ কিছু নেই। শেক্সপীয়র Kite-সংক্রান্ত চিত্রকল্প রচনাকালে প্রাচীন ইউরোপীয় ঐতিহ্যকেই অনুসরণ করেছেন। প্রাচীন গ্রীক-ধারণায় ঐ পাখি ছিল দুর্লক্ষণের প্রতীক, চসর এই পাখি সম্বন্ধেই উল্লেখ করেছেন 'the coward kyte' বলে। সুতরাং শেক্সপীয়র যখন প্রচলিত ধারণার অনুসৃতিতে kite-কে ব্যবহার করলেন তখন স্বভাবতই এই পাখি তাঁর কাছে হয়ে দাঁড়াল Symbolic of cowardice, meanness, cruelty and death। অ্যাণ্টনি এবং লিঅরের মুখে এ হল একটা ঘৃণার্হতার প্রতীক (term of opprobrium)। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের শবরাশির ঊর্ধ্বে পরিদৃশ্যমান kite নিঃসন্দেহে প্রধানতঃ মৃত্যুর প্রতীক। কিন্তু শেক্সপীয়র এই প্রতীকের সাহায্যে যখন চিত্রকল্পগুচ্ছ সৃজন করেন তখন দেখা যায় sheets, bed বা শয্যা সংক্রান্ত কোনো সংলগ্ন চিত্র প্রায়শই ব্যবহৃত হয়েছে। সমালোচকেরা অনুমান করে থাকেন এবং বলেন যে এটা অনুমানমাত্র—হয়তো কোনো মৃত্যু-শয্যা-দৃশ্য মহাকবির মনে প্রবল প্রভাব কোনো সময়ে ফেলেছিল। মৃত্যু-স্মৃতি মনের মধ্যে স্থায়ী হয়ে থেকে গিয়েছিল বলে, মৃত্যুকে শিল্পের রূপাধারে ধারণ করার সময়ে kite এবং (মৃত্যু) শয্যা-সংক্রান্ত কোনো কিছুর উল্লেখ প্রায়শঃ অপরিহার্য হয়েছে। প্রশ্ন হতে পারে যে এই তথ্য জেনে আমাদের লাভ কী ? অবশ্যই এর যদি তথ্যাতিরিক্ত কোনো মূল্য না থাকে তবে তা কাব্য-বিচারে শেষ তাৎপর্যে বঞ্চিত। কিন্তু আমরা জানি যে শেক্সপীয়রের চরিত্র-প্যাটার্ন, পরিবেশ-প্রয়োগ থেকে শুরু করে তাঁর কাব্যময়তা পর্যন্ত—সকল কিছুই সর্বাবস্থায় এক সমগ্রের বোধ-সঞ্চারের দিকে অগ্রসর। Kite এবং coverlet বা অনুরূপ সকল সংলগ্ন চিত্র-

কল্পগুচ্ছকে সেই অর্থেই ব্যবহার করা প্রয়োজন। শেক্সপীয়রের মানস-বৈশিষ্ট্য পূর্ণোপলব্ধির পথে তা সহায়ক। এমন কোনো কোনো সময় দেখা গেছে, সমালোচকেরা বলছেন যে, কোনো মৃত্যু-দৃশ্যের প্রসঙ্গ-ব্যতিরিক্ত হয়েও যখন sheet বা অনুরূপ প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে, তখনও শেক্সপীয়রের চিত্রকল্প-সৃজনী ক্ষমতা নিজ ন্যায়কেই অনুসরণ করেছে। এই ব্যাপার না বুঝলে কবির শিল্পকর্মের মূল উপাদানস্বরূপ যে সব রূপাধার, তাদের তাৎপর্য সম্যক হৃদয়ঙ্গম করা যাবে না। শেক্সপীয়রের মানস-সমগ্রতার সন্ধানে তাঁর শিল্পের সমগ্রতাকে ব্যবহার করা হবে—চিত্রকল্পগুলি কবির মহাভাবনার অনু-উপাদান বলেই বিচার্য।

সাধারণত পণ্ডিতী-আলোচনায় উপেক্ষিত কিন্তু জনসাধারণের কাছে সমাদৃত রবীন্দ্রনাথের একটি দীর্ঘ কবিতার সাহায্যে আমরা বিষয়টিকে অন্য আলোকে কিন্তু একই তাৎপর্যে উপলব্ধি করতে পারি। কবিতাটি 'দেবতার গ্রাস'। 'দেবতার গ্রাস' অবশ্যই তার করুণরসাতিশয্যের জন্য জনপ্রিয়। রাখালের মৃত্যু সেই করুণ-রসের উৎস। 'বন্দীবীর' এবং 'দেবতার গ্রাস'-এ দুই কিশোরের মৃত্যু উপলক্ষ করে করুণ-রসের উৎস উন্মোচিত হয়েছে। কিন্তু 'দেবতার গ্রাস'-এ কবির কল্পনার ন্যায়ক্রম অধিকতর সুগঠিত। কবিতাটির প্রধান চিত্রকল্পগুলি এই ঃ

ক. মসৃণ চিক্কণ কৃষ্ণ কুটিল নিষ্ঠুর,
লোলুপ লেলিহজিহ্ব সর্পসম ক্রূর
খল জল ছল-ভরা, তুলি লক্ষ ফণা
ফুঁসিছে গর্জিছে নিত্য করিছে কামনা
মৃত্তিকার শিশুদের, লালায়িত মুখ।

খ. ···চারিদিকে ক্ষিপ্তোন্মত্ত জল
আপনার রুদ্রনৃত্যে দেয় করতালি
লক্ষ লক্ষ হাতে। আকাশেরে দেয় গালি
ফেনিল আক্রোশে।

গ. অন্য দিকে লুব্ধ ক্ষুব্ধ হিংস্র বারিরাশি
প্রশান্ত সূর্যাস্ত-পানে উঠিছে উচ্ছ্বাসি
উদ্ধত বিদ্রোহ ভরে।

চিত্রকল্প হিসাবে এরা, পৃথকভাবে দেখলেও, সুপ্রযুক্ত, সে কথা স্বতঃস্বীকার্য। কিন্তু শুধু সেই সার্থকতার কারণেই এ কথা বলা হয় না যে, এরা রসোৎকর্ষের সহায়ক। এরা যে কারণে কাব্যের রস-জগৎ নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছে তাকে

অনুসন্ধান করতে হলে এদের সংলগ্নতার প্রসঙ্গটিই অনুধাবনযোগ্য। প্রথম দৃষ্টিতে যেটা চোখে পড়ে সেটা হল চিত্রকল্পগুলিতেই আসন্ন বিপদের, দুর্বিপাকের পূর্বাভাস প্রতিবিম্বিত। কিন্তু এ হল একান্ত বাইরের পরিচয়। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র কবিতাটির ভাবের যা সারাৎসার, তার সঙ্গে চিত্রকল্পগুচ্ছের নিবিড় সম্পর্কের জন্যই কবিতাটি রস-সিদ্ধির পথে এগিয়েছে। রাখালের মৃত্যু হল—এ তো শুধু গল্পটির বাইরের পরিচয়। পুণ্যার্জনের পর গৃহসুখপিপাসু প্রাণভয়কাতর যাত্রীজনতার হাতে মাতৃস্নেহের চূড়ান্ত লাঞ্ছনা হল—এটাই প্রকৃতপক্ষে গল্প। যা সুন্দর, স্নিগ্ধ, উচ্চ এবং পবিত্র তা কুটিল মত্ততার হাতে লাঞ্ছিত অবমানিত হতে চলেছে, অথবা হচ্ছে, এমন ধরনের চিত্রকল্পগুচ্ছ তাই কবিতার মূল ভাবের ধারক। উদ্ধত বিদ্রোহে প্রশান্ত সূর্যাস্তের বিরুদ্ধে হিংস্রতায় ক্ষোভ প্রকাশ করা হচ্ছে, অথবা আকাশকে জল ফেনিল আক্রোশে গাল পাড়ছে, কিংবা ছল-ভরা খল জলের সর্প লালায়িত মুখে মৃত্তিকার শিশুদের কামনা করছে—সবই এই তাৎপর্যে ব্যবহৃত চিত্রকল্প। কবিতাটি যদি রাখালের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শেষ হত তাহলে রবীন্দ্রনাথের শ্রেয়োবোধ পীড়িত হত। তাই মৈত্রমহাশয়ের মৃত্যু রাখালের মৃত্যুকে অনুসরণ করেছে। মৈত্রমহাশয়ের মৃত্যু অনুষ্ঠিত পাপের বিরুদ্ধে রবীন্দ্র-সম্মত প্রতিবাদ। কিন্তু এই কবিতায় পাপ ও পুণ্যের দ্বন্দ্বের কোনো চেতনা কবির মনে প্রথমাবধি সক্রিয় ছিল না। দুটি চিত্রকল্পের স্বল্প পর্যালোচনায় এ কথা স্পষ্ট হয়।

ক. সিন্ধুর বিজয় রথ পশিল নদীতে—
আসিল জোয়ার।
খ. সংকীর্ণ নদীর পথে বাধিল সমর
জোয়ারের স্রোতে আর উত্তর সমীরে
উত্তাল উদ্দাম।

বিজয় রথ প্রবেশ ও স্রোত-সমীরের দ্বন্দ্বের অনুমূর্তি—কবির মনে প্রথম থেকে দৃঢ়বদ্ধ থাকলে, চিত্রকল্প হিসাবে আরো বিকশিত এবং বিস্তৃত হত। এরা সংক্ষিপ্তোক্তি হয়েছে বলে, মৈত্রমহাশয়ের নদীতে আত্মবিসর্জনের কোনো পূর্বপ্রস্তুতি নেই। কবিতাটির সমাপ্তির দুর্বলতার মূল এইখানে।

দীর্ঘ কবিতায় চিত্রকল্পের এই মূল ভাববাহিতার শক্তিই প্রধান কথা। তাদের বিশিষ্ট উৎকর্ষ সে ক্ষেত্রে গৌণ-বিচার। বহুখ্যাত 'দুই বিঘা জমি'র মূল-রস সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ চিত্রকল্পের পরিণত ফসল ফলিয়েছে, 'ধিক ধিক, ওরে শত ধিক তোরে নিলাজ কুলটা ভূমি'—এই স্তবকটিতে। ভূমিহারা উপেন নিজের দুই বিঘা জমির সৌখীন উদ্যানে রূপান্তরিত চেহারার সামনে

দাঁড়িয়ে, দীর্ঘপ্রবাসের পরে, যে আক্ষেপোক্তি করছে—স্তবকটিতে সেই আক্ষেপ একটি চিত্রকল্পে ধৃত হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত মূল্যবান এবং তাৎপর্যপূর্ণ এই চিত্রকল্প। লোলুপ ভূস্বামীর প্রলোভনে লুণ্ঠিত তরুণী-কৃষক-বধূ কতবার বঙ্গদেশে জমিদারের বাগানবাড়ির সামগ্রী হয়েছে, কতবার কেঁদে অভিশাপ দিয়ে ফিরে গেছে তার শিশুপুত্র—স্তবকটির বিস্তৃত চিত্রকল্পে সেই কাহিনীর স্মৃতি ঃ

সে কি মনে হবে একদিন যবে ছিলে দরিদ্র মাতা
আঁচল ভরিয়া রাখিতে ধরিয়া ফলফুল শাকপাতা!
আজ কোন্ রীতে কারে ভুলাইতে ধরেছ বিলাস বেশ—
পাঁচরঙা পাতা অঞ্চলে গাঁথা, পুষ্পে খচিত কেশ।

এই চিত্রকল্পটি কবির কল্পনাকে ন্যায়তই এমন নাড়া দিয়েছে, সক্রিয় করেছে যে এরই টানে পরবর্তী স্তবকের শেষ প্রান্তে পর-হয়ে-যাওয়া মায়ের দীর্ঘশ্বাসযুক্ত গোপন সামান্য দানের স্মৃতিতে আম গাছ থেকে দুটি আম খসে পড়ার চিত্রকল্প সৃজিত হয়েছে ঃ

ভাবিলাম মনে, বুঝি এতখণে আমারে চিনিল মাতা।
স্নেহের সে দানে বহু সম্মানে বারেক ঠেকানু মাথা ॥

এইভাবে বলা যায় যে, শুধু ভাবের সঙ্গে আপাত-সংলগ্নতা নয়, চিত্রকল্পের সাহায্যে ভাবানুভূতির গভীরতম উৎসকে আলোকিত করে তোলাই দীর্ঘ কবিতার চিত্রকল্পের ধর্ম। স্বভাবতই শেক্সপীয়র তাঁর জটিল গভীরতাকে ব্যক্ত করার জন্য স্বাভাবিক প্রতীকের আকর্ষণে যে চিত্রকল্পগুচ্ছ রচনা করতেন, তাঁর পূর্ববর্তী দান্তে-র হাতে স্বাভাবিক প্রতীকের ব্যবহার সেভাবে ঘটে নি—আবার রবীন্দ্রনাথের শান্ত গভীরতার পক্ষে চিত্রকল্পের অন্য জাতীয় ব্যবহার ঘটেছে। রবীন্দ্র-নাটকে জটিলতা কম বলেই 'বিসর্জন'-'মালিনী' প্রভৃতির চিত্রকল্প আলোচনা শেক্সপীয়রীয় চিত্রকল্পের আদর্শে সম্ভব নয়। এখানে চিত্রকল্পগুলি সোপান-পরম্পরার বিন্যাসে সাজানো। আমরা সেই সিঁড়ি ধরে ক্রমে ক্রমে নেমে যেতে পারি ভাবের গভীর সরোবরে, কিংবা উঠে যেতে পারি অচ্ছদ-নীলিমায়। 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ' থেকে ব্যাপারটি বিস্তৃতভাবে উপস্থাপিত করা যাক।

যে প্রধান চিত্রকল্পগুচ্ছ 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদে'র কাব্যকে সূত্র বিধৃত রেখেছে তাদের মধ্যে নাট্যকাব্যের মূল বিষয়টিই প্রতিবিম্বিত। চিত্রকল্পগুলি এই ঃ

ক. দেবি, তব নতনেত্রকিরণসম্পাতে
চিত্ত বিগলিত মোর সূর্যকরঘাতে
শৈলতুষারের মতো।

খ. যেন মোর জননীর গর্ভের আঁধার
আমারে ঘেরিছে আজি।

গ. 'জননী গুণ্ঠন খোলো দেখি তব মুখ।'
অমনি মিলায় মূর্তি তৃষার্ত উৎসুক
স্বপনেরে ছিন্ন করি।

ঘ. মাতঃ নিরুত্তর,
লজ্জা তব ভেদ করি অন্ধকার স্তর
পরশ করিছে মোরে সর্বাঙ্গে নীরবে,
মুদিয়া দিতেছে চক্ষু।

ঙ. আজি এই রজনীর তিমির ফলকে
প্রত্যক্ষ করিনু পাঠ নক্ষত্র-আলোকে
ঘোর যুদ্ধফল।

জমাট অন্ধকার ভেদ করা, অন্ধকারকে বিগলিত কবা, অন্ধকারকে পাঠ করা—সমস্ত উদ্ধৃত চিত্রকল্পগুলির নিহিতার্থ। বরফ গলে যাচ্ছে অথবা গুণ্ঠন উন্মোচনের জন্য বাসনা জাগছে—এই চিত্রকল্প দুটিও অন্ধকার-ভেদ-সংক্রান্ত মূল কল্পনারই চিত্রকল্পগত পরোক্ষ প্রতিফলন। অন্ধকারের সঙ্গে দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথের কর্ণ-কল্পনার মূল কথা। দিবসান্তের আলো অন্ধকারের পটভূমিকায় কর্ণের জীবনে সত্যের আলোক ও অতীতের অন্ধকারের দ্বন্দ্ব ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হল। সেই আলোকে সে শেষ পর্যন্ত নিজের জীবনের মূলবদ্ধ অন্ধকারকেই পাঠ করল—আর কিছু নয়। প্রথমাবধি চিত্রকল্পগুলিতে, অন্ধকারকে ভেদ করার জন্য কর্ণের যে আকুলতা, কুন্তীর যে প্রয়াস তাই ধৃত হয়েছে। তাই দেখা যায় 'অন্ধকার-চেতনা' কবিতাটিতে ব্যবহৃত চিত্রকল্পগুলির মূল বিষয়। কিন্তু এই 'অন্ধকার-চেতনা' নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিস্তার করতে অক্ষম। তাই 'অমনি মিলায় মূর্তি··' কিংবা 'মুদিয়া দিতেছে চক্ষু···' কিংবা 'যেন মোর জননীর গর্ভের আঁধার···' এই সকল চিত্রকল্প-পরম্পরা পেরিয়ে শেষ পরিণতিতে অন্ধকারের স্বরূপ উন্মোচিত হল। নক্ষত্রের আলো অন্ধকারকে বিদূরিত করে না—মাত্র অন্ধকারকেই হৃদয়ঙ্গম করায়। 'তিমির ফলকে প্রত্যক্ষ করিনু পাঠ···' সেই অন্ধকারকেই ব্যক্ত করছে, যা শুধু কর্ণের জন্মবৃত্তান্তের রহস্যঘন অন্ধকার নয়, যা কর্ণের সম্মুখীন অন্ধকারও বটে। কর্ণ অন্ধকারকে ফেলে রেখে চলে গেল না, বরঞ্চ অন্ধকারের উপলব্ধিকে দৃঢ় করে—অন্ধকারই একমাত্র শুচি বলে মেনে নিল। উদ্ধৃত চিত্রকল্পগুলির শৃংখলায় সেই দ্বন্দ্বময়

চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। যেন জঠরের অন্ধকার ভেদ করে এই ক্লেশকর জন্ম—'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ'-এর প্রধান বিষয় এটাই।

তিন

'দীর্ঘ কবিতার চিত্রকল্পের সংলগ্নতার দ্বৈত ভূমিকা এই। একদিকে তারা সুসার্থক চিত্রকল্প, কাব্য-বিষয়ের ছোট ছোট রূপাধার। আর একদিকে ভাবগত গতির ও পরিণতির নিয়ামক এক অন্যতর ব্যাখ্যাতা। এই দ্বৈতকে না বুঝলে কাব্যোপলব্ধি সম্পূর্ণ নয়। আধুনিক বাংলা কাব্যের একটি বড় কবিতার সাহায্যে আমরা এখন এই দ্বৈত সমস্যাকে বোঝার চেষ্টা করব। জীবনানন্দ দাশের 'আট বছর আগের একদিন', আমাদের আলোচ্য কবিতাটির নাম।

চিত্রলতা জীবনানন্দের অনন্য সম্পদ। এক কথায়, ছবি দিয়ে কথা বলতে জীবনানন্দ ভালোবাসেন। কিন্তু সচেতন পাঠক মাত্রেই জানেন যে আমাদের আলোচ্য, জীবনানন্দের এই বিখ্যাত দীর্ঘ কবিতাটিতে চিত্রলতার যে অভিনবত্বের জন্য জীবনানন্দের সাধারণ খ্যাতি, তা পরিহৃত। চিত্রলতা এখানে কবির কল্পনাকে অরূপণ হবার অবকাশ না দিয়ে, চিত্রল-সংহতির দিকে তাকে নিয়ে যেতে চেয়েছে। কবি-কল্পনার, এক্ষেত্রে, কেন্দ্রীয়-দুর্বলতার জন্য সে যাত্রা মধ্যপথে খণ্ডিত হয়েছে। কেমনভাবে হয়েছে, এবং কবির ব্যবহৃত চিত্রকল্পে তার প্রতিক্রিয়া কেমনভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে সেটাই আমাদের অনুধাবনীয়। সকলেই এই কাব্য-বিষয়ের আপাত-পরিচয়টুকু জানি যে এটি কোনো আত্মহত্যার বিষয়ে লেখা কবিতা। সেই আত্মহত্যাকে রুগ্নতার সঙ্গে একাসনে স্থান দেওয়া যাবে না। কেননা, কবি জানিয়েছেন যে এই মৃত্যু সাধারণ মৃত্যু নয়। যে-সমস্ত প্রাকৃত-কারণে মানুষের মৃত্যুবাসনা লৌকিক ব্যাপার হতে পারে সেসব কারণ এখানে উপস্থিত ছিল না। তাহলে এই মৃত্যু-বাসনার মূল কোথায় অনুসন্ধেয়? 'বিপন্ন বিস্ময়'—বলে কবি ইঙ্গিতে যা বলেছেন, প্রতীকে-উপমায় তাকেই কবি ব্যাখ্যা করেছেন কাব্যের নিয়মে। মৃত্যু-বাসনার মূল সেখানেই সন্ধেয়। এই কবিতায় একটি চিত্রকল্পের তিনবার ব্যবহার ঘটেছে। চাঁদের অপঘাত মৃত্যু সেই চিত্রকল্পটির মূল কথা। এবং এই চিত্রকল্পের ব্যাখ্যায় সমগ্র কবিতাটির ব্যাখ্যা সম্ভব। চাঁদ অবশ্যই স্বাভাবিক প্রতীক। স্মরণীয় যে শেষার্ধে রবীন্দ্রনাথ, এবং প্রধান আধুনিক কবিরা সকলেই নিজ নিজ অভিজ্ঞতার জগৎ নিঙড়ে রস-মৃত্তিকা সংগ্রহ করে নিজ নিজ প্রতীক রচনা করে নিয়েছেন। কেমনভাবে এ ব্যাপারটা ঘটে সেটা আমাদের এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়! স্বতন্ত্র কবি-জীবনীর আলোচনাতেই তার ব্যাখ্যা হওয়া উচিত। কিন্তু একটা বিষয় লক্ষণীয়, চাঁদকে স্বাভাবিক প্রতীক হিসাবে জীবনানন্দ ব্যবহার করলেও—কবি

নূতন অনুষঙ্গ সংযুক্ত করেছেন 'বুড়ি' এই বিশেষণটির প্রয়োগে। সদাই জীবনানন্দ তাঁর সমকালবর্তী সভ্যতার সঙ্গে একটা দুরতিক্রম্য ব্যবধান অনুভব করতেন। এই ব্যবধানজনিত শূন্যতাকে সাজানোর জন্য তাঁর নিজের প্রাতিভাসিক জগৎ সৃষ্টির তাগিদে বিদিশা-ব্যাবিলন-জলসিঁড়ি-ঘাই হরিণী প্রসঙ্গের কাব্যময় প্রয়োগ। 'বুড়ি চাঁদ'—কথাটিতে 'সভ্যতা-পীড়িত মানুষের প্রায় অবসিত' সৌন্দর্যবোধের ছায়া প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে
চমৎকার!—
ধরা যাক দু-একটা ইঁদুর এবার!
জানায় নি পেঁচা এসে এ তুমুল গাঢ় সমাচার?

থুরথুরে অন্ধ পেঁচা দরিদ্র-অস্তিত্বের জীর্ণতার প্রতীক, কিন্তু দুর্মরতারও বটে! বুড়ি চাঁদ প্রায়-অবসিত সৌন্দর্যচেতনার প্রতীক। যে আত্মহত্যা করেছে সে জেনে গেছে— সৌন্দর্যের বিস্ময়ের মৃত্যু ঘটেছে। এবং যেটুকু বেঁচে থাকে সেটুকু পেঁচার অন্ধ অস্তিত্ব-রক্ষার তাগিদ। এই কঠিন সত্যকে প্রতিমুহূর্তে 'জানিবার গাঢ় বেদনার অবিরাম—অবিরাম ভার' আর সহ্য করতে হবে না বলেই লাস্-কাটা ঘরের দিকে যাত্রা।

কিন্তু আমরা বলেছি যে কবিতাটিতে কথঞ্চিৎ কেন্দ্রীয় দুর্বলতা বিদ্যমান। পঞ্চমীর চাঁদ ডুবে গেলে পরে উটের গ্রীবার মতো নিস্তব্ধতা এসে যাকে না জাগার তাৎপর্য বুঝিয়ে গেল—সে জীবনের অখণ্ড স্বরূপকে জানত না তা নয়।

গলিত স্থবির ব্যাং আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে
আরেকটি প্রভাতের ইসারায়-অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে।
টের পাই যূথচারী আঁধারের গাঢ় নিরুদ্দেশে
চারিদিকে মশারীর ক্ষমাহীন বিরুদ্ধতা;
মশা তার অন্ধকার সঙ্ঘারামে জেগে থেকে জীবনের
স্রোত ভালোবাসে।

রক্ত ক্লেদ বসা থেকে রৌদ্রে ফের উড়ে যায় মাছি;
সোনালী রোদের ঢেউয়ে উড়ন্ত কীটের খেলা কত দেখিয়াছি।

উষ্ণ অনুরাগ, জীবনের স্রোত, রৌদ্র, সোনালী রোদ প্রভৃতি জীবনের ক্লান্ত, মৃত বিস্ময় এবং জীর্ণ অস্তিত্বের বিপরীত প্রতীক। এগুলির সমবায়ে একথাই পাঠকের কল্পনায় আকার গ্রহণ করেছে যে—জীবন সর্বাবস্থায় সংকীর্ণ অস্তিত্বকে মাড়িয়ে অখণ্ড জীবনের দিকে যেতে চায়। কিন্তু আত্মহত্যাকারী

জেনে গেছে যে মানুষের জীবনে জীবজগতের অখণ্ডতার আভাস মাত্র নেই। যে জীবন ফড়িঙের দোয়েলের, মানুষের সাথে তার হয় নাক দেখা। একথা জানার পর সব কিছুই তার কাছে তাৎপর্য হারিয়ে ফেলল। জোনাকির স্নিগ্ধতার স্বাদ এবং পেঁচার ইঁদুর ধরার স্বাদ দুইকে যখন মেলানো মানুষটির পক্ষে সম্ভব নয়, সম্ভব নয় দুর্মর জীর্ণ অস্তিত্বকে আর সুন্দরকে মেলানো—তখন উটের গ্রীবার মতো নিস্তব্ধতা, অর্থাৎ একটা অদ্ভুত বিশূন্যতা তাকে মরতে ডাকবে, এ স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিক সিদ্ধান্তের পর কবিতা আর এগুতে পারে না। 'শোনো, তবু এ মৃতের গল্প ‥' বলে যে স্তবক শুরু হল তা প্রকৃতপক্ষে কবির সংশয় থেকে উদ্ভূত। কাব্যে যাকে সঞ্চারিত করেছেন প্রত্যয়ে, তাকে তথ্যবন্ধ করার জন্য কবির ব্যাখ্যা শুরু হল। ফলে নির্বেদগ্রস্ত আত্মহত্যাকারীকে তিনি কখনো মৃদু-করুণা করে, কখনো মৃদু ব্যঙ্গ করে ধীরে ধীরে স্পষ্ট করে ফেললেন। পক্ষান্তরে আমাদের তখন উটের গ্রীবার চিত্রকল্পে এই প্রত্যাশা জাগ্রত যে, উক্ত বিশূন্যতা বোধকেই নানা রূপাধারে স্পষ্ট করা হবে। কিন্তু এ আমাদেরই ভুল, হয়তো জীবনানন্দও জানতেন যে, এই বিশূন্যতাবোধ নিজে নিজেই কোনো মহৎ ব্যাপার নয়। কাজেই স্তব্ধ হয়ে গেল চিত্রকল্পের স্রোত, যা রইল তা শুধু পুরনো কথার আবর্ত, ফিরে ফিরে পুরনো চিত্রকল্পেই আশ্রয়গ্রহণ। তথাপি দীর্ঘ কবিতায় চিত্রকল্পের সমীচীন প্রয়োগের দৃষ্টান্ত হিসাবে জীবনানন্দের এই কবিতাটি উৎকৃষ্ট দিশারী—এতে কোন সংশয় নেই।[১]

---

[১] দীর্ঘ কবিতায় চিত্রকল্পের এই সংলগ্নতার বিষয়টি বিষ্ণু দে-র 'জলদাও' কবিতা প্রসঙ্গে অন্যত্র আলোচিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের গান : আধুনিক কবিতা

'গীতাঞ্জলি' সম্বন্ধে তিনটি উক্তি স্মরণ করে এই আলোচনার মুখপাত করা যাক। একটি হল বুদ্ধদেব বসুর অ্যান্ একর্ অব্ গ্রীন গ্র্যাসের মন্তব্য: "মূলে ছিল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ছন্দবিন্যাস, সুইনবার্নকে ছাড়িয়ে যাওয়া মিলের ঝংকার, কিন্তু এইসব কারুকর্ম থেকে রিক্ত বলে কবিতাগুলিকে ইংরেজিতে আরো শান্ত মনে হয়, আরো অনুগত যেন, একেবারে পরম সমর্পণে বিনম্র। বাংলাতে যেন গীতের অংশ বেশি পাচ্ছি, আর ইংরেজিতে অঞ্জলিটাই প্রায় সর্বস্ব।... এমন মুহূর্ত বিরল নয়, যখন অনুবাদ মূলকে অতিক্রম করে যাচ্ছে।"[১] আমি স্মরণ করি টমসনের অভিমতটি : ইংরেজি গীতাঞ্জলি প্রকৃত প্রস্তাবে একটি নতুন কাব্য। আর স্মরণ করি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের দুটি প্রবন্ধের দুটি মন্তব্য। 'ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে তিনি বলেন, "গীতাঞ্জলি'তে ভাষার প্রকৃতি সম্বন্ধে গবেষণা চুকিয়ে 'বলাকা'-য় তিনি ছন্দের স্বরূপ-সন্ধানে নামলেন।" এবং 'সূর্যাবর্ত' প্রবন্ধে তিনি বলেন, "বাংলার ইতিহাসে 'মানসী'-ই অপূর্ব নয়, 'গীতাঞ্জলি'-তে মধ্যযুগীয় ভক্তিসাধকদের প্রতিধ্বনিও অনুরূপ অনুভূতির আবশ্যিক অভিব্যক্তি।" সুধীন্দ্রনাথের কথা দিয়েই শুরু করা ভালো। কেননা, তাহলেই বোঝা যাবে 'গীতাঞ্জলি'-র কবি কী অর্থে এক সুমহৎ আধুনিক কবি। 'ভাষার প্রকৃতি সম্বন্ধে গবেষণা' নিশ্চয় মধ্যযুগীয় ভক্তিসাধকদের সাধ্য বিষয় ছিল না। প্রকাশকে 'বিশেষের আর্তিতে' বাঁধতে চাওয়া, বা 'কাব্যশরীরের সজ্ঞান নির্দিষ্টতা' (বিষ্ণু দে / একালের কবিতার ভূমিকা) যদি আধুনিক কবিতার লক্ষণ হয়, তাহলে রবীন্দ্রনাথের গান কবিতা-অর্থেই আধুনিক কবিতা। সেও এক কথ্য-স্রোতের সম্প্রসারণ অথবা গভীরগমন। বহুক্ষেত্রে পুনর্লিখনেই তার প্রতিষ্ঠা ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের সারাজীবনের গানের কবিতায় 'গীতাঞ্জলি'-র আগে এবং পরে, জীবনের শেষ প্রান্ত অবধি।

বিষয়টি স্পষ্ট হয় রবীন্দ্রনাথের এই উজ্জ্বল কবিতাটিকে ধরলে, 'মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ আসিতে তোমার দ্বারে'। ১৩৪২-এর শ্রাবণে লেখা যে কবিতাটির এটি পাঠান্তর সেটি হল, 'মনে হল পেরিয়ে এলেম অসীম পথ আসিতে তোমার দ্বারে'। উপাদানের দিক থেকে দুটি

---

১. "কবি রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থে বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা সমীচীন মনে করি এই প্রসঙ্গে তাঁর আর একটি মন্তব্য : আমার ধারণার কিছু পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু এই মন্তব্যের সঙ্গে এখনো আমি অংশত একমত।

কবিতাকে এক কবিতা বলা গেলেও, শিল্পের বিচারে এঁরা সম্পূর্ণ আলাদা। শেষোক্ত কবিতার শেষ পঙক্তিটি হল, 'আমার আঁখি ব্যাকুল পাখি ঝড়ের অন্ধকারে', কেবলমাত্র একটি কবি-সম্ভব উক্তি। কিন্তু প্রথম-উদ্ধৃত কবিতাটির শেষ পঙক্তি একটি অসংশয়ী কবিতার শেষ গূঢ় পদক্ষেপ, 'আমার এ আঁখি উৎসুক পাখি ঝড়ের অন্ধকারে'। এই অসামান্য চিত্রকল্পটির চরণে পৌঁছাতে পৌঁছাতে কবিতাটিও যেন হয়ে ওঠে 'অন্তবিহীন'। 'অসীম' 'অন্তবিহীন' হলে কী হয়, এ যিনি জানিয়ে দেন আমাদের, তিনি কবিতাই লিখছেন— আধুনিক কবিতা। 'সুধাশ্যামল' বড্ড বেশি কবিতা, 'সুধাশ্যামলিম' বর্ণের দিক থেকে সংযত, শব্দের দিক থেকে দুটি 'ম'-এর সাহায্যে কোমলতাসঞ্চারী। মূল কবিতায় 'তোমার প্রদীপ' পাঠান্তরে 'নিভৃতে প্রদীপ'। 'পথহারার বেদন বাজে সমীরণে' কবিতার রভসে এলিয়ে পড়ছে। পক্ষান্তরে 'পথহারানোর বাজিছে বেদনা সমীরণে' অনেক বেশি বিশেষিত। এরকম ব্যাপার আরো ঘটেছে। 'সানাই' কাব্যগ্রন্থের 'বাণীহারা' কবিতাটির কথা ধরা যাক। 'গীত-বিতানে'-র 'প্রেম' অধ্যায়ের ২২৬ সংখ্যক গান। এখানেও উপাদান একই, কিন্তু প্রথমটিকে যদি বলি কথার শেষ সীমা, দ্বিতীয়টি তবে নীরবতার প্রারম্ভ। প্রথমটির কবিতা-স্বরূপে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু দ্বিতীয়টিতে সব প্রশ্নই বিস্মৃত হতে হয়। 'ওগো মোর নাহি যে বাণী'—'বাণীহারা' কবিতার এই প্রথম চরণ গানটিতে হল 'বাণী মোর নাহি'। 'ওগো' এবং 'যে' সরে গেল। 'বাণী' আগে চলে আসায় 'নাহি' দিল চরণান্তিক এক বিষণ্ণ প্রতীক্ষা। 'সানাই'-য়ে দ্বিতীয় চরণটিতে একটি 'আকাশে'-র মতো দীর্ঘস্বরবিশিষ্ট শব্দ। 'গীত-বিতানে' 'স্তব্ধ' কথাটি বসিয়ে ব্যাপারটিকে আরো সচেতনতা দেওয়া হল। 'সানাই'য়ে কবিতাটির তৃতীয় চরণে 'আমি অমাবিভাবরী আলোকহারা' 'গীত-বিতানে' প্রায় একই আছে, আমি অমাবিভাবরী আলোহারা'। কিংবা, এক নেই। 'আলোকহারা' কেন জানি না একটা সাময়িক অবস্থাকে বোঝায়— 'আলোহারা' একটা একান্ত মন্ময় অনুভূতিকে ধরে দিচ্ছে। 'সানাই'-য়ে 'মেলিয়া তারা' 'গীত-বিতানে' হয়েছে 'মেলিয়া অগণ্য তারা'। 'অগণ্য' প্রয়াসের অন্তহীনতার সাক্ষ্য। গুরু পরিবর্তন হয়েছে পরের দুই পঙক্তিতে। 'চাহি নিঃশেষ পথ-পানে / নিষ্ফল আশা নিয়ে প্রাণে'—'সানাই'-য়ের 'বাণীহারা' কবিতার এই দুই পঙক্তি গীতবিতানে সংহত হয়েছে একটি পঙক্তিতে, 'নিষ্ফল আশায় নিঃশেষ পথ চাহি'। বলে দিতে হয় না, এই সংহতিই সমস্ত বেদনাকে দিয়েছে ঘনতা। 'বাণীহারা' কবিতার শেষ পাঁচ পঙক্তি গীতবিতানে ২২৬ সংখ্যক প্রেম অধ্যায়ে তিন পঙক্তিতে পরিণত। সন্দেহ নেই সংহতিতে, কিন্তু আমার আজো

ধারণা কবিতার বিচারে 'বাণীহারা'র সমাপ্তি আরো ব্যঞ্জনাবহ। 'গীতবিতানের' কবিতাটিতে আভোগ অংশে শেষ তিন পঙক্তিতে পাই—'তোমারি সুরের প্রতিধ্বনি তোমারে দিই ফিরায়ে / কে জানে সে কি পশে তব স্বপ্নের তীরে / বিপুল অন্ধকার বাহি ॥" অথচ 'বাণীহারা'তে ছিল, "তোমারি সুরের প্রতিধ্বনি /দিই যে ফিরায়ে / সে কি তব স্বপ্নের তীরে / ভাঁটার স্রোতের মতো / লাগে ধীরে অতি ধীরে।" শেষোক্ত উদ্ধৃতিটি যা বলবার নিজেই বলেছে ; সে কবিতার মতোই স্বয়ংভাষ। প্রথম উদ্ধৃতিটি অত কথা বলেনি। বুঝি অন্য কারো কাছে তার কোনো ভরসা আছে।

হয়তো আমার এত কথা বলার দরকারই ছিল না, অভিজ্ঞ রবীন্দ্র-পাঠক মাত্রেই জানেন যে, এক ফর্ম থেকে রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর কোনো উপাদানকে নিয়ে যেতেন অন্য এক ফর্মে, তখন এমন ব্যাপার, এমন রদবদল, নেওয়া-ছাড়া, যোগবিয়োগ বহুভাবে ঘটেছে। 'পরিশোধ' কবিতা এমন ভাবেই হয়েছে, 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য, 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্য রূপ পাল্টেছে নৃত্যনাট্যে, 'রাজা ও রানী' গদ্য সংলাপের 'তপতী'-তে ভিন্নতা পেল। আরো স্মরণ করতে পারি 'চণ্ডালিকা'-র রূপ-ফের। এ শুধু নিখুঁত হবার প্রচেষ্টাই নয়, এভাবে ফর্মের রূপান্তর যিনি ঘটান, তিনি জানেন ফর্মটাই কনটেনট। ফর্ম পাল্টালে বিষয়ার্থও নতুন আলোক পায়। এই কথা মনে রাখলে কিন্তু বাংলা 'গীতাঞ্জলি' এবং ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'-র প্রভেদকে আর মূল ও অনুবাদের সমস্যা বলে ভাবাটা অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে না। সেও ছিল আসলে এক উপাদানকে এক ফর্ম থেকে অন্য ফর্মে সঞ্চারণের সমস্যা। এই ফর্ম বা রূপ সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতা, আসলে তাঁর একধরনের আত্মসচেতনতাই।

এবং বাংলা 'গীতাঞ্জলি'-র ভাষার প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর যে-অন্বেষা তা কীভাবে তাঁর আত্মসম্বিতের অবৈকল্য সন্ধান, ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'-তেই সেই অন্বেষা পুনরায় কোন্ রূপান্বয়ী, তার উপলব্ধিও বিশেষ করে উপভোগ্য। মধ্যযুগীয় ভক্তিসাধকদের সঙ্গে 'গীতাঞ্জলি'-র লেখকের পার্থক্য 'গীতাঞ্জলি'-র ভাষার মধ্যেই মূর্ত। এ ভাষা একান্তভাবেই ব্যক্তিক, শুধু এই কারণেই একথা বলা নয়, এ ভাষা বিংশশতাব্দীর আধুনিক মানুষের অস্তিত্বগত বিরোধে মিলনে সকল সময়েই দুই ছায়া-বিশিষ্ট, অর্থন্যাস এখানে সোপানপরম্পরায় গভীরগামী। রোথেনস্টাইন যতই এতে অতীন্দ্রিয়তার আভাস পান, এজরা পাউন্ড দেখুন 'প্রাচীন গ্রীক,' আমাদের কাছে এ আধুনিক ভারতবর্ষ। 'কান্না-সাগর', 'বুকের পাথর', 'অরূপরতন', 'সোনার থালায় সাজায় আজ দুখের অশ্রুধার', 'নিশার মতো নীরব', 'তিমির অবগুণ্ঠন', 'বিরামহীন বিজুলীঘাতে' প্রভৃতি সংখ্যা-

গণনার অতীত শব্দগুচ্ছের surface structure-এর ফাঁকে ফাঁকে ধ্বনিত হয় এক ব্যক্তির যন্ত্রণার বাণী। এই গূঢ়-গঠনের সেটাই বৈশিষ্ট্য। সঙ্গে সঙ্গে বাংলা কথ্যরীতিতে যে টান সেই টানেই অব্যয়ের বিচিত্র প্রয়োগ 'কি' 'যেন' 'যে' ইত্যাদি ; এই ক্রিয়ার ব্যবহার ('আঁধার করে আসে'), নেতিবাচক বাক্যের কৌশল, বিরোধ অলংকারের হরণ পূরণ—সবই এক বিশেষ প্রকাশরীতি। শাব্দ-অবয়বে এবং আর্থ অবয়বে সাযুজ্য বৈষ্ণবপদেও লভ্য—'হমার দুখের নাহি ওর' পদটি স্মরণ করি। কিন্তু 'গীতাঞ্জলি'-কবিতার, রবীন্দ্রনাথের অনেক সেরা গানের কবিতার, কবিতা হিসাবেই, ফোনেটিক স্ট্রাক্চার ও ধ্বনি-বর্ণের প্রয়োগ পৃথক আলোচনার দাবি রাখে। 'জীবন যখন শুকায়ে যায়' এই বিখ্যাত কবিতাটি এবিষয়ে অন্যতম সাক্ষ্য দিতে পারে। 'এসো' এই কবিতায় পাঁচবার ধ্বনিত হয়েছে। 'করুণাধারায় এসো', 'গীতসুধারসে এসো', 'শান্তচরণে এসো', 'রাজসমারোহে এসো' এবং 'রুদ্র আলোকে এসো'। প্রথম চরণের দ্বি-দল, ত্রিদল শব্দগুলির পরে 'করুণাধারায়' সহসা নেমে আসে আষাঢ়ের প্রত্যাশা পুরিয়ে তৃষিত মৃত্তিকায়। অভিভূত হয়ে যেতে হয়। একটু অবকাশ দিয়েই 'গীতসুধারসে' আরো গুরু, আরো ঘন—'ত' নিশ্চয় স্বরান্ত উচ্চারণেই পড়তে হবে।[২] অথচ 'হৃদয়প্রান্তে হে নীরব নাথ' মহাপ্রাণ বর্ণগুলিতে ধৃত রইল একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস—তারপরই 'শান্তচরণে' মাত্রাগুণে ছয় পেলেও 'গীতসুধারসে'র মতো সেখানে বিলম্বিত লয়ের, দীর্ঘস্থায়িত্বের প্রয়োজন হবে না[৩]। তৃতীয়াংশে চতুর্থ আহ্বানের উপস্থাপনাটি আরো উপভোগ্য। 'দুয়ার খুলিয়া হে উদার নাথ' দীর্ঘস্বরধ্বনিগুলি যেন উদাত্ত আহ্বানের সূচক, তারপরেই 'রাজ-সমারোহে এসো', আর একটি দীর্ঘলয়ের শব্দ। শেষ আহ্বানটিতে[৪] 'ওহে পবিত্র, ওহে অনিদ্র' দুটি যুক্ত ব্যঞ্জনই চূড়ান্ত আবির্ভাবের ভূমি প্রস্তুত করল, তার পরেই 'রুদ্র'-এর মত কঠিন ব্যঞ্জন ও যুক্ত ব্যঞ্জনের উচ্চারণ। ভাবের অখণ্ডতা, শব্দের নাটকের মাধ্যমে এক গভীর বিস্ময়বোধ সৃষ্টি করে এই কবিতায়। এটা মধ্যযুগীয় অন্বিষ্ট ছিল না।

---

২ ও ৩. ইংরেজি গীতাঞ্জলিতে 'when the heart is hard', মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি এই দীর্ঘশ্বাসকে কবিতাটির প্রথমেই নিয়ে আসে। 'নীরব নাথ' আর lord of silence কিন্তু দুটো আলাদা কথা। lord of silence অন্তত ইংরেজ পাঠকের কাছে ডেভিডের Psalms এর অনুষঙ্গেই অনর্থক হয়ে উঠবে—O Lord, my rock, be not silent to me : lest, if thou be silent to me, I become like them that go down into the pit.

৪. ইংরেজিতে thy light and thy thunder পুনরায় বাইবেলীয় ঈশ্বরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

এমন ভাবসংহতি, এমন পিনদ্ধতা সর্বত্র রক্ষিত হয়েছে, এমন কথা বলতে পারলে ভাল হত, কিন্তু তা বলা যায় না। বিখ্যাত কবিতা—'আর নাইরে বেলা নামল ছায়া ধরণীতে।' অনবদ্য এর প্রথম স্তবকটি। রণিত ব্যঞ্জনধ্বনির অব্যর্থ সমাবেশে জলের শব্দই যেন উছলে উঠেছে। সংবৃত স্বরধ্বনি ঐ রমণীর ত্বরাকে ফুটিয়ে তুলেছে নিমেষে। কিন্তু সঞ্চারী অংশে হঠাৎ কবিতাটি তার কাব্যিক বাস্তবতা, যথাযথতা হারিয়ে ফেলেছে। 'প্রেমনদীতে উঠেছে ঢেউ' একথা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে উড়ে যায় ছায়ার ফাঁকে ফাঁকে দেখা প্রত্যক্ষের নদীটি। 'জানি নে আর ফিরব কিনা' এই উক্তিটির সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নিল কবিতা। তার পর 'সেই অজানা বাজায় বীণা'-র রেশ ধরে কবিতাটি একেবারে হারিয়েই গেছে। উল্টো ব্যাপারটা ঘটেছে 'আজি শ্রাবণ-ঘন-গহন-মোহে' কবিতাটিতে। কবিতাটি সুরেশ সমাজপতিকে ধরা দেয়নি, মুগ্ধ করেছে বুদ্ধদেব বসুকে। এ শুধু শতাব্দীর দুই প্রান্তের রুচিবলয়ের পার্থক্যই নয়, দুই বোদ্ধা ও বোধভূমির পার্থক্য। বুদ্ধদেব বসু কবিতাটির প্রশংসায় যা বলেন তা অবশ্যই বহুমান্য, কিন্তু আর-একটা বিপরীত বক্তব্যের বিষয়ও বিবেচ্য। কবিতাটির প্রথম অংশে কবি তাঁর অন্য দু-একটি কবিতার মতোই নিজের তৈরি শব্দের প্রেমে পড়ে পথ হারিয়েছেন। প্রথমাংশে কবিতাটি তিনবার লক্ষ্যভ্রষ্ট, খঞ্জ হয়েছে। দ্বিতীয় পঙক্তিতে 'গোপন' শুধু নিরর্থক নয়, ব্যর্থ। যাঁকে উদ্দেশ্য করে কবিতাটি বলা, রবীন্দ্রনাথের কবিতার পাঠকেরা, তাঁর কার্যকলাপের ধারার সঙ্গে পরিচিত বলেই জানি, কোনো 'মোহে'-র উপর তিনি যদি চরণ ফেলেন তবে তাতে কোনো গোপনীয়তা রাখার পক্ষপাত তাঁর থাকে না। মোহকে তিনি জ্বালিয়ে দেন, বা চূর্ণ করেন। 'নিশার মতো নীরব' যদি হয় তাঁর পদসঞ্চার, তাহলে আর 'বাতাস বৃথা যেতেছে ডাকি' বলার দরকার করে না। 'নবজাতক' বইয়ের 'রাতের গাড়ি' কবিতার চতুর্থ পংক্তিতে 'রজনী নিঝুম'-এ 'নিঝুম' শব্দটি এই কারণেই আমার কাছে ব্যর্থ। রেলগাড়ি যেখানে চলিষ্ণু, 'নিঝুম' সেখানে কিছু হতে পারে না। এখানে 'শ্রাবণ-ঘন' কবিতায় তবু পঙক্তিটি বেঁচে যায় 'প্রভাত আজি মুদেছে আঁখি' এই পূর্বপঙক্তিটির জন্য। কিন্তু কিছুতেই বাঁচে না 'নিলাজ নীল আকাশ ঢাকি নিবিড় মেঘ কে দিল মেলে' এই বাক্যের 'নিলাজ নীল' বিশেষণ-চিত্রটি। নিবিড় মেঘে যে-আকাশ প্রথম থেকেই ঢাকা, তার জন্য 'নীল'-বিশেষণটিই বাহুল্য, 'নিলাজ নীল' বাহুল্যের বাড়াবাড়ি। তবে 'নিলাজ নীল'-এর ইংরেজিতে 'ইমমডেস্ট ব্লু' হলে যে একই ভুল হয়ে যায়, অন্তত কবি তা ঠিকই বুঝেছিলেন। তাই তিনি ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'তে নিলাজ নীলকে বাদ দিয়ে ever wakeful blue sky-কে ডেকেছেন। তাতে

কবিতা আরো ক্ষতিগ্রস্ত হল। ever wakeful অতন্দ্র প্রতীক্ষার ছবি হয়ে উঠতে চায় 'গীতাঞ্জলি'-র নিজস্ব লজিকে, তাহলে তাকে আর thick veil-এ ঢেকে দেওয়া কেন? দুবার খুঁড়িয়ে হেঁটেও কবিতাটি কিন্তু সঞ্চারী আভোগ অংশে আশ্চর্য গতি পেল। মুহূর্তে স্পষ্ট হয়ে উঠল কবিতাটির বক্তা। যে কোনো ঈশ্বর-নিবেদনেই স্পষ্ট হবে ভক্ত, এজাতীয় কবিতার রহস্যই তো এই। এখানেও 'দুয়ার দেওয়া সকল ঘরে' এবং 'রয়েছে খোলা এ ঘর মম' এই দুই উক্তির সমাহারে চিরপ্রতীক্ষার একাকীত্ব ধ্বনিত হল। তারপরে 'কবি রবীন্দ্রনাথ'-লেখকের রসগ্রাহী ব্যাখ্যা তো আমাদের মনেই আছে। সে ব্যাখ্যায় সানন্দ সায় দেওয়ায় রসিকেরই তৃপ্ত দায়িত্বমোচন।

'গীতাঞ্জলি'-র মূল সুর প্রতীক্ষা, একথা আমাদের জানাই। তাই কবিতাগুলির অন্তরে বাইরে একটা যোগসূত্র পেল কী করে এ উত্তর খুঁজতে বেশি বেগ পেতে হয় না। যেমন ধরা যাক পাঁচটি কবিতা : ১৬ (মেঘের পর জমেছে), ১৭ (কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো), ১৮ (আজি শ্রাবণ-ঘন-গহন-মোহে), ১৯ (আষাঢ় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল) এবং ২০ (আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার) একই অনুভূতি ও আবেগের মূর্তি। পাঁচটি কবিতাতেই গাঢ় হয়ে আছে মেঘল আঁধার। একটিতে প্রভাতের উল্লেখ আছে, আর একটিতেও দিনের দীর্ঘতার কথা বলা হয়েছে—'কেমন করে কাটে আমার এমন বাদল বেলা'। কিন্তু উপরিতলের গঠনে যাই হোক, গভীরের গঠনে পাঁচটি কবিতাই রাত্রির নিঃসঙ্গতার বার্তা বহন করছে। ১৬ সংখ্যকে যার শুরু, ২০ সংখ্যকে তা চূড়ান্ত কাব্যসীমা পেরিয়ে গেল। 'বাতাস' পাঁচটি কবিতাতেই হাজির। যাঁরা বলেন রবীন্দ্রনাথ একধরনের উপাদান বা প্রসঙ্গ প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ব্যবহার করেছেন, তাঁরাও নিশ্চয় জানেন গুটি কয়েক উপাদানই প্রয়োগের বৈচিত্র্য পেয়ে সহস্রবিধ হয়ে ওঠে। 'পরান আমার কেঁদে বেড়ায় দুরন্ত বাতাসে' বা 'ডাকিছে মেঘ হাঁকিছে হাওয়া' অথবা 'বাতাস বৃথা যেতেছে ডাকি' কি, 'সজল হাওয়া যূথীর বনে' কিংবা, 'আকাশ কাঁদে হতাশ সম' কবিতার দিক থেকেই, ছন্দোগত ধ্বনি হিসাবে, metrical sound হিসাবেই এরা পৃথক পৃথক ব্যঞ্জনা ছড়ায়। 'পরান আমার কেঁদে বেড়ায় দুরন্ত বাতাসে'—প্রতীক্ষা এখানে অধৈর্যে কম্পমান। 'ডাকিছে মেঘ, হাঁকিছে হাওয়া'—প্রতীক্ষার অধীর অবসান। 'বাতাস বৃথা যেতেছে ডাকি'—প্রতীক্ষার প্রার্থী-মূর্তি। 'সজল হাওয়া যূথীর বনে'—শুধুই আবেদনময়। কিন্তু 'আকাশ কাঁদে হতাশসম'—এখানে প্রতীক্ষা অসীমে ছড়িয়ে গেল। ১৬, ১৮, ১৯, ২০-সংখ্যক কবিতার প্রথম পঙক্তিগুলির ধ্বনি-বর্ণও অনুভবের যোগ্য। 'ঝ' 'ধ' 'ঢ়' 'ভ' 'ঘ' এক ধূসরতাকে ঘনিয়ে তোলে।

প্রতীক্ষার সেই ধূসর সান্ধ্য বা নৈশ নিঃসঙ্গতার পটে, তারপরে, বর্ণলেপ শুরু হয়। ব্যক্ত হয় ব্যক্তির যন্ত্রণা। এবং, এই প্রতীক্ষার মূল সূত্রটি তাৎপর্য পায় ঐ ব্যক্তির যন্ত্রণার রূপকে আমাদের সকলের যন্ত্রণাকেই মূর্ত করে বলে। যারা এ যন্ত্রণাকে চিনত না, তাদের কাছেই কবিতাগুলি ছিল দুর্বোধ্য। যাঁরা জেনেছিলেন, আজও জানেন, তাঁদের কাছে এরা বহু-আলোক-সম্পাতী। 'কে রবে এ পরবাসে' এ গানটির কাব্যভাষ্য বিষ্ণু দে করেন এই ভাবে,--'পরবাসে রবে কে এ পরবাসে / আজীবন দীর্ঘ পরবাস। / সেদিন দেশের সত্তা রবীন্দ্র-নাথের দীর্ঘশ্বাসে / সুরের সত্যের নিঃসংশয় উদার অক্ষরে / চিরতরে মূর্তি পেল থেকে থেকে একা ভীড়ে / আবৃত্তির বাণী / রবীন্দ্রনাথের গান হয়ে গেল দেশ সারা দেশ / বিস্তৃত যন্ত্রণা নিজবাসভূমি এই পরবাস দেশ।' 'গীতাঞ্জলি' বা তাঁর গানের কবিতার প্রতীক্ষা সর্বদাই প্রায় এই যন্ত্রণাকে স্পর্শ করে থাকে, অথচ একথাও তো শোনা যায় যে,কনিষ্ঠপুত্রের মৃত্যুর অভিঘাতেই এদের একের পর এক উদ্‌গমন। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের কবিতার 'আমি'-চরিত্রটির কথা একটু ভেবে নেওয়া যাক। এও এক আধুনিক 'আমি'—বিংশশতাব্দীর 'আমি'। তিনি রোমান্টিক কবি, কিন্তু শেলী, বায়রন বা কোনো হুগোর মতো তাঁর 'আমি' কদাচ প্রমীথিয়ুসের ভূমিকায় অগ্নিগ্রাহী নয়, নয় জঞ্জাল অপসারণকারী হারকিউলিস। এই ভাঙাচোরা, কিম্ভূতকিমাকার ঔপনিবেশিক পরিবেশে বুঝি তা সম্ভবও ছিল না। যে-অন্ধকারের কথা ঐ 'আমি' বারে বারে বলেছে, সে-অন্ধকার তার অস্তিত্বের অংশ—প্রত্যক্ষ বাস্তব-ভাষ্য হিসাবে, প্রাকৃতিক অর্থে এবং আলংকারিক অর্থে। ভিত্তিভূমিতে এই বাস্তবতা ছিল বলেই সেই 'আমি'র অচরিতার্থতা ও অকৃতার্থতার আর্তি এক জর্জর ব্যক্তিস্বরূপের আত্মস্বরূপের আত্মসচেতনতাপ্রসূত আকুতি। আকাশে নক্ষত্রের দীপালি সার্থক হবে 'আমার এই আঁধারটুকু ঘুচলে পরে'। এখানে ঐ ভিত্তিতেই দাঁড়িয়ে গেল এক বিশ্ব-নাগরিকের চেতনার সুপারস্ট্রাকচার। 'আমার এই আঁধার' ব্যক্তিগত জটিলতার আঁধার, এক ঔপনিবেশিক যন্ত্রণা-জর্জর ব্যক্তি, যিনি বিশ্বের বৃহৎ নগরীর আলোকসজ্জা দেখেছেন, তাঁরও 'আঁধার', আবার সেটা সভ্যতার অন্তহীন প্রয়াস ও ব্যর্থতার মধ্যবর্তী অন্ধকারও বটে। 'বলাকা'-র সবুজের অভিযান, 'সর্বনেশে' কবিতায় ছায়া ফেলছে ঔপনিবেশিক জীবনের নিঃস্রোত পঙ্করুদ্ধতার বিরুদ্ধে যুবকদের সাগ্নিক প্রয়াসের 'ডানা ঝাপটানি'। 'আমরা চলি সমুখপানে' কবিতাও তা হতে বাধা নেই। কিন্তু ঐ কবিতা যেদিন লিখেছেন তিনি, সেদিনই রাত্রিবেলা লিখেছেন এক 'আঁধার'-চেতনা-সমন্বিত গান—'সন্ধ্যা হল গো—ওমা সন্ধ্যা হল, বুকে ধরো'। সমস্ত গানটিতে যে ক্লান্তির সুর ধ্বনিত

তা ব্যক্তির নিশ্চয়, সামাজিকেরও বটে।[৫] সব সময়ে যে, এমনভাবে বলা যায় না তা জানি। 'এরে ভিখারী সাজায়ে কী রঙ্গ তুমি করিলে' এই গানটি যেদিন লেখা, সেদিনই লেখা, 'এবার ঐ এল সর্বনেশে গো।' তবু ভুলতে পারি না দুটোরই প্রধান চিত্রকল্পে রয়েছে এক বিরাট দুর্জ্ঞেয়কে বধূর মতো বরণ করার ইঙ্গিত।

এবং, এই বিশেষ জীবনের অভিঘাতটি একেবারে মিলিয়ে যায় না বলেই, প্রলোভন সত্ত্বেও, বাইবেলের কদাচিৎ কোনো অংশের সঙ্গে 'গীতাঞ্জলি'-র কোনো অংশের ভাবগত আপাতিক সাদৃশ্য খুঁজতে ইচ্ছে করে না। 'আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে তিনি যেন ফিরে না যান'—এই ভাব ফুটে উঠেছে 'সে যে পাশে এসে বসে ছিল তবু জাগি নি', 'উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে' এই জাতীয় আরো কবিতায়; 'তিনি আসছেন'—এই বার্তা ব্যক্ত হয়েছে 'তোরা শুনিসনি তার পায়ের ধ্বনি' এই কবিতায়। জানি বাইবেলের সেণ্ট ম্যাথু-কথিত গস্‌পেলের সেই বিখ্যাত প্যারাবল, কেউ কেউ ঘুমিয়ে পড়েছিল, বর যখন অর্ধরাত্রে পৌঁছেছিলেন, তার আগেই—And at midnight there was a cry made, Behold the bridegroom cometh ; সন্ত ম্যাথুর প্রভু তাই বারবার বলছেন, Watch ye therefore : for ye know not what hour your Lord doth come. জানি, দুর্যোগের অর্ধরাত্রে দ্বার ভেঙে পড়ার মুহূর্তে তাঁর অতর্কিত আবির্ভাব 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে জানি নাই তো তুমি এলে আমার ঘরে'। জানি, বাইবেলের ডেভিডের Psalms-এর (৫১ সংখ্যক) have mercy upon me...wash me thoroughly from mine iniquity and cleanse me from my sin—এই প্রার্থনাগীতির কথা মনে পড়লেও পড়তে পারে 'গীতাঞ্জলি'-র 'দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে' কবিতাটিতে। ডেভিডের Psalmsগুলিতে যে 'শত্রু' বা রিপু বা enemy-চেতনা কখনো কখনো খর হয়েছে, 'গীতাঞ্জলি'-তে ৮০ এবং ৮১ সংখ্যক গানের মতো রচনায় 'ওরা'-প্রসঙ্গে তার কথা ভেসে উঠতে পারে[৬]। যদিও তা সবই মিলিয়ে যাবে, দেশ কাল ব্যক্তিপাত্রের স্বতন্ত্র বিন্যাসের জন্যই। ডেভিডের Psalms-এ

---

৫. কবিতাটি এবং গানটির রচনার দিনাঙ্ক ৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ সাল। শুধু গানটির বেলায় স্পষ্ট করে বলা আছে 'রাত্রি'।

৬ ১০২-সংখ্যক Psalms-এ Hide not thy face me ..My heart is smitten and withered like grass ..I am like a pelican of the wilderness—ইত্যাদিকে আমি মেলাতে চাইছি না 'গীতাঞ্জলি'র 'অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না' কবিতার 'জানি আমার কঠিন হৃদয়' 'দেশ বিদেশে কতই ঘুরি' প্রভৃতি অংশের সঙ্গে। 'ব্যর্থ তৃণ' এবং 'না-ফোটা' ফুলের কথা দুজায়গাতেই থাকলেও চাইব না।

থাকল sin বা পাপের কথা।' রবীন্দ্রনাথের কবিতায়, গানে বারে বারে গ্লানি, মলিনতা এবং অন্ধকারের কথা। ঔপনিবেশিক জীবনের গ্লানিই এসব ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তিকে পীড়িত করেছে। যদি কারো মনে হয় এই সুদূর সম্পর্ক কষ্ট-কল্পিত, তাহলে কবিজীবন থেকে আমি একটি উদাহরণ উপস্থিত করি। তাঁর সামাজিক সত্তাই যে তাঁর কবিতার চরিত্রকল্পনার বৈশিষ্ট্য সম্পাদন করে, অন্তত কতকাংশে তার পরিচয় পাই 'কাঙালিনী' কবিতার রবীন্দ্রকৃত ব্যাখ্যায় 'এ তো আমার নিজেরই কথা। যে-সব সমাজে ঐশ্বর্যশালী স্বাধীন জীবনের উৎসব সেখানে সানাই বাজিয়া উঠিয়াছে, সেখানে আনাগোনা কলরবের অন্ত নাই; আমরা বাহির-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছি মাত্র—সাজ করিয়া আসিয়া যোগ দিতে পারিলাম কই'[৭]। যে-প্রতীক্ষার কথা আমরা রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'-র গানের কবিতার মূলভাব বলে ব্যাখ্যা করছি সে প্রতীক্ষাও তাৎপর্য পায় এই আমাদেরই ভারতবর্ষীয় বিশশতকীয় জীবনপটে। আমি এতক্ষণ যা বলতে চেষ্টা করছি, তিনি অব্যর্থ ভাষায় সংক্ষেপে সেটা বলে দিলেন ঃ

> মানুষের বৃহৎজীবনকে বিচিত্রভাবে নিজের জীবনে উপলব্ধি করিবার ব্যথিত আকাঙ্ক্ষা, এ যে সেই দেশেই সম্ভব যেখানে সমস্তই বিচ্ছিন্ন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃত্রিম সীমায় আবদ্ধ। আমি আমার সেই ভৃত্যের আঁকা খড়ির গন্ডির মধ্যে বসিয়া মনে মনে উদার পৃথিবীর উন্মুক্ত খেলাঘরটিকে যেমন করিয়া কামনা করিয়াছি, যৌবনের দিনেও আমার নিভৃত হৃদয় তেমনি বেদনার সঙ্গে মানুষের বিরাট হৃদয়লোকের দিকে হাত বাড়াইয়াছে। সে যে দুর্লভ, সে যে দুর্গম দূরবর্তী।[৮]

এরই জন্য পথে নামা, এরই জন্য অপেক্ষা। 'গীতাঞ্জলি' এবং অন্যত্রও যেসব গানের কবিতায় প্রতীক্ষাই প্রধান ভাবনা, সেসব কবিতার গঠনেও এক বৈশিষ্ট্য এসেছে। গানের দিক থেকে চার ভাগ, কিন্তু কবিতার দিক থেকে দুই অংশে সম্পূর্ণ, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লিরিকগুলিতে সনেটের সঙ্গে তুলনীয় সংহতি ও বিস্তৃতি, ছড়িয়ে দেওয়া ও গুটিয়ে নেওয়া, সংবৃতি ও বিবৃতি রূপবন্ত হয়ে উঠেছে। কোনো কোনো কবিতায় বাইরে থেকে ভিতরে আসা, কোনো কোনো কবিতায় ভিতর থেকে বাইরে যাওয়া। 'আর নাইরে বেলা নামল ছায়া ধরণীতে' কবিতাটিতে প্রথমাংশে আত্মকথা, দ্বিতীয়াংশে আত্মমুক্তি। 'শ্রাবণ-ঘন-গহন-মোহে' কবিতাটিতে প্রথমে ভাবের বিস্তার, পরে তাকে সংবৃত করে আনা। 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার' কবিতায় প্রথমে সংবৃতি, পরে বিস্তার।

---

৭ জীবনস্মৃতি। কড়ি ও কোমল

৮. ঐ। ঐ

তিনবার 'ও' অন্ত্যমিলগুলি পর পর ব্যবহৃত হয়ে ব্যবধান বা দূরত্ব-কল্পনাকে অসীমে পৌঁছে দিয়েছে।[৯] আরো উদাহরণ শুধু সংখ্যাই বাড়াবে। এই কাঠামো যে-সব ক্ষেত্রে রক্ষিত হয়নি, সেখানে কবিতাটি প্রথম উচ্চারণ থেকে শেষ শব্দটি পর্যন্ত হয়ে উঠেছে একটি ভাববৃত্তের চারপাশে একই রঙের কয়েকটি পাপড়ি। প্রসঙ্গত 'ঘুমের ঘন গহন হতে' কবিতাটি আমরা স্মরণ করতে পারি। আবার এই দুই কাঠামো যে-চিত্রকল্প-রীতিকে উৎসাহিত করেছে তাও অনুধাবনীয়। কোনো কোনো কবিতায় প্রধান চিত্রকল্পটি প্রথম চরণে বা প্রথম দু-এক পঙক্তির মধ্যেই ফুটে উঠেছে, বাকি কবিতাটি চিত্রকল্পটির ধারক। এর নিদর্শন বহু—'আজ আলোকের এই ঝর্ণাধারায়' দিয়ে শুরু করা যায়, সহজে শেষ হবে না তালিকা। আবার কতকগুলি কবিতায় অন্ত্য-চিত্রকল্পটিই প্রধান, সারা কবিতাটি ছিল এরই বাহক। স্মরণ করতে পারি 'আমার এ আঁখি উৎসুক পাখি ঝড়ের অন্ধকারে।' এখানে সমস্ত কবিতাটিই ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে ঐ চিত্রকল্প। স্মরণ করতে পারি 'সহসা নবীন উষা আসে হাতে আলোকের ঝারি / দেয় সাড়া ঘন অন্ধকারে।' এবং এমন আরো কত।

এ এক অনিবার্য অনুভূতির জগৎ। এখানে এক অভিনব আধ্যাত্মিক বিপরীত-বিহারের পুলক ধ্বনিত 'অসীম ধন তো আছে তোমার' কবিতায়; বিপরীত অভিসার যা কোথাও প্রশ্রয় পায়নি, ধ্বনিত হল 'আমার মিলন লাগি' ও 'ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার' কবিতায়। এই 'নীরব' এমন এক অস্ত্যর্থক 'নীরব'-এর প্রসঙ্গও অবার্য হয়ে উঠল এখানেই। শব্দাবিরল বাক্যগুলি সেখানে নীরবতার কোল ঘেঁষে চলে যায়। নীরবতা সেখানে নিশীথিনীর মতো ছায়াশরীরিণী—'নিশায় নীরব দেবালয়' সেখানে প্রায় ব্যক্তিপ্রতীক (৩১), 'নীল আকাশের নীরব কথা' (৩৮) সেখানে সাধারণ ব্যাপার, সেখানে নীরবতাই প্রার্থিত হল কথায় (৫৯)। 'ধূলায় লুটানো নীরব বীণা' অনাহত কী আঘাতে বেজে উঠবে—এই প্রতীক্ষা। এক মহানীরবের উদ্দেশ্যে ধ্বনিত অনুযোগ 'ওগো মৌন না যদি হও না কইলে কথা' মনে রাখি। 'ঢেউয়ের মতো ভাষা-বাঁধন-হারা' রাগিণী যাকে শোনানো হবে, তিনিও নীরব হেসে তা

৯. আমি মানতে পারি না কবিতাটি সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসুর আর-একটি মন্তব্য, "কবিতাটির প্রথম স্তবকে 'যে' অব্যয়ের পুনরুক্তি প্রীতিকর নয়"। এরকম ক্ষেত্রে 'যে' বাংলা কথ্য ভাষার নিজস্ব চালে এক অনুযোগের সুরকে আভাসিত করে, তার মাধুর্য বুদ্ধদেব বসুর কান এড়িয়ে যাওয়া উচিত হয়নি। আর একটি কথা, frowning forest বা mazy depth of gloom অনুবাদ হিসাবে 'গহন কোন্ বনের ধারে। গভীর কোন্ অন্ধকারে'-কে প্রতিবিম্বিত করতে পারছে কিনা তর্কের বিষয়—কিন্তু ইংরেজিতে যে ছবি দুটি আমরা পাই তা কি রবীন্দ্রনাথের ছবির জগতের পূর্ব-ইঙ্গিত নয়?

তুলে নেবেন শ্রবণে। এবং কী আশ্চর্য, কবি যখন বলেন 'নীরব যিনি তাহার পায়ে নীরব বীণা দিব ধরি', তখন দুই 'নীরব'-এর দুই প্রকারের অসীম ব্যঞ্জনা আমাদেরও টেনে নিয়ে যায় সেখানে, 'সেই অতলের সভামাঝে'। আর সবই, সব কথাই, যেন বিরলে কথনের উপযুক্ত কথ্যস্রোতে প্রাণবন্ত, হৃদ্য অথচ উচ্ছ্রিত বাক্য। কিন্তু শুধু গেয় সুরেই নয়, কথাতেও সে-অতলকে মূর্ত করতে পেরেছেন বলেই সেগুলি কবিতা। এমন কবিতার কথা আমাদের মনে আছে যেখানে কোনো প্রসাধিত বাক্যই নেই, নেই কোনো সচেতন চিত্রকল্প, কিন্তু যা বিশুদ্ধ আবেগের মূর্তি হতে পেরেছে কেবল পরিমিতির জন্য। হয়তো এমন কবিতার উদাহরণ 'অনেক কথা বলেছিলাম কবে তোমার কানে কানে'। উল্টো উদাহরণও আছে, যেখানে বুঝি পরিসরের স্বল্পতার জন্য জটিল চিত্রকল্প কবিতাটিকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে, স্মরণ করতে পারি—'আমার নয়ন তব নয়নের নিবিড় ছায়ায় মনের কথার কুসুমকোরক খোঁজে'। গানের দিক থেকে চিত্রকল্পের ঋদ্ধ সমাবেশ আমাদের মনোযোগ খণ্ডিত করে ফেলার আয়োজন ঘটালে সেটাও হয়ে ওঠে সমালোচনার যোগ্য। 'আরো কিছুখন না হয় বসিয়ো পাশে' কবিতাটির প্রথমাংশে—গানের দিক থেকে প্রথম দুই ভাগেই, দুটো রূপান্তরণী চিত্রকল্পের ব্যবহার ঘটেছে—১. 'শরৎ আকাশ হেরো ম্লান হয়ে আসে / বাষ্প আভাসে দিগন্ত ছলোছলো' এবং ২. 'সে মোর অগম অন্তর পারাবারে/রক্তকমল তরঙ্গে টলোমলো'। তৃতীয়টি এসেছে আবার শেষকালে, 'সে বাণী আপন গোপন প্রদীপ জেবলে / রক্ত আগুনে প্রাণে মোর জবলো জবলো'। তিনটি চিত্রকল্পের প্রথমটি প্রাকৃতিক পরিবেশের ছলে আত্মকথা হলেও ছবিটি প্রকৃতির। দ্বিতীয়টি প্রেমের, যে প্রেমের স্বরূপব্যাখ্যা হিসাবে ঐ চিত্রকল্পের উদয়। তৃতীয়টি সব শেষে এসেছে অনুক্ত বাণীর উপমারূপে। এর আলোচনার উপযুক্ত ক্ষেত্রে কাব্যের আসর। সেখানে কিন্তু দেখতে দেখতে কবিতাটি শরীর পায়। প্রথম চিত্রকল্পটি গাঢ় করে তোলে সন্ধ্যার ঘনিয়ে আসা ছায়া। 'রক্তকমল' পাবাবারের সংযোগে সন্ধ্যার রক্তিম আলো ছড়ায়। শেষ চিত্রকল্পটি সন্ধ্যাকে গাঢ় করে, অন্ধকার জমিয়ে, জবালিয়ে দিল প্রদীপ। সেই প্রদীপটিই কবিতার শেষ কথা।

গানের কবিতার বিশিষ্ট কুহক উপলব্ধির উপযুক্ত উপাদান খুঁজে পাই সেই সব কবিতায়, অনুভূতি যেখানে শব্দ-সংযোগের রহস্যেই আনন্দের উৎস। 'খোলো খোলো দ্বার রাখিয়ো না আর' গান-কবিতাটি কবিতা হিসাবেও পাঠ্য। কবিতা হিসাবে প্রথমাংশের দীর্ঘ স্বর-সমাবেশ আকুল আহবানেরই ধ্বনিপ্রতীক। দ্বিতীয়াংশে সে স্বরধ্বনি অনেকটা সংবৃত। প্রতীক্ষা সেখানে প্রায় প্রাপ্তির

কাছাকাছি। এবং সমগ্র গান কবিতাটিকে ধরে রেখেছে, উজ্জ্বল করে তুলেছে, অর্থকে গূঢ়তা ও ব্যাপ্তি দিয়েছে একই সঙ্গে, এই কেন্দ্রীয় চিত্রকল্প—'আলোকের খেয়া হয়ে গেল দেয়া অস্তসাগর পারায়ে'। এই কুহক অকাট্য হয়ে ওঠে 'বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা'-র মতো রচনায়। পেয়ালার রূপক নয়—যেমন পেয়েছি 'আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া' কবিতায়। পেয়ালাটাই এখানে বিষয়। সে এখানে রূপকের প্রসাধিত পরিসরকে না ছুঁয়ে একেবারে বাস্তবের পেয়ালাই থেকে গেছে। থেকে গিয়েও অসামান্য হয়েছে সে শেষের আকিঞ্চনে—'এ রসে মিশাক তব নিঃশ্বাস/নবীন উষার পুষ্প সুবাস।—এরই 'পরে তব আঁখির আভাস দিয়ো হে দিয়ো'। 'আঁখির আভাস' অর্থান্তর সৃজনে আধুনিক কবিতা। এমনি কবিতা 'কী ফুল ঝরিল বিপুল অন্ধকারে'। একটা নাতিস্ফুট বেদনা এই কবিতায় বুঝি দেহ পেয়েছে সব শেষে প্রথম চিত্রেই। 'এসে ফিরে গেল বিরহের ধারে ধারে' যেন ভাষারও ভাষাতীতের দ্বারে এসে করাঘাত। এমনি, 'আমি যখন তাঁর দুয়ারে ভিক্ষা নিতে যাই' কবিতার শেষ ভাগ। এমনই স্মরণীয় 'চাঁদ জোয়ার' 'সেতু : নৌকা পারাপার' কি, 'ছিন্ন বীণা বা গানের আসরের চিত্রকল্প, 'আলো অন্ধকারের' চিত্রকল্প, খেলা-খেলাভাঙার ছবি। এবং শুধু আলোর পিপাসা নয়, এক অনন্তভাষী অন্ধকারের পিপাসাও ছিল তাঁর আধুনিকের মতোই। আলোও যে একটা আড়াল, একথাও তিনিই প্রথম বলেছেন—'আঁখি হতে অস্তরবির আলোর আড়াল তোলো'।

দুরূহতা ও আধুনিকতা। ১৯৩৬-৩৭

এক

আধুনিক কবিতা দুরূহ কিনা এ প্রশ্ন, দেখা যাচ্ছে সংবাদের ছলেও এখনো উত্থাপিত হয়। আমার জানতে ইচ্ছা হয়, জীবনানন্দের বিড়ালকে তাঁরা সহজেই বোঝেন জানেন চেনেন কি না? কিম্বা অনায়াসে উপলব্ধি করেন কিনা সুবিনয় মুস্তাফির মতো ভূয়োদর্শী যুবার দর্শনকে? বিষ্ণু দে-র 'অপস্মার' কবিতার 'কোনো বিচিত্রবীর্য কি/পূর্বজ কোনো দশরথ'—এই স্তবকের তাৎপর্য তাঁদের কাছে অবশ্যই দুরূহ বলে পরিগণিত হবে। মনে হয় কবিতা সম্বন্ধে একটা বাঁধাধরা সূত্র রচনার অভাব খেয়াল আমাদের আজও যায় নি। তা নইলে আমরা একথা বুঝব না কেন যে, কোনো কবির ত্রয়ী দুরূহতার—শাব্দ, আর্থ এবং অন্বয়গত—যে কোনো একটিরও প্রকৃত উৎপত্তিস্থল সেই কবির মনোলোকে নয়—সেই কবির অভিজ্ঞতায়। এবং কাব্যপাঠ যেহেতু কবি ও পাঠক উভয়েরই আত্মীয়তা স্থাপনের প্রয়াস ও ফল দুইই, আত্মীয়তা যেহেতু কুটুম্ব সম্ভাষণের মতো ক্ষণস্থায়ী সৌজন্যের আসন রচনা নয়, সেই হেতু উভয়ের অভিজ্ঞতা সমধর্মী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কবিতার ক্ষেত্রে, অবাক লাগে, দুরূহতার প্রশ্ন দেখা যাচ্ছে এখনো ওঠে—আজ চল্লিশ বছর রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার সান্নিধ্যে কাটিয়েও এখনো আমরা জিজ্ঞাসা করতে ভালবাসি কোনো কবি 'দুরূহ' কিনা। আমাদের তো এই এক আশ্চর্য প্রশ্নকেই দেখা আছে নানা ভাবে। মধুসূদনের রাবণ এবং তাঁর ছন্দ দুইই একদা ছিল অনেকের কাছে অগম্য, রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা একদা প্রায় চিহ্নিত হয়েছে অর্থহীন বলে। ইচ্ছা হলেই স্মরণ করতে পারি 'সাহিত্য' সম্পাদকের 'আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে'র আলোচনা। বিস্মিত হতে পারি এই সব মন্তব্যে—"চরণ কেমন করিয়া গোপন হইল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সাপের পা গোপন বটে। কিন্তু এ গোপন চরণ কাহার? পরে আছে 'নীলাজ নীল আকাশ'। 'নিলাজ নীল' কি বুঝিতে পারিলাম না।"* বুঝতে পারেন নি ঐ সম্পাদক 'নিশীথে' কবিতার 'হৃদয়ভরা অশ্রুভারে'র অন্বয় বা অর্থ। বলাই বাহুল্য মধুসূদনের দুরূহতা আর রবীন্দ্রনাথের দুরূহতা এক নয়। কিন্তু এক না হলেও একথা বলা যায় যে দুই কবিরই দুরূহতার উৎস দুই কবির তৎকালগত আধুনিকতা—যে আধুনিকতা না থাকলে তাঁরা কিছুতেই নিজ নিজ সময়কে ছাড়িয়ে পাড়ি দিতে

* সাময়িক পত্রে রবীন্দ্র প্রসঙ্গ—নন্দিনী চৌধুরী।

পারতেন না। এবং লক্ষ্য করবার বিষয় যে সেদিন তাঁরা দুরূহকে সরল করার দিকে নজর দেন নি বলেই আমরা দীক্ষিত হতে পেরেছি ঐ সব কবিতার মন্ত্রে —আজ আর ওরা কেউই কঠিন নয়, থাকল না।

আসলে কোনো যথার্থ কবির কাছেই কাব্যে বোধ্য হবার সমস্যাটা একটা সমস্যাই নয়। তিনি বোধ্যতার উপাসক হতে চাইলে সংবাদপত্রের ফিচার লিখতে পারেন—কবিতা নয়। বোধ্যতা অপেক্ষা 'সত্য' একজন কবির কাছে সব সময়েই অগ্রাধিকার পায়। সত্যের দিকেই তাঁর লক্ষ্য থাকে বলে ব্যক্তি ও বিশ্বের সম্বন্ধকেই তিনি তাঁর অহং-মুক্ত 'আমি'র মাধ্যমে প্রতিফলিত করেন।

দুই

তথাকথিত স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতা আলোচনাকালে একথাটা মনে রাখা দরকার। এটা আধুনিকতার সংগে সম্পৃক্ত। সত্যেন্দ্রনাথের ইন্দ্রিয়-সচেতনতা থেকে জীবনানন্দের কবিত্ব সংগ্রহ করেছে বর্ণময় জগৎ সম্বন্ধে প্রাথমিক আগ্রহ। কীটসীয় ইন্দ্রিয়বেদিতা তাঁর কবিতায় স্পষ্টতা পেল 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-তে এবং সেই ইন্দ্রিয়সজাগ মনোভাব ইয়েটসীয় প্রতীক-নির্ভর চিন্তাপ্রধান মানসিকতায় উপনীত হয়েও সম্পূর্ণ বিদায় নিল না। তেমন কথা কিন্তু জীবনানন্দের সত্যেন্দ্র-নির্ভরতা সম্বন্ধে বলা যাবে না। সত্যেন্দ্রনাথ যাই দিতে পারুন, সেই কীটসীয় প্রশান্ত mellowness দিতে পারতেন না। জীবনানন্দীয় জগতে অবশ্য সে mellowness আপন কালগত নিয়মে ও কারণেই স্মৃতিমাত্র—এক ধূসরতায় তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন স্বাভাবিক বর্ণচ্ছায়া। মেলো ফ্রুটফুলনেশের চেতনা থাকলেও এক বিনষ্টির বোধ জীবনানন্দের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-র পাতায় ম্লান গোধূলির রচয়িতা। জীবনানন্দের প্রাথমিক পদচারণার দিন থেকেই একথাটি স্পষ্ট হতে শুরু করেছে যে এই ধূসরতা যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ধূসরতা থেকে পৃথক, এ ইন্দ্রিয়সচেতনতাও সাত্যেন্দ্রীয়-মাত্র নয়, নয় দেবেন্দ্রনাথ থেকে মোহিতলাল পর্যন্ত সঞ্চারী ইন্দ্রিয়পরতা। যে বোধের সাহায্যে জীবনানন্দ হতে পেরেছিলেন—শুধু বিংশশতকীয় নয়, উত্তর-সামরিক, সেই বোধের বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ের মাধ্যমেই তাঁর কাব্যের সঙ্গে বাংলা কাব্যের পালাবদলের সংযোগ এবং দূরত্ব কোথায় তা জানা যাবে। তাঁর ভ্রান্তিকর সরলতার ছদ্মবেশকেও চেনা যাবে।

তাঁর প্রথম কাব্য 'ঝরাপালক'-এর নামকরণের মধ্যেই রয়েছে এক উত্তর-সামরিক উদ্যমহারা ধূসরতা। 'ঝরাপালক' বিনষ্টির প্রতীক। যে বিমর্ষ

শূন্যতা জীবনানন্দীয় সকল অনুভূতির শিয়রে এসে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়েছে 'ঝরাপালক' নামটির মধ্যে তার ইঙ্গিত দুর্লক্ষ্য নয়। কোনো কোনো কবিতা বিশেষভাবে মনে করিয়ে দেয় যতীন্দ্রনাথের অশ্রুপরায়ণতাকে। তখনো সে সব অশ্রুর ফোঁটা তাঁর হৃদয়ের কঠিন বন্ধনে থেকে থেকে বৈরিন মুক্তোর মতো নিটোল হয়ে উঠতে পারেনি। 'কীটের বুকেতে সেই ব্যথা জাগে আমি সে বেদনা পাই'—এই ধরনের বেদনার ছদ্মবেশ পরিহিত জীবনবোধ—যা যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মানসিকতার একাংশকে স্মরণ করিয়ে দেয়—সে সময়ে কবি জীবনানন্দের কবিতায় মাঝে মাঝেই দেখা দিয়েছে।

কিন্তু তা হলেও তখনো জীবনানন্দের কবিতার 'আমি' এক গভীরতা-বিশিষ্ট প্রতীক-সন্ধানী 'আমি'-তে রূপান্তরিত হয় নি। তার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হ'ল 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-র হেমন্তের প্রতীকের জন্মলগ্ন পর্যন্ত। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-তেই জানা গেল, এ এক আগন্তুক কণ্ঠস্বর। এও জানা গেল যে এ অনুবর্তীদের কেউ নয়। এবং সেই উত্তর-সামরিক বাংলাদেশে বস্তুজগৎ যেখানে আপন বন্ধ্যাত্বে বিবর্ণ, অথচ সেখানে বস্তুর চাপ বর্ধমান, সেখানে জীবনানন্দই প্রথম ফিরে তাকালেন আপন অনির্ণেয় মানসগহনে, ব্যক্তিবই অনাবিষ্কৃত এবং অনাস্বাদিত নৈঃসঙ্গ্যে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-র জগতে কলকাতা নেই। জীবনানন্দ শুরু করেছিলেন গ্রাম প্রকৃতির ম্লান আলোয়— শেষ করেছেন কলকাতার অন্তর্গত কল্লোলিনী তিলোত্তমার পরমা প্রত্যাশায়। আর একজন তাঁর বয়ঃকনিষ্ঠ অথচ প্রধান কবির সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁর পার্থক্য স্মরণীয়। বিষ্ণু দে যাত্রা শুরু করেছিলেন কলকাতার তাৎকালিক স্বগত জটিলতা থেকে, কিন্তু সে যাত্রা অচিরে বাংলাব গ্রামীণ পটপরিবেশে এবং লোক সংস্কৃতির এবং লোকায়ত সংগ্রামের সাযুজ্যে খুঁজে পেয়েছে দ্বিতীয় গতিবেগ। সংস্কৃতির সীমান্তহীন জগতে স্থিতপ্রজ্ঞ বিষ্ণু দে-র গতিময়তা এবং জীবনানন্দের পরিস্নাত তন্ময়তার মধ্যে প্রভূত ব্যবধান। এবং এই ব্যবধানের ফলেই দুই কবির 'আমি'-র মধ্যেও এসেছে নানা স্তর-বৈষম্য। তার ফলে বহু লাভ কৃতজ্ঞ পাঠকের।

'আমি'-কে তার প্রাপ্ত চতুঃসীমার বাইরে নিয়ে যেতে চাওয়া আধুনিকতার লক্ষণ। জীবনানন্দের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-র 'আমি' এবং প্রাক্-জীবনানন্দ বাংলা কবিতার 'আমি'-র মধ্যে মিল অমিলের প্রশ্নটা এখানেই মীমাংসার যোগ্য যতীন্দ্রনাথ বা সমসাময়িক অচিন্ত্যকুমার বা প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় আমরা যে মন্ময় সত্তার কাছে দায় সমর্পণ দেখি, জীবনানন্দের ভারার্পিত 'আমি' তার থেকে বড়ো। এ 'আমি' অভ্রান্ত পরিণাম এক সময় প্রভাবের—কিন্তু সময়

চেতনার নয়। জীবনানন্দের 'আমি' যতীন্দ্রনাথ বা অচিন্ত্যকুমার বা প্রেমেন্দ্র মিত্র এমন কি অমিয় চক্রবর্তী বা বুদ্ধদেবের 'আমি' অপেক্ষা অসহজ, আপাত-সরল হলেও জটিল। জীবনানন্দই আধুনিক অর্থে এ কথাটা বুঝেছিলেন যে, কবিতা রচনার দায়িত্ব অপেক্ষা তার দায়িত্ব-প্রতিশ্রুতি আরো বড়ো। তাঁর দায়িত্ব উদ্ঘাটনের, আবিষ্কারের। এই দায়িত্বের প্রেরণা থেকেই জীবনানন্দ হয়ে উঠেছেন প্রতীক সন্ধানী শব্দের অমেয় শক্তিতে বিশ্বাসী। বিশ শতক যত ধূসর হয়ে উঠেছে তাঁর চোখে, যত বস্তুর বাস্তবতা তাঁর কাছে ক্ষীণ হয়েছে, যত তিনি ইয়েট্‌সের মতই সময়ের দ্বারা সৌন্দর্যকে হতে দেখেছেন প্রহৃত --ততই তিনি আপন আন্তর গহনের এক বাস্তবতায় প্রত্যয়শীল হয়েছেন। এই উপলব্ধি অনেকটাই জীবনানন্দকে নিয়ে গেছে পেটারীয নন্দনতত্ত্বের কাব্যময় পরিণতিতে। স্থূল বস্তুজগৎ আমাদের সৌন্দর্যবোধকে আঘাত হানে। সমসাময়িক আর একজন কবি সুধীন্দ্রনাথ এবং জীবনানন্দেব মধ্যে সাদৃশ্যের সূত্রটুকুও এক্ষেত্রে অনুধাবনীয়। দুজনেই সময় প্রদত্ত এই স্ববিরোধটিকে অনুভব করেছিলেন যে, সৌন্দর্যের জন্য বা চারুকলার জন্য বেঁচে থাকার বা জীবনকে নন্দননির্ভর অভিজ্ঞানে চিহ্নিত করার প্রয়াসের কোনো মানেই হয় না—অন্তত সেখানে কোনো মানেই হয় না, যেখানে সবই সময়ের হাতে প্রহৃত। সুধীন্দ্রনাথের বর্বরের দল এবং জীবনানন্দের সময় নামক ছেদনাস্ত্রধারী কৃষক যেন সেই সৌন্দর্যবোধ ও সময়ের বৈপরীত্যের দিকেই অঙ্গুলী নির্দেশ করল। সুধীন্দ্রনাথ এবং জীবনানন্দ দুজনেই সেদিন কাব্যের ফর্ম-এ যে ব্যত্যয় ঘটিয়েছেন,—বাক্যের, শব্দের যে ভাঙচুর করেছেন, তা করতে হয়েছে সময়ের এই অভিঘাতকে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে। ভাবগত, অন্বয়গত নানা জটিলতা এ পথেই সৃষ্টি হল। এই পটভূমি এবং ইতিহাসগত কারণকে আমল না দিয়ে কবিতাকে যাঁরা সরলাঙ্কের উত্তর ভাবেন তাঁদের কাছেই কবিতা দুভাগে বিভক্ত—সোজা অথবা শক্ত। অন্যদের কাছে শুধু কবিতাই আছে। সেখানে সত্যের মুক্তাকেই পাওয়া যায় চিত্রিত ঝিনুকের মধ্যে।

তিন

কবে থেকে. অন্ততঃ বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে, এসেছে দুর্বোধ্যতার বা দুরূহতার অভিযোগ সে বিষয়টা লক্ষ্য করলে স্পষ্ট হয় আধুনিকতার পদচিহ্ন। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে যেদিন এ অভিযোগ উচ্চারিত হয়েছিল সেদিনের

সময়-চরিত্র স্মরণীয়। পরিবর্তিত বহির্বাস্তবতা যেদিন থেকে ব্যক্তিকে করে তুলেছে মর্ততৃপ্তির সন্ধানেই বহির্মুখী—কবিরা সেদিন থেকেই আবিষ্কার করতে চেয়েছেন অনুদ্ঘাটিত আন্তর রহস্য। এ দেশে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি বিশেষ তাৎপর্য পেল বলেই তাঁর বাক্যের অন্বয় তাঁকে গড়ে নিতে হল, তাঁর শব্দকে তিনি সমৃদ্ধ করে তুললেন অন্যতর অনুষঙ্গে। জন্ম নিল তথাকথিত দুরূহতা। তাঁর কালজ এবং দেশজ জটিলতার পটেই সেদিন রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন উত্তর-শিল্প-বিপ্লব অনন্বয়ের এক রূপ। এর সঙ্গে একজন মহৎ মানবিকের মতোই দ্বন্দ্বে রত হয়ে কবি গড়ে তুলেছেন তাঁর শব্দ, অন্বয়, প্রতীক, উপমা। 'সাহিত্য' সম্পাদক 'নীলাভ নীল'-এর অন্বয় বুঝতে পারেন নি। এই দুয়ের অন্তর্গত নগ্নতার অসহ্য উজ্জ্বলতার যে নিহিত চিত্রকল্প তা নিঃসন্দেহে বাংলা কবিতার নতুন ভাষা। এ নতুন ভাষা কবিতা রচনার অভিমান থেকে জাত নয়—জীবন থেকে গূঢ়ার্থ নিষ্কাশনের অভীপ্সা থেকে জাত এই ভাষা। দৃশ্যমানের অন্তরাল থেকে গাঢ়তর ও গূঢ়তর বাস্তবতাকে আবিষ্কারের প্রেরণাজাত এই ভাষা। তাই এ ছিল দুরূহ। এবং তাদের কাছেই এ ছিল দুরূহ যারা হতে চায়নি অন্তরের অভিজ্ঞতায় অবগাঢ়, যারা দৃষ্টির বাইরে দেখতে চায়নি।

কবিতায় দুরূহতা আসে কবিতার 'আমি'-র পরিধি-বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে। 'গীতাঞ্জলি'-র 'আমি', 'বলাকা'-র 'আমি', এবং 'নবজাতকে'-র 'প্রশ্ন' কবিতার 'আমি'-র পরিধি ক্রমশ বেড়েছে। রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতার স্তর পরম্পরায় 'আমি' হতে চলেছে বিংশ শতকের 'আমি'। নিজের চলিষ্ণু মন্ময় সত্তার উপর নির্ভরতা বেড়েছে—আর যতই তা বেড়েছে ততই তাঁর 'আমিত্বে'-র পরিধি বেড়েছে, গভীরতা বেড়েছে। এবং ততই কবিতার প্রকরণে পড়েছে তার প্রভাব। 'বলাকা'-'পলাতকা'-য় নিয়মিত শ্লোক-বন্ধন পরিহার, লিপিকায় কবিতার অবয়বে ও মুদ্রিত বিন্যাসে গদ্যরূপ, পুনশ্চে ছন্দোমুক্তি সবই সেই বর্ধিত-পরিধি 'আমি'-র সঙ্গে শিল্পের অভিঘাত ও অভিযোজনের ফল।

জীবনানন্দ যেদিন 'মৃত্যুর আগে' কবিতায় স্তবকের পর স্তবকে রচনা করেছেন অসমাপ্ত বাক্য, অথবা 'কয়েকটি লাইন' কবিতার মুদ্রিত বিন্যাসে তিনি যখন প্রচলিত রীতির বদলে বাঁদিকের মার্জিনকে হেলাফেলায় ভেঙেচুরে ডানদিকের মার্জিনকে রেঞ্জ করেন, তখন তিনিও আরেক গভীরতর 'আমি'-কেই তাঁর কবিতায় উদ্ঘাটিত করতে চান। জীবনানন্দের মন্ময় সত্তা তথা তাঁর 'আমি' যে অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র মিত্র বা বুদ্ধদেব বসুর 'আমি'

থেকে গভীর গাঢ়তায় চিহ্নিত, তা বুঝতে পারা যায় এই আগন্তুক কণ্ঠস্বরের ধ্বনিতে, বোঝা যায় এই সব প্রথানিরপেক্ষ বাণী-সন্নিবেশ বৈশিষ্ট্যে ঃ—

হলুদ পাতার মত,—আলেয়ার বাষ্পের মতন,
ক্ষীণ বিদ্যুতের মত ছেঁড়া-মেঘ আকাশের ধারে,
আলোর মাছির মত—রূপের স্বপ্নের মত মন
একবার ছিল ঐ পৃথিবীর সমুদ্রে পাহাড়ে—
ঢেউ ভেঙে ঝরে যায়—মরে যায় -- কে ফেরাতে পারে !

—'জীবন', ধূসর পাণ্ডুলিপি ।

অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটা কথা উল্লেখযোগ্য যে 'জীবন'-কবিতার এই ২৪ সংখ্যক স্তবকটি ৩৩ সংখ্যকে পুনরাবৃত্ত হয়েছে—শুধু 'পাতার' বিশেষণ বদল হয়েছে—যা ছিল 'হলুদ' তা হল 'নির্জন'। সময়ের হাতে সব হারালে ঘনিয়ে আসে নির্জনতা। এই কুহকী স্তবকটির উপমাগুলি মৌলিকতায় শক্তিমান বলেই এ কাব্য অভিনবত্বের দাবিদার নয় —সব উপমা ক'টি মিলে এখানে বিরচিত এক কবিভাষা, সে ভাষার মূল অর্থ হল সময়ের হাতে নিহত মনের জন্য, অস্তিত্বের সমুদয় বিপন্নতার মধ্যেও সৌন্দর্যের জন্য শোক। এই অভিনব এলিজি আমাদের জীবনের প্রথম উত্তর-সামরিক অভিজ্ঞতাকেই স্পর্শ করতে চেয়েছে। এ এক জগৎ ভাঙ্গাগড়ার অভিজ্ঞতা। অথচ সেদিনও জীবনানন্দ বাক্যের অন্বয়কে ভাঙেন নি। সেদিনও তিনি তাঁর শব্দার্থের মধ্যে নবসম্পর্ক সৃজন করেন নি। তাই প্রথমেই তাঁকে দুরূহতার অভিযোগে চিহ্নিত হতে হল না। কিন্তু সাধারণ পাঠক সহসা উপলব্ধি করতে পারেনি জীবনানন্দের নিয়তিবোধ। জীবনানন্দের অভিমতে সময়ই নিয়তি। এবং জীবনানন্দের কবিতায় যে-আগন্তুক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়েছে, যা তাঁকে বুদ্ধদেব বা অচিন্ত্যকুমার, কি যতীন্দ্রনাথ বা সত্যেন্দ্র-নজরুল থেকে স্বাতন্ত্র্য দিল, তা এই নিয়তিবোধ। যথা—

ক. মেঠো চাঁদ বলে ঃ
আকাশের তলে
ক্ষেতে ক্ষেতে লাঙলের ধার
মুছে গেছে—ফসল কাটার
সময় আসিয়া গেছে —চলে গেছে কবে !—(মাঠের গল্প)

খ. নিড়োনো হয়েছে মাঠ পৃথিবীর চারিদিকে,
শস্যের ক্ষেত চষে' চষে'
গেছে চাষা চলে। —(ঐ)

গ. —জমি উপড়ায়ে ফেলে চলে গেছে চাষা
নতুন লাঙল তার পড়ে আছে—পুরানো পিপাসা
জেগে আছে মাঠের উপরে ;
সময় হাঁকিয়া যায় পেঁচা অই আমাদের তরে !—(অবসরের গান)

ঘ. পৃথিবীর অন্ধকার অধীর বাতাসে গেছে ভরে
শস্য ফ'লে গেছে মাঠে,—কেটে নিয়ে চলে গেছে চাষা ;
—(জীবন)

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-র কৃষকও প্রায় এক অলৌকিক কৃষক। শুধু আমাদের পূর্ব-পরিচিত 'সোনারতরী'-র সেই কৃষকের সঙ্গে এর পার্থক্য এখানে যে, সে-কৃষক ছিল কালের কাছে প্রহৃত, কালের দ্বারা পরিত্যক্ত—আর এখানে কৃষক নিজেই সমাহর্তা, সে নিজেই কাল। সময়ই সেই কৃষক, যে তার কঠিন ছেদকের সাহায্যে মাঠকে করে তোলে জীবনানন্দীয় অর্থে হৈমন্তিক। সুতরাং এ কৃষক প্রায় প্রতীক। ভাবলে অবাক লাগে যে জীবনানন্দের চিল, বিড়াল, কাক, হরিণ—প্রভৃতি প্রতীকগুলির মধ্যে কেউই যখন জন্মায় নি, তখন এই একক কৃষক এক বিষণ্ণ পরিবেশ এবং জীবনার্থ সম্ভব করে তুলেছে। এবং জীবনানন্দের কাব্যজগতে ঐ কৃষক ছিল বলেই তার আকর্ষণে ধরা দিয়েছে 'রূপসী বাংলা'-র হারানো সৌন্দর্যের ম্লান গোধূলি। এক অপহর্তা সময়ের হাতে ক্ষয়িত অথচ স্মৃতির কাছে গচ্ছিত সৌন্দর্য এই গ্রন্থের বাঙালি মানসে বিশেষ আলো ফেলেছে। অস্পষ্টে রূপক ফুটেছে এ দেশের অতীত ও তাৎকালিকতার।

চার

তথাপি ইয়েট্সের সঙ্গে জীবনানন্দের অমিলটুকুও অনুধাবনীয়। ইয়েট্স-এর মতো জাতীয় বীরদের প্রেরণা যে জীবনানন্দকে প্রাণিত করেনি, বা দান্তে-কল্প কোনো ধ্রুপদী চেতনা যে তাঁকে স্পর্শ করেনি, এই অমিলের কথা বলা হচ্ছে না। আর একটি গভীরতর অমিলের কথাও মনে হচ্ছে—সেটি হল ইয়েট্স যেমন করে বিশ্বাস করেছিলেন (তাঁর জীবনের দুই পর্বে) বস্তু অতিক্রান্ত স্বপ্নলোককে, পরীদের ডাক-কে, অথবা এ্যালকেমিকেল মন্দিরের নর্তকদের যেমন করে বলেছিলেন যে, সেই স্বপ্নপরীর জগৎ মানুষকে মৃত্যুর পরেও অশান্ত করে—আমাদের সাহিত্যের শেষ প্রধান রোমাণ্টিক জীবনানন্দের পক্ষে সম্ভব ছিল না তেমন করে সেই স্বপ্নকে বিশ্বাস করা। বিংশ শতাব্দীর

আসন্ন তিরিশে, প্রথম উত্তর-সামরিক বিবর্ণতায় স্বপ্নের কথা বলা চলেছে বটে, কিন্তু তাকে বাস্তবের বিনিময় বলে প্রতিষ্ঠিত করা যায়নি। 'অবসরের গান'-এও যায়নি। এ কবিতার যে চরিত্র তার ভাষা তাই হয়ে গেল কৃত্রিম। এর কৃষক যেন এক বিনীত কৃষক। তার অনৈতিকতা আমাদের অভিভূত করে—দীক্ষিত করে না। আবার আয়ার্ল্যাণ্ডের ইস্টার অভ্যুত্থানের পরের সচকিত ইয়েট্স যে পরিবর্তনের স্পর্শ পেলেন, জীবনানন্দ তা থেকেও কোনো প্রেরণা পেলেন না। জীবনানন্দের ইয়েট্স সবটা না হলেও অনেকটাই প্রাক-ইস্টার রাইজিং-এর ইয়েট্স।

এই স্ববিরোধ থেকে জাত জীবনানন্দের টেক্নিকে আসে গতির জড়তা। সেই দ্বিধায় জড়িত পদের লাবণ্য সন্দেহাতীত। সন্দেহ নেই তার অপার্থিবতায়, কিন্তু যেহেতু তিনি পূর্ণ প্রত্যয় স্থাপন করতে পারলেন না তাঁর স্বপ্নে, না পারলেন বিশ্বাস করতে বাস্তবের সমগ্রতাকে, সেই হেতু তাঁর আমিত্ব শেষ রোমান্টিকের ক্লান্ত প্রতিক্রিয়ার প্রতীকের আশ্রয়ী হল। তাঁর সে প্রতীকিতা আধুনিকের আত্মউন্মোচনের প্রেরণাজাত নয়—নয় এলিয়টীয়—এমন কি পরিপূর্ণ ইয়েট্সীয়ও নয়। এ হল এক আত্মবন্দীত্ব। এর সীমাবদ্ধতাই এখানে যে, ঊর্ধ্ব প্রয়াণ করতে পারে—আপন গহনেও ডুবতে পারে—পারে না বাস্তবের বহুধা বৈচিত্র্যের--বিস্তৃত জটিলতার সম্মুখীন হতে। এ আপন অর্থ নিয়েই আবর্তিত—বিস্তৃত বিভিন্ন অর্থের জন্য দ্বার খোলা তার কাজ নয়।

পাঁচ

'ধূসর পাণ্ডুলিপি' আর 'চোরাবালি' একবছর আগুপিছু প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৩৬।৩৭ ঐ দুই স্মরণীয় কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ কাল। 'চোরাবালি'-র সেই পূর্ণাত্মক আধুনিকতা সেদিন আমাদের কাছে সহজ বলে প্রতিভাত হয়নি—আমরা তাল রাখতে পারিনি ঐ গ্রন্থের কবির বিমুক্ত আমিত্বের সেই আধুনিক গতিময়তার সঙ্গে, একথা অস্বীকার করে লাভ নেই। বিষ্ণু দে-র সেই আধুনিকতা নানা স্তর পেরিয়ে আজ হয়ে উঠেছে বর্ধিষ্ণু মানবতা। কিন্তু সেদিন, সেই 'চোরাবালি'-র দিনে সে আধুনিকতার প্রধান অভিজ্ঞান ছিল—বিশ্বগ্রাহী কৌতূহল এবং বিশ্বাস। 'চোরাবালির' প্রতীকিতা এলিয়টীয় প্রতীকিতার সাধর্ম্যযুক্ত। প্রতীক এখানে বাস্তব থেকে প্রয়াণের সোপান নয়—বাস্তবকে জানার চাবিকাঠি। অথচ দেখা গেল, এলিয়টের লণ্ডনের মতো বিষ্ণু দে-র কলকাতা একটি ব্যক্তিগত প্রতীক হওয়া সত্ত্বেও—এলিয়ট ও বিষ্ণু

দে-র মধ্যে একটি গভীর ব্যবধান স্পষ্ট হল শেষোক্তের যাত্রা মুহূর্তেই- আত্মজ কবি-চরিত্রের কারণে। পূর্বজ-দের তুলনায় আমরা যে স্থূল, হিসাবী কৃপণতায় কর্কশ এবং দেমাকী—বর্তমান যে অতীতের মাপকাঠিতে নিকৃষ্ট—এই এলিয়টিয়ানাকে বিষ্ণু দে কখনোই প্রশ্রয় দেন নি। বরঞ্চ ঐতিহ্যলব্ধ অতীত-দীপবর্তিকাই বর্তমান যে হাতে তুলে নেয় ভবিষ্যৎকে দেখতে—এই বিশ্বাস সেদিন তাঁকে পদে পদে প্রাণিত করেছে। জীবনের স্বাস্থ্যোদ্যম তাঁর দৃষ্টিকে এড়িয়ে যায়নি, আর এটাও এড়িয়ে যায় নি যে জীবন অক্লান্ত।

সময়কে একজন কবি কী ভাবে দেখেছেন তা বোঝা যায় জীবন ও মৃত্যুকে তিনি কীভাবে দেখছেন তা থেকে। ন্যুব্জ পৃষ্ঠ বৃদ্ধ সময় নয় -- দ্বান্দ্বিক গতিবেগে তীব্র সময়ই বিষ্ণু দে-র কবিতার অধিষ্টাতা আবেগ। মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধরত জীবন, জীবনের কাছে পরাভূত মৃত্যু বা মৃত্যুতেও মহৎ জীবন বিষ্ণু দে-র কবিতাকে ছুঁয়ে আছে। তিনি তো দুরূহ বলে গণিত হবেনই—কেননা তাঁর কাছে সংস্কৃতির উজ্জ্বল জগৎ ও মানুষের দৈনিকের বাঁচার সংগ্রাম এক বৈপরীত্যে স্থাপিত হল না। এই গতিবেগ,—এই দৈর্ঘ্যে-ওসারে বিস্তৃতির জন্যই বিষ্ণু দে-র কবিকল্পনা কখনো স্বেচ্ছাবন্দী নয়। তাই আমাদের আলস্যে কখনো কখনো মনে হয়েছে তিনি দুরূহ। 'চোরাবালি' গোটা বাংলা কাব্যের প্রেক্ষাপটে এই মৌলিক কারণেই হয়ে উঠল এক অভিনব কণ্ঠস্বর। অথচ সেই উক্তি দুরূহ হলেও, স্বরে ছিল এক মন্ত্রমায়া -- চোরাবালি, ওফেলিয়া, ক্রেসিডা তার নিদর্শন।

তাঁর এই অধুনিক ভাবনার ফলেই তাঁকে ভাঙতে হল কাব্যের পুরানো ন্যায়। স্তবক বিন্যাসে পারম্পর্য অপেক্ষা চিন্তাস্রোতের নৈঃসঙ্গ্য বা বিচ্ছিন্নতার সঙ্গে লড়াইয়ের ন্যায়কে তিনি রক্ষা করলেন, তাই তিনি সহজ ছিলেন না। প্রবহমান মাত্রাবৃত্তে পঙক্তি অন্তর্গত বাক্যের ছেদ চিহ্নগুলি অনুধাবন না করলে দুরূহই লাগে। তাঁর ট্রয়লাস কিছু কিছু অচেনা সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করে -- আমরা যদি তাঁর ট্রয়লাসের চরিত্রকে না জানি, তা হলে এ তথ্যও আমাদের সাহায্য করবে না যে শেক্সপীয়রের ট্রয়লাসও তার উক্তিতে সকারণেই ব্যবহার করেছে কিছু কিছু ল্যাটিনাইজড শব্দ।

সম্ভুক্ত কাব্যাংশ বা কাব্যপঙক্তি পুনঃস্পান্দিত হয়ে ওঠে বিষ্ণু দে-র কবিতায়। এ প্রথা এলিয়টেও নতুন নয়, ওভিদের পঙক্তি শর্লো ব্যবহার করেছেন, এডিথ সিটওয়েল ব্যবহার করেছেন ফস্টাসের পঙক্তি। এ শুধু অর্থেরই পুনঃস্পন্দন নয় অনুভূতিরও পুনঃস্পন্দন বটে। বিষ্ণু দে এই পুনঃস্পান্দিত কাব্য-অভিজ্ঞতাকে নবতা দেন ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতার সেতুবন্ধনের সাহায্যে। The

fair Ophelia—Nymph, in the orisons / Be all my sins remembered. সম্ভুক্ত এই কাব্যঅভিজ্ঞতাকে বিষ্ণু দে সম্পূর্ণ নতুন করে তোলেন 'ওফেলিয়া' কবিতার 'দেবযানী সাঁঝে তোমার প্রণাম...' এই স্তবকে 'দেবযানি' এবং 'শাপমোচন'-শব্দের ভারতীয় অনুষঙ্গে। এ পুনঃস্পন্দিত নয়—পুনর্জাত। এমনই কিছু কিছু দুরূহ গিরিচূড়া এখনো অপেক্ষা করে আছে—পথিকের পক্ষে যে আরোহণ অবরোহণে আনন্দই পুরস্কার। জীবনই সে আনন্দের উৎস—কবির দিক থেকে—পাঠকের দিক থেকেও।

তিরিশের যুগে বিস্ময়ের বিবর্ণতা : জীবনানন্দ

কীর্তি নিয়োগীর মাথার আবের দিকে তাকালে শশীর আর আকাশের চাঁদের দিকে তাকাতে ইচ্ছা করত না—'পুতুল নাচের ইতিকথা'-র শশী এভাবেই আক্রান্ত হয়েছিল বিস্ময়ের মৃত্যুর দ্বারা। তালবনের উঁচু টিলার ওপরে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখার মধ্যে যে-বিস্ময়, শশী তা হারিয়ে ফেলল গাওদিয়া নামক বাস্তবতার হাতে অধিকৃত হয়ে। এটা শুধু শশীরই ভবিতব্য নয়, প্রথম উত্তর-সামরিক মধ্যবিত্ত মানসের নানা ধূসরিমার এও এক লক্ষণ। শশীর ললাটলিখন এই যে, তারই জ্ঞান বা অবিরাম জানবার গাঢ় বেদনাই তাকে সব বিস্ময় থেকে বিচ্যুত করবে। যাদবের মৃত্যুর রহস্য শুধু সেই বোঝে—তাই সেই নিক্ষিপ্ত হয় অলৌকিক আশ্রয়ের ঊর্ধ্ব জগৎ থেকে নাস্তির নিষ্ঠুর ভূমিতে। অথচ জানার যে-বিস্ময় সেটাও তার হতে পারে না।

তা ছিল রোমান্টিকদের। যেদিন তারা জগৎ বা জীবন বলতে বুঝল নতুন একটা ব্যাখ্যার দায়িত্ব, সেদিনই তারা বিস্ময়কে বরণ করে নিয়েছে। প্রাক্‌রোমানন্টিকদের কাছে 'বিশ্ব' ছিল সুনির্দিষ্ট, সুপরিকল্পিত এবং সুশৃংখল নিয়মে বাঁধা—প্রত্যক্ষ। কিন্তু নদী সমুদ্র পাহাড়ে—বিজনতায় এবং একাকীত্বে রোমান্টিকরা অনুভব করলেন আর এক অস্তিত্বের উপস্থিতি। 'এই সমস্তই প্রকৃতির বিশালতা দুর্জ্ঞেয়তা এবং অব্যাখ্যেয় গূঢ়তা এক বিস্ময়ের জননী।' কপালকুণ্ডলার সামনে নবকুমারের বিস্ময়-মৌনতা সৌন্দর্যের সামনে ব্যক্তির আপনার অনুভূতির অশেষত্বের নিদর্শন। নবকুমার সেই মানুষের প্রতিনিধি, এই বিস্ময় হবে যার ভবিতব্য। এক লহমায় নবকুমারের মনে হয়েছিল জীবনের সব ছেঁড়া তারগুলো বুঝি বা জোড়া লেগে গেল। এইখানেই বিস্ময়ের চূড়ান্ত সীমা। অথচ তখন থেকেই নবকুমার নিক্ষিপ্ত হল জটিলতর, গভীরতর অশান্তির মধ্যে—এটাই এই বিস্মিতের বিধিলিপি, বিস্ময়ের আয়রনি। এ বিস্ময় হতে পারে জীবনের বিস্ময় কখনো কখনো—'আকাশ ভরা সূর্যতারা, বিশ্বভরা প্রাণ, তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান'—এ বিস্ময় কখনো বা হতে পারে অস্তিত্বের দুরবগাহ রহস্যের বিস্ময়—দিনের শেষ আলো মেলে দেয় এক নিরুত্তর প্রশ্ন 'কে তুমি'—মেলেনি উত্তর।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এ বিস্ময়ের ব্যাপ্তি ও গভীরতা নিশ্চয় এক নির্দিষ্ট

আকার পেয়েছে। এবং তিনিই অন্য একভাবে এই বোধকে দিয়েছেন নতুন স্তর। তাঁর রুগ্ন ব্যাধিগ্রস্ত কোনো কোনো নায়ক যন্ত্রণাকে 'তুচ্ছ করেছে, সয়েছে এবং বয়েছে এই বিস্ময়কে স্বীকৃতি দিয়ে। দুঃখভোগ এবং আনন্দভোগ যে রোমান্টিকের কাছে দুই কোটির ব্যাপার নয়, বরং বিমিশ্র অনুভূতি তা বোঝা যায় ডাকঘরের অমলকে দেখলে, অথবা গল্পগুচ্ছের 'শেষের রাত্রি' গল্পের নায়কের যন্ত্রণা বোধে। রবীন্দ্রনাথের একাধিক নায়ক আছে যারা বিষণ্ণ, যারা কোনো একটা ধূসর নির্বেদ বহন করেছে আদ্যন্ত। এরাও কিন্তু জীবনের বিস্ময়কে তুলে ধরে অন্যভাবে। এরা বলে জীবনের জটিলতার কথা। বস্তুতঃ বিস্ময় তো দুই-তিন বা বহুভাবেই জেগে উঠতে পারে। নিজেকে জেনে, নিজের চারিপাশের জগতকে জেনে, অথবা নিজেকে সম্পৃক্ত জেনে বা বিবিক্ত মেনে। নিজের শক্তিকে অনুমান করে, অথবা দুর্বলতাকে বুঝেও আমাদের অবাক হবার সীমা পরিসীমা থাকে না। সাবলাইমের অভিঘাতেও তা জাগতে পারে—কীটের কুটিলতাকে পাপড়ির মধ্যে দেখেও তার জাগরণ অসম্ভব নয়। যে সৌন্দর্য অপ্রতিরোধ্য তা যেমন বিস্ময়ের হেতু, আবার যে-সৌন্দর্য বেপথু, পতনশীল তাও আমাদের কাছে কম বিস্ময়জনক নয়। বিরাট স্থাপত্যকীর্তি যেমন আমাদের মনকে টানতে পারে, তেমনি তার ভগ্নদশা, ফাটলে ফাটলে অশথের চারা, তোরণের ভঙ্গুর সিংহমূর্তি, ম্লান গাত্রগরিমাও আমাদের অন্য এক বিস্ময়ে পূর্ণ করে। প্রথমোক্ত বিস্ময় জীবনের বিস্ময়, কেননা সেটা সৃষ্টির বিস্ময়; দ্বিতীয় বিস্ময় মৃত্যুর বিস্ময়।

জীবন ও মৃত্যুকে বিস্ময়ের হেতু জেনে সার্থকভাবে অগ্রসর হয়েছেন জীবনানন্দ। একই সঙ্গে তাঁর দুটো কবিতা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়—'ক্যাম্পে' (ধূসর পাণ্ডুলিপি) এবং 'শিকার' (বনলতা সেন)। প্রতীক-প্রীতিকের কথা পরে হবে, আপাতত কথা হল কবিতাদুটির অন্তর্মিল। একটি জঙ্গল, শিকারীদের আগমন, হরিণের মৃত্যু দুটি কবিতারই প্রধান বিষয়। প্রথম কবিতাটি প্রবহমান অসমচরণ মুক্তক তান প্রধানে লেখা। ব্যবহৃত ক্রিয়াপদগুলি সাধু বা লৈখিক। ছন্দ এবং ক্রিয়ার এই সাধুরীতির প্রয়োগে কবিতাটির ভাবঘন ধূসর ভাবটি সার্থক হতে পেরেছে। 'এক ঘাই হরিণীর ডাক শুনি। কাহারে সে ডাকে!' প্রথম ক্ষুদ্রতম স্তবকটিতে এই উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ঐ আহ্বান আমাদের বিস্ময়াতুর করে তোলে। তখনও তো আমাদের কাছে স্পষ্ট নয় ঐ ডাকের স্বরূপ। কিন্তু নৈসর্গিক হয়েও তা যে অলৌকিক ডাক তা বুঝি বোঝা যায়। রবীন্দ্রনাথের 'পদধ্বনি' কবিতাতেও তো এমনি না হলেও বলা আছে ঃ

আঁধারে প্রচ্ছন্ন ঘন বনে
আশঙ্কার পরশনে
হরিণের থর থর হৃৎপিণ্ড যেমন—
সেই মতো রাত্রি দ্বিপ্রহরে
শয্যা মোর ক্ষণতরে
সহসা কাঁপিল অকারণ।

মৃত্যুই সেখানে পরম বিস্ময়ের হেতু হয়ে স্পন্দমান। জীবনের নানাবিধ বিস্ময়ের মধ্যে বুঝিবা মৃত্যুও একটা। 'ক্যাম্পে' কবিতায় জীবনানন্দ সহজ তুলিতে এঁকে দেন জীবনের আশ্চর্য রূপ—'চারিপাশে বনের বিস্ময়/বনের বাতাস/জ্যোৎস্নার শরীরের স্বাদ যেন', অথচ এই বিস্ময়কর জীবনের মাঝখানে মৃত্যু আর প্রেম এক হয়ে যায়, 'ধাই মৃগী সারারাত ডাকে'। ধীরে আমরা আমাদের ভবিতব্যের দিকে ঘনিয়ে যাই। অন্ধকার অস্তিত্বকে ছেড়ে আমরা এগিয়ে যেতে চাই সেই ভবিতব্যের বিস্ময়ের দিকে।

আজ এই বিস্ময়ের রাতে
তাহাদের প্রেমের সময় আসিয়াছে।

এ-বিস্ময় কিসের? সাধারণভাবে এবিস্ময় জীবনের। যে জীবনকে ঘিরে আমাদের আকাঙ্ক্ষা, আস্বাদ, সেই জীবনকে ঘিরে রয়েছে আমাদের মৃত্যু-চেতনা।

কোথাও বাঘের পাড়া বনে আর
নাই যেন।
মৃগদের বুকে আজ কোনো স্পষ্ট
ভয় নাই,

এই যে-মৃত্যুবিস্মৃতি এ কিন্তু বস্তুত একটা আত্মছলনা। ভয়ের বদলে প্রবল হয়েছে জীবনের পিপাসা। 'মৃগীর মুখের রূপে হয়তো চিতারও বুকে জেগেছে বিস্ময়'—এই বিস্ময় প্রত্যেককে বুঝি প্রত্যেকের নিজ ভূমিকা ভুলিয়ে দেয়। রোমান্টিক সৌন্দর্যচেতনার সারাৎসারে মৃত্যু নিজেও বুঝি জীবনের রূপ দেখে বিস্ময় স্থকিত। বিস্ময় দুই ধরনের : এক, বিস্ময় আমাদের সঙ্গে জগতের ঐক্যকে চকিতে প্রতিষ্ঠিত করে। গ্রীক পানপাত্রকে দেখে কবির যে বিস্ময়, বা পশ্চিমা বাতাসকে অনুভব করে কবির যে আকুলতা তা এই জাতীয় বিস্ময়। আর এক বিস্ময় আমাদের আপাত ঐক্যকে সহসা খণ্ডিত করে—তার ফলে আমরা দেখতে পাই পরিদৃশ্যমানের অন্তরালে অন্য এক সত্যকে। ফরাসী প্রতীকী কবি যখন নগর-জীবনের বর্ণনা করেন, তখন তাঁর বর্ণনারই আড়ালে

আড়ালে কাজ করে এক অবক্ষয়ের সত্য। দুয়ে মিলে গড়ে ওঠে এক ঐক্য জীবনসম্বন্ধীয় পুরোনো বিস্ময়ের এইভাবে ঘটে অপসারণ। উদ্ভূত হয় এক নতুন বিস্ময়।

জীবনানন্দের 'ক্যাম্পে' ও 'শিকার' কবিতা দুটিতেও একত্র জড়িত হয়ে রয়েছে সৌন্দর্যের সংগে নিয়তির ছায়া। আমাদের 'সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মতো এসে জাগে ধূসর মৃত্যুর মুখ'—এই জীবনানন্দীয় বিস্ময়ের মূল রয়েছে প্রথম উত্তর-সামরিক হতাশাবোধে। যে- ধূসরতা সমর সেনের কবিতায় পুনরাবৃত্ত তার সঙ্গে জীবনানন্দীয় ধূসরতার আত্মীয়তা নেই, এটা ঠিক কথা, কিন্তু এটাও ঠিক কথা যে, উভয়ে পরস্পরের বিপরীত নয়।

এই উত্তর-সামরিক ধূসরতা আমাদের বুঝিয়ে গেল ভাঙনের এবং অপচয়ের আত্যন্তিকতা। তবু এর মধ্যে, অন্তত জীবনানন্দ বলেন, এক মাত্র প্রেমই বোধ করি ভুলিয়ে দেয় সেই সব ভাঙন, বিনাশ, অপচয়ের কথা। 'একে একে হরিণেরা আসিতেছে গভীর বনের পথ ছেড়ে সকল জলের শব্দ পিছে ফেলে অন্য এক আশ্বাসের খোঁজে/দাঁতের নখের কথা ভুলে গিয়ে'·· প্রেমই সেই বিস্মরণী। প্রেমই দেয় মৃত্যুকে অবহেলা করার ক্ষমতা। কিন্তু এ ক্ষমতাতেই মানুষের রেহাই মেলে না। ঘাইহরিণীর ডাক এবং বন্দুকের শব্দ মিশে যায়। মৃগপ্রেমিকদের শব পড়ে থাকে। হরিণের মাংসভরা ডিসের সামনে মানুষের মনে হবে:

তাদের মতন নই আমিও কি ?
কোনো এক বসন্তের রাতে
জীবনের কোনো এক বিস্ময়ের রাতে
আমারেও ডাকেনি কি কেউ এসে
জ্যোৎস্নায় দখিনা বাতাসে
অই ঘাই-হরিণীর মতো ?

'ক্যাম্পে' কবিতাটির রূপকার্থটিও অনুধাবনীয়। সহজ প্রাণীন জীবন ডাক দেয়, হতে পারে সে ডাকও নিয়তি-নির্দিষ্ট। তথাপি সেই বসন্ত-বিহ্বল রাত্রের হরিণের মতো, মৃত্যু সত্য হলেও সে ডাকে সাড়া দিতে হয়। মৃত্যু তুচ্ছ হয়ে যায় সেই পরমাপ্রকৃতির অমোচনীয়, অলঙ্ঘ্য আকর্ষণে। ঘাইমৃগীরা যেন ছলনাময়ী আহূতি—সে ডাক প্রত্যেকটি পুরুষকে, প্রত্যেক প্রেমিককে শুনতে হয়। এ হল, বা হতে পারে এই কবিতাটির একদিকের অর্থ। আর একদিকে এ অর্থও গ্রাহ্য, হরিণ-হরিণী ব্যাঘ্রের স্বাভাবিক জীবনে ক্যাম্প একটা প্রক্ষিপ্ত উপস্থিতি—তাই ছন্দোপাত। মানুষেরও জীবনের স্বভাবছন্দ ভেঙে

গেছে ঐ সভ্যতার প্রক্ষিপ্ত উপস্থিতিতে। সেও মানুষের কাছে ধ্বংসের, মৃত্যুর প্রতীক। প্রেম বা বসন্ত এখনো মানুষকে এক-এক বার, সেই ধ্বংসাত্মক শক্তির কথা ভুলিয়ে দেয়। কিন্তু সে বিস্ময় ক্ষণিকের জন্য মাত্র। তারপরেই আমাদের শতাব্দীর অভিজ্ঞতা এসে জ্ঞানরূপে সে বিস্ময়কে চূর্ণ করে দেয়, যেমন 'ক্যাম্পে' কবিতার সমাপনী অংশে ঃ

বসন্তের জ্যোৎস্নায় এই মৃত
মৃগদের মত আমরা সবাই।

'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থে 'শিকার' কবিতাটি 'ক্যাম্প' কবিতার সংহত রূপ। 'ক্যাম্পে' যা ছিল বিস্তৃত, ছড়ানো ছিটোনো, কাহিনী আকারে গ্রথিত, 'শিকার' কবিতায় তা পেয়েছে সূচ্যগ্র, প্রতীকী সংহতি। 'ক্যাম্প' কবিতায় রঙের ব্যবহার ছিল স্তিমিত, সীমিত—'শিকার' কবিতায় রঙের ব্যবহার ইমপ্রেশনিস্টিক। প্রথম স্তবকেই ঘাসফড়িঙের নীল—যা কোমলতাবাচক, 'টিয়ার পালকের মতো সবুজ' 'গাছের রঙ, নীল মদের গেলাস' এমন এক বর্ণসমাবেশকে স্পষ্ট করে তুলেছে, যা ভোরের উজ্জ্বলতা অপেক্ষা মূর্খ উচ্ছ্বাসকে বেশি ফুটিয়ে তোলে। দ্বিতীয় স্তবকে আগুনের বর্ণাভার অপমৃত্যু সার্থকভাবে আভাসিত হল। উত্তাপদায়িনী যে আলো সারারাত জ্বলছিল 'মোরগ ফুলের মতো লাল আগুন' 'সূর্যের আলোয় তার রঙ কুঙ্কুমের মতো নেই আর। হয়ে গেছে রোগা শালিখের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো।' অথচ এবম্বিধ বিবর্ণ অপমৃত্যু চারিদিকে, তাই সকালের আলোয় শিশিরে ঝিলমিল করছে বন ও আকাশ ময়ূরের সবুজনীল ডানার মতো। এই ফ্রেমটি ইঙ্গিত করছে জীবনের অনাহত রূপ-প্রবাহের অঘ্রাণের রাতে যে প্রেম হাওয়ার মতো পাতার বুক ছিঁড়ে চলে যায় সেই শাশ্বত প্রকৃতির দিকে। আর ফ্রেমধৃত ছবিটি সঙ্কেতে জানিয়ে দিচ্ছে বিস্ময়ের মহাপ্রস্থানের কথা। তা এখুনি অন্তরালে সংঘটিত হল।

'মেহগনির মতো অন্ধকার' এই চিত্রকল্পে 'মেহগনি' শব্দটি অন্ধকারকে করে তুলেছে মূল্যবান। বাদামী হরিণের রঙটি প্রাণের প্রতীক। জীবনের সাধ অফুরন্ত। 'সাহসে সাধে সৌন্দর্যে হরিণীর পর হরিণীকে চমক লাগিয়ে দেবার জন্য' নীল আকাশের নিচে উদ্যত হরিণ যেন তৎপর জীবনের প্রতিমা। কিন্তু তার সেই সমস্ত সাধ, উদ্যমের মাঝখানে তার সমস্ত কামনার মধ্যপথে —'একটা অদ্ভুত শব্দ'। এই কবিতাটির নানা মূল্যবান শব্দপ্রয়োগের মধ্যেও 'অদ্ভুত' শব্দটি বড়ো বিচিত্রভাবে প্রযুক্ত। 'ক্যাম্প' কবিতায় মূল শ্রোতা ছিল মানুষটি। সে-ই ঘাই হরিণীর ডাক শুনেছে, বন্দুকের শব্দ শুনেছে। 'শিকার'

কবিতাটিতে অনুরূপ কোনো শ্রোতা নেই। হরিণটি শুনেছে শব্দটি, কিংবা সেও শোনেনি। অরণ্যবাসীরা শুনেছে। বন্দুকের শব্দ বলে তারা এ শব্দকে জানে না। তাই 'অদ্ভুত' এই বিশেষণ। আরও গভীর কারণে এই বিশেষণটি তাৎপর্য পায়। এতক্ষণ ধরে সকালের একটা বর্ণনা গড়ে তোলা হয়েছে। নানা রঙের অনুষঙ্গ পূর্ণ করা হয়েছে সেই সকালটিতে। এতক্ষণ ধরে মূর্ত হয়েছে একটি নিস্তব্ধতা। এতক্ষণ ধরে কোনো শব্দের কথা বলা হয়নি। সেই কুমারী স্তব্ধতা ঐ 'অদ্ভুত শব্দে' সহসা ধর্ষিত হলো বিপুল বেগে।

'নদীর জল মচকা ফুলের পাপড়ির মতো লাল'—'মচকা' শব্দটি চাক্ষুষ অনুষঙ্গে 'আচমকা'কে স্মরণ করিয়ে দিল। এতক্ষণ যা ছিল, শিশির, আলোক, কাঁচ বাতাবি লেবুর মতো, সবুজ সুগন্ধি ঘাস, পাড়াগাঁর বাসর ঘরের, সবচেয়ে গোধূলিমদির মেয়েটির মতো তারা, ময়ূরের সবুজ নীল ডানা—সব বিস্ময় হারিয়ে গেল। এবারে এল উষ্ণ লাল হরিণের মাংসের মতো স্থূল ব্যবহারের সামগ্রী। 'আগুন জ্বলল আবার', কিন্তু সে আগুন একটু আগের দেশোয়ালিদের শরীরের 'ওম্ বজায় রাখার মতো স্বাভাবিক আগুন নয়'। 'সিগারেটের ধোঁয়া, 'টেরিকাটা কয়েকটি মানুষের মাথা' 'এলোমেলো কয়েকটা বন্দুক'—সেই সব মানুষের কথা ধরিয়ে দিচ্ছে, এই অরণ্য এবং আকাশের যারা কেউ নয়। এই অরণ্যকে ঘিরে তাদের কোনো বিস্ময় নেই। 'তাদের নিস্পন্দ নিরপরাধ ঘুম', তাদের বিবেকহীনতার পরিচয় নয়, এ তাদের বিস্ময়হীনতার চিহ্ন। এ তাদের স্থূল উদ্দেশ্যসিদ্ধির পরিচয়। সেখানে বিস্ময় নেই। আধুনিক রক্তেরই এক অংশে এক 'বিপন্ন বিস্ময়' খেলা করে। সমস্ত অর্থ কীর্তি সচ্ছলতার মধ্যেও মানুষের কাছে যখন বেঁচে থাকার মানে হারিয়ে যায়, তখনই মানুষ আর নিজেকে সনাক্ত করতে পারে না। ক্লান্তিকর সেই বিপন্ন বিস্ময়। সবকিছুর মধ্যে সে একা।

তাই জীবনানন্দের ক্লান্ত মানুষ কখনো কখনো এমন কথাও বলে—'আমার সমস্ত হৃদয় ঘৃণায়—বেদনায়—আক্রোশে ভরে গিয়েছে; সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত এই পৃথিবী যেন কোটি কোটি শুয়োরে আর্তনাদে উৎসব শুরু করেছে।' বিস্ময়াবসিত সেই ক্লান্ত মানুষ তখন বলে তার পুরাতন বিস্ময়ের উদ্দেশ্যে ঃ

গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে
আমার আত্মা লালিত;
আমাকে কেন জাগাতে চাও?
হে সময়গ্রন্থি, হে সূর্য

হে, মাঘনিশীথের কোকিল, হে স্মৃতি
হে হিম হাওয়া,
আমাকে জাগাতে চাও কেন ?

শিল্প বিপ্লবের পরে মানুষ যেদিন এগিয়ে পড়ল টেক্‌নোলজির উৎকর্ষে, আয়ত্ত করতে শিখল নিজ জীবনের প্রতি খণ্ডাংশকে, তখন আর মানুষের বিজ্ঞান সাধনার প্রথম যুগের সেই প্রাচীন বিস্ময় কার্যকর ছিল না। প্রথম মহাকাশ তত্ত্ব, পৃথিবীর গতি, মানুষের কাছে প্রতিভাত হয়েছে বিস্ময়কর রূপে। প্রযুক্তিবিদ্যা যেদিন মানুষকে চাঁদে পৌঁছে দিল, কোপার্নিকাস যে বিস্ময় সৃষ্টি করেছিলেন তার কাছে তা ম্লান। আমরা গড়েছি বড় বড় নগর, কত বিদ্যুৎ, কত না উপকরণ। এ নগরে কিন্তু কোনো বিস্ময় নেই। এই নগরের রাত্রির মধ্যে মহত্ত্ব নেই ঃ

হাইড্র্যাণ্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠ রোগী
চেটে নেয় জল ;
অথবা সে হাইড্র্যাণ্ট হয়তো বা
গিয়েছিল ফেঁসে
এখন দুপুর রাত
নগরীতে দল বেঁধে নামে।
একটি মোটরকার গাড়লের মতো
গেলো কেশে
অস্থির পেট্রল ঝেড়ে ;

এখানে বিস্ময় কোথায় ? এখানে মানুষগুলি কাপড় পরে লজ্জাবশত, এখানে মানুষগুলি অতিবৈতনিক।

'আগন্তুক' নামে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি গল্প আমরা সবাই পড়েছি। সে গল্পের মূলকথা হল সম্পর্কসূত্রগুলির শূন্যতা। দীর্ঘ ব্যবধানে ঘরে ফেরা চরিত্রপাত্রটি দেখল আবেগের পাত্র কবে যেন উপুড় হয়ে একেবারে নিঃশেষিত হয়ে গেছে। এক মহা অবিস্ময় সমস্ত পরিবেশকে গ্রাস করেছে। এ জীবন যে শুধু বহু ব্যবহারে ঘষা সিকির মতো দাম হারিয়েছে, ঔজ্জ্বল্য হারিয়েছে তাই নয়, বহু পুনরাবৃত্তিতে সবকিছুই হয়ে গেছে নিরর্থক। এমনি এক বিস্ময়ের বিলীনতা, বিস্ময়ের মহাপ্রস্থান সমর সেনের কবিতাগুলিতে এক ধূসর রঙকে ঘন করে তুলেছে। 'ধূসর' জীবনানন্দেরও রঙ, 'ধূসর' সমর সেনেরও রঙ। কিন্তু একটি ধূসর সন্ধ্যার—হেমন্ত সন্ধ্যার ধূসরতা ; আর

একটি হল মরু-ধূসরতা—রুক্ষতার জ্বালা ছড়ায় সে। সমর সেনের অঙ্কিত সকালে কোনো আলোকবিস্ময় নেই, নেই কোনো শিশির সমুজ্জ্বলতা, নেই কোনো আকাশ-নীলিমা। তা আমাদের বিবর্ণ বন্ধ্য পুনরাবৃত্ত নিরর্থকতার বার্তাবহ ঃ

ক. কত সবুজ সকাল তিক্ত
রাত্রির মতো,

খ. সেই উজ্জ্বল স্তব্ধতায়
ধোঁয়ার বঙ্কিম নিশ্বাস
ঘুরে ফিরে ঘরে আসে
শীতের দুঃস্বপ্নের মতো

গ. কলতলায় ক্লান্ত কোলাহলে
সকালে ঘুম ভাঙে
আর সমস্ত ক্ষণ রক্তে জ্বলে
বণিক সভ্যতার শূন্য মরুভূমি।

ঘ. রাত্রির দূষিত রক্তে
বিকলাঙ্গ দিনের প্রসবে
আমাদের তন্দ্রা ভাঙে।

আমাদের শ্রেণীগত অচরিতার্থতা তিনের দশকে যত প্রবল হয়েছে, যত আমরা ইতিহাসের সিংহদরজায় ধাক্কা খেয়েছি, ততই আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে মোহ ভাঙতে থেকেছে ; ততই যেন আমাদের জীবন থেকে বিস্ময়ের নির্বাসন ঘটেছে। এ যুগেরই একটি বিখ্যাত কবিতায় এই সাময়িক অনুভূতির প্রতিবিম্বন বাংলা কাব্য-সাহিত্যে প্রায় ক্ল্যাসিক হয়ে থাকল। কবিতাটি সমর সেনেরই 'উর্বশী'। আমাদের রক্তে তখন বণিক-সভ্যতার গঞ্জনা। আমাদের দিনযাত্রায় তখন নিরুদ্দেশ দিশা। মধ্যবিত্ত মন্থর রক্তে উর্বশীর সৌন্দর্য-কামনা দুরন্ত মেঘের মতো আবির্ভূত হওয়া কি সম্ভব ? না কি সেই দুরন্ত সৌন্দর্য, সেই রক্তিম বাসনার শেষ পর্যন্ত অবমূল্যায়ন ঘটবে। যতদিন না চারের দশকে মধ্যবিত্ত আবার ইতিহাসের ইশারা ঠিকভাবে বুঝে নিল, যতদিন না মধ্যবিত্ত আবার ইতিহাসের কুরুক্ষেত্রে নিজেকে ঠিকভাবে সনাক্ত করে নিল—ততদিন উর্বশী-স্বপ্নের বিকৃতি বিস্ময়কে দিল নির্বাসন ঃ

কিংবা আমাদের ম্লান জীবনে
তুমি কি আসবে,

হে ক্লান্ত উর্বশী,
চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে যেমন বিষণ্ন মুখে
উর্বর মেয়েরা আসে
কত অতৃপ্ত রাত্রির ক্ষুধার ক্লান্তি,
কত দীর্ঘশ্বাস।

আধুনিক বাংলা কাব্যে তৃতীয় পাণ্ডবের প্রবেশ ও প্রস্থান

এক

একমাত্র কবির হাতেই আছে মহাকালের সেই গূঢ় রহস্যের চাবিকাঠি—যে চাবিকাঠিতে জানা যায় অনতীত অতীতকে, জানা যায় চিরবর্তমান অবর্তমানকে। কবির সেই অতীত অধ্যয়নের দুই স্তর—এক স্তরে অতীতের আলোয় বর্তমানের পাঠোদ্ধার, আর এক স্তরে বর্তমানের আলোয় অতীতের অনুধাবন। কবিই জানেন ত্রিকালের রহস্য। তাই একালের কল্পনার কেশগুচ্ছে তিনি অতীত প্রহরের ফুলের গুচ্ছ পরিয়ে দেন, তার এক প্রহরের কন্ঠের উত্তাপে আর এক প্রহরের মুকুলের উন্মোচন। কবির কাছে কাল অকাল নেই। তিনি শুধু জানেন, লগ্নভ্রষ্ট না হলেই হল। মহাভারতের শকুন্তলা-কাহিনী কালিদাসের হাতে, বাইবেলের কাহিনী মিল্টনের হাতে শুধু যে ভাবান্তরিত তাই নয়, অন্য তাৎপর্যে তা অর্জন করেছে নতুন স্তর। দুর্বাসার অভিশাপ কালিদাসের কালের ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ্য-প্রতাপের স্মারক। অন্যমনা (কিংবা অনন্যমনা) শকুন্তলা সেই কঠিন সমাজ-কাঠামোয় স্বাধীন ইচ্ছার লাঞ্ছিত নিদর্শন। দুর্বাসার শাপের ঘটনার মাধ্যমে কালিদাস তাঁর কালকে যুক্ত করেছেন পুরোনো কালের গল্পের সঙ্গে। তখনই অতীত হয়ে উঠল অনতীত। আবার বিষয়টিকে অন্যভাবেও দেখা যায়। একই বিষয়াধার দুই কবির হাতে ব্যঞ্জনায়, বর্ণবিচ্ছুরণে দুই রূপের বিভা ছড়াল। যেমন, ফাউস্টের গল্প মার্লোর হাতে যা, গ্যেটের হাতে তা নয়। টমাস বেকেটের আত্মদান টেনিসনের হাতে যে রূপ, যে রঙ পেল, এলিয়টের হাতে তা হয়ে উঠল সম্পূর্ণ অন্যভাবের কাব্য। টেনিসনের বেকেটের মৃত্যু একটা তীব্র, তীক্ষ্ণ নাটকীয় ঘটনা—ট্র্যাজিক আখ্যা যে ঘটনার পক্ষে স্বতঃলব্ধ। কিন্তু এলিয়টের কাছে এ ঘটনা খ্রীষ্টীয় প্রায়শ্চিত্ত—পার্থিব মূল্যের সঙ্গে আধ্যাত্মিক মূল্যের দ্বন্দ্বের, আদিভূত পাপবোধের, একান্ত অনিবার্য পরিণাম। টেনিসনের ভিক্টোরীয় জীবনবোধ এলিজাবেথীয় নাট্য-ঐতিহ্যকে মাঝে মাঝে স্পর্শ করেছে বটে, কিন্তু তাকে পুনর্জীবিত করতে পারে নি। পক্ষান্তরে এলিয়টের কাব্যনাটকে বেকেট চরিত্র-কল্পনা মূর্ত হল বিংশ শতাব্দীর মূল্যাবনমন ও মূল্যাবধারণের সংঘাতের বিগ্রহ রূপে। আর কী আশ্চর্য, যে দ্বন্দ্ব এ কাব্যনাটকের প্রাণ সে দ্বন্দ্ব বাইরে না, সে দ্বন্দ্ব রাষ্ট্রে এবং গীর্জায় না, সে দ্বন্দ্বের স্বভূমি বেকেটেরই মথিত অন্তর।

এবং এ জাতীয় উদাহরণ কাব্যের ইতিহাসে নানা সঙ্কেতকে বহন করেছে—নানা ভাবে। হোমারের য়ুলিসিসের যাত্রা দান্তের ইনফার্ণোয় উল্লিখিত হয়েছে দান্তের যাত্রা-কল্পনার নিজস্ব তাৎপর্যে। টেনিসন যখন দান্তের সেই উল্লেখে প্রাণিত হয়ে য়ুলিসিস লিখলেন তখন তা হয়ে উঠল ভিক্টোরীয় মন্থরতা, এমনকি নিথরতা ও তার surface respectability থেকে উত্তরণের অভীপ্সা; এইভাবে কবির হাতে প্রমাণিত হয় এই সত্য যে ঐতিহ্য শুধু ইতিহাসনিবদ্ধ নয়—তা জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই চলে—'অন্যমনে চলি পথে, ভুলিনে কি ফুল/ভুলিনে কি তারা/তবুও তাহারা/প্রাণের নিশ্বাসবায়ু করে সুমধুর।'

দুই

মহাকাব্যের, পুরাণের, বা প্রাচীন গাথার সেই সব শক্তিধর চরিত্ররা আধুনিক কবির নব নব জিজ্ঞাসার বুন্ধুর ভূমিতে নতুন করে জাত হয়, নতুন করে মরে। হয়তো পুরোনো কাব্যের নৈর্ব্যক্তিক কঠিন ভূমিতে জাত বলে এঁরা এমনই শক্তিধর যে কালের হস্তাবলেপ তুচ্ছ করেই এঁরা নতুন প্রশ্নে সাড়া দিতে পারেন, এঁরা মৃত্যুহীন বলেই প্রশ্নের কাছেও এঁরা অমর—প্রশ্নেরাও এঁদের কাছে অফুরন্ত। এমনই একটি চরিত্র বাংলা কাব্যের পটভূমিকায় দিনে দিনে বিশেষ তাৎপর্য পেলেন—ইনি তৃতীয় পাণ্ডব, অর্জুন। অর্জুন. তিনি শুধু কৃষ্ণারই পাণিধর নন—মহাভারতের অধ্যায়ে অধ্যায়ে প্রেম তাঁকে ঘিরে স্তুতির মতো গুঞ্জরিত। লক্ষ্যভেদে সিদ্ধকাম, কুরুক্ষেত্রের নায়ক, বিরাটপুরীতে বৃহন্নলা, কৃষ্ণের বন্ধু, অশ্বমেধে অপ্রতিরুদ্ধ,—মহাভারতেও অর্জুনের মতো বর্ণাঢ্য চরিত্র আর নেই। অথচ ঐ কুরুক্ষেত্রেই আমরা দেখলাম একের পর এক প্রতিদ্বন্দ্বীদের পতন হল আর কেমন অজানতেই যেন স্খলিত হল অর্জুনরূপী অগ্নিবিহঙ্গমের একটি একটি উজ্জ্বলতার পালক। কীর্তি নিয়ে যায় তুঙ্গ থেকে তুঙ্গতর মহিমায়। কিন্তু বিনিময়ে কি নিয়ে আসে ম্লানিমা? পরিশেষে গাণ্ডীবও পরিহার করল গাণ্ডীবীকে। মহাপ্রস্থানের শেষ ব্যর্থতার আগে এ এক 'ব্যর্থ ধনঞ্জয়'। এ পার্থের নানা স্তর যে একালের কবিকুলকে নানা ভাবে স্পর্শ করবে এ তো স্বাভাবিক।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে, চক্ষুরুন্মীলনের নতুন দিনে, অর্জুনকে নতুন করে চিনে নেবার একটা তাগিদ অবশ্যই অনুভূত হয়েছে। নবীন সেন, গিরিশ ঘোষ, ক্ষীরোদপ্রসাদের মহাকাব্যে এবং নাটকে আমরা দেখেছি তৃতীয় পাণ্ডবের পুনঃপ্রবেশ—কিন্তু কাশীরাম দাসের দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভার নায়কের সেই আত্মপ্রত্যয়ী পদক্ষেপের দৃপ্ততা এ পুনঃপ্রবেশের মধ্যে খুঁজে পেলাম না।

পাওয়া বুঝি সম্ভবও ছিল না। ছিল না যে কেন সে কথা বুঝতে গেলে বাঙালীর—বিশেষত একালের বাঙালীর অর্জুন-চেতনার স্বরূপটি সূত্রাকারে ব্যাখ্যা করতে হয়। অর্জুন একালের বাঙালী মধ্যবিত্তের আত্মসম্বিত এবং আত্মোপলব্ধিকে শুধু যে বিচিত্রভাবে স্পর্শ করতে পেরেছেন তাই নয়—বাঙালী মধ্যবিত্তের আত্মঅধ্যয়নের আলোকে অর্জুনের সাফল্য-ব্যর্থতার কথাও পুনর্জীবিত হল। এই আত্মঅধ্যয়নের গুরুত্ব অনুসারেই একালের বাংলা কাব্যে অর্জুনের রঙফের ঘটেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্রের পর থেকে মধ্যবিত্ত মানসে কৃষ্ণের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে বিশেষভাবে। এ যুগের বাঙালীর প্রাথমিক পার্থ-কল্পনাতেও সেই কৃষ্ণ-ভাবনারই পরোক্ষ প্রতিবিম্বন। নবীন সেনের অর্জুন অথবা ক্ষীরোদপ্রসাদের অর্জুন শুধু সেই প্রতিফলিত কিরণের চান্দ্র সমুজ্জ্বলতায় দীপ্ত, তার বেশি কিছু নয়। এ যুগের মধ্যবিত্ত-চেতনা তার সদ্যোজাত উদ্যমের দিনে বিবাদে, প্রতিবাদে, সংঘাতে, সংগ্রামে একজন অথারিটির হাত ধরে চলতে চেয়েছিল। বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্র বুদ্ধির অহমিকাকে পরিচর্যা করেই এই অথারিটির কাছে বশ্যতার মনোভাবকে লালিত করেছে। এ যুগের তৃতীয় পাণ্ডব তাই কৃষ্ণচালিত, কৃষ্ণনির্দেশিত, কৃষ্ণভাবিত। কৃষ্ণ শুধু অর্জুনের রথেরই চালক নন—তিনি নায়কেরও অধিনায়ক।

রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা'-র অর্জুনই বাংলা সাহিত্যে প্রথম কৃষ্ণবিমুক্ত অর্জুন। এই প্রথম অর্জুন দেখা দিলেন তাঁর ব্যক্তিগত রূপ নিয়ে। অথারিটির এলাকার বাইরে দাঁড়িয়ে যুবক এবার নিজের দিকে তাকাল। চিত্রাঙ্গদার নারী-নিবেদনই অর্জুনকে মুগ্ধ করেছে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে নারীও ব্যবহৃত এবং ব্যবহার্য সামগ্রী। সম্ভোগের তীব্র মুহূর্তে অর্জুন চিত্রাঙ্গদার সেই ব্যবহার্য রূপ ও সত্তাকেই দেখেছে। তাই প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে, যশের ক্ষেত্রে, পুরুষ যখন ছুটে যায় তখন সেই সম্ভোগ-কেন্দ্রকে সে ক্ষণপ্রচ্ছায় হিসাবেই পরিহার করতে চায়। বুর্জোয়া সমাজে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নারী এভাবেই ব্যবহৃত অথচ অবজ্ঞাত। পার্বত্য দস্যুদের আক্রমণের বিরুদ্ধে অর্জুন যখন বন্যা-প্রতিরোধীর মতো উঠে দাঁড়িয়েছিলেন—তখনই চিত্রাঙ্গদার কাছ থেকে বিদায়-কামনা। এই ঘটনাই পরোক্ষে চিত্রাঙ্গদার স্বপ্নভঙ্গ ঘটাল। বর্ষভোগ্য যৌবনমায়া বিদায় নেবার আগেই চিত্রাঙ্গদার নবজন্ম হল এক কঠিন বাস্তব উপলব্ধির ভূমিতে। রবীন্দ্রনাথের আধুনিক কল্পনার চিত্রাঙ্গদায় আমরা পেলাম বুর্জোয়া সমাজে নারীর সীমাবদ্ধ ভূমিকার গ্লানিকে—কিন্তু তার থেকেও বেশি পেলাম অর্জুনের ভিতরে প্রেমের সীমাবদ্ধতাকে—প্রেম ও পৌরুষের দ্বিমুখী গতির অমীমাংসাজনিত বুর্জোয়া সমাজের সচেতন পুরুষের

স্বন্দনকে। চিত্রাঙ্গদার গর্ভস্থ সন্তানের হাতে এ সমস্যার মীমাংসা হতে পারে কিনা তা উত্তরপুরুষের বিচার্য বিষয়। চিত্রাঙ্গদার নবরূপায়ণের পরমুহূর্তেই অর্জুন উচ্চারণ করলেন তাঁর অনর্জুনত্ব—

ভাবিলাম
কত যুদ্ধ, কত হিংসা, কত আড়ম্বর
পুরুষের পৌরুষ, গৌরব, বীরত্বের
নিত্য কীর্তি তৃষা, শান্ত হয়ে লুটাইয়া
পড়ে ভূমে, ওই সৌন্দর্যের কাছে—

কীর্তিমুগ্ধ বুর্জোয়া-ভাবনা-দীপিত মধ্যবিত্তের এ এক বিচার-বিভ্রাট—জীবন থেকে বিযুক্ত হয়ে প্রেমিকার কাছে সান্ত্বনা যাচঞা। সেই মুহূর্তেই এই বিবর্ণ কীর্তি কলরব মনে হয় মিথ্যা—'সমাজ সংসার মিছে সব, মিছে এ জীবনের কলরব'। রবীন্দ্রনাথের অর্জুন সেই লব্ধকীর্তি মধ্যবিত্তের অচরিতার্থ-বোধের প্রতিনিধি হিসাবেই বলেন—

ভাবিতেছিলাম
আশৈশব জীবনের কথা, সংসারের
মূঢ় খেলা দুঃখ সুখ উলটিপালটি;
জীবনের অসন্তোষ, অসম্পূর্ণ আশা,
অনন্ত দারিদ্র্য এই মর্ত মানবের।

ইনি নবীন সেন বা ক্ষীরোদপ্রসাদের কৃষ্ণভাবিত, কৃষ্ণচালিত অর্জুন নন। ইনি নিজেই নিজের চালক। রবীন্দ্রনাথই প্রথম অর্জুনের অনর্জুনত্বকে, তার অনারোপিত রূপকে আবিষ্কার করলেন। ঊনবিংশ শতকের আত্মকীর্তিমুগ্ধ মধ্যবিত্তের প্রেমভাবনার প্রেক্ষাপটেই এই অর্জুনের পুরুষার্থ জিজ্ঞাসু হয়ে উঠল। অথচ সান্ত্বনা সহজেই প্রেমিককে নিক্ষিপ্ত করে অধিকতর উদ্দেশ্য-হীনতায়। তখনই প্রেমের বুর্জোয়া বিকার অধিকার-স্পৃহাকে জাগিয়ে দেয়, প্রেমকে তখনই মুক্তির উপায় বলে না ভেবে, বন্ধনের বিলাস বলে ভাবা হয়। তখনই আসে স্বাঙ্গীকরণের মোহ, আসে সংজ্ঞার্থের সন্ধান। আরো আসে প্রধানুগামিতার অভিলাষ, আসে আনুরূপ্যের বাসনা, তাই ক্লান্ত পার্থের কণ্ঠে বেজে ওঠে আর্তনাদ—

সুদুর্লভে, আরো কাছাকাছি এস।
নাম ধাম গোত্র গৃহ বাক্য দেহ মনে
সহস্র বন্ধন পাশে ধরা দাও প্রিয়ে।

চারিপার্শ্ব হতে ঘেরি পরশ তোমার,
নির্ভয়ে নির্ভরে করি বাস।· নাম নাই ?
তবে কোন প্রেম মন্ত্রে জপিব তোমারে
হৃদয়-মন্দির মাঝে ? গোত্র নাই ? তবে
কী মৃণালে এ কমল ধরিয়া রাখিব ?

অর্জুনের এই ক্লান্তি প্রকৃতপক্ষে প্রেমেরই ক্লান্তি তা বুঝতে পেরেই চিত্রাঙ্গদার নব জাগরণ। নব রূপায়ণ ছিল তার ভূমিকা।

তিন

সেই জাগরণ এ নাটকের শেষ দৃশ্যে অন্তিম সূর্যোদয়ে প্রতীকিত। কিন্তু সে সূর্যোদয়ে যতখানি চিত্রাঙ্গদার সংশয়াবসান, প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠা ; অর্জুনের কাছেও তাতে ঠিক ততখানিই ভ্রান্ত পৌরুষের একক অহমিকার পরিসমাপ্তি। এই আলোকে উত্তরণের জন্য অর্জুন-চিত্রাঙ্গদার চেতন-অর্ধচেতন প্রয়াস 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্যে একগুচ্ছ আলোক-অন্ধকারের চিত্রকল্পে আভাসিত। আলো-আঁধারের দ্বন্দ্বেও অনেক ছদ্মবেশী পরাজয় ও জয়। চিত্রকল্পগুলিতে তারই ইঙ্গিত। নাটকের শেষ সূর্যোদয়ে পেঁছানোর পূর্বে ঐ চিত্রকল্পমালা নাট্যময় কাব্যময় এক প্রস্তুতি রচনা করেছে।

১. উষার কনক মেঘ, দেখিতে দেখিতে
যেমন মিলায়ে যায়, পূর্ব পর্বতের
শুভ্র শিরে অকলংক নগ্ন শোভাখানি
করি বিকশিত। (অর্জুন)

২. সোনার সায়াহ্ন যথা ম্লান মুখ করি
আঁধার রজনীপানে ধায় মৃদু পদে। (অর্জুন)

৩. ক্ষণস্থায়ী
বাষ্প যথা উষারে ছলনা করে ঢাকে
যতক্ষণ সূর্য নাহি ওঠে। (অর্জুন)

৪. তুমি ভাঙিয়াছ ব্রত মোর। চন্দ্র উঠি
যেমন নিমেষে ভেঙে দেয় নিশীথের
যোগনিদ্রা অন্ধকার। (অর্জুন)

৫. তোমারে হেরিয়া বুঝিতে পেরেছি আমি
কী আনন্দ কিরণেতে প্রথম প্রত্যুষে

অন্ধকার মহার্ণবে সৃষ্টি শতদল
দিগ্বিদিকে উঠেছিল উন্মেষিত হয়ে
এক মুহূর্তের মাঝে। (অর্জুন)

৬. শ্রান্ত হাস্য লেগে আছে ওষ্ঠ প্রান্তে তাঁর
প্রভাতের চন্দ্রকলা সম, রজনীর
আনন্দের শীর্ণ অবশেষ। (চিত্রাঙ্গদা)

৭. সেই দৃষ্টি
রবিরশ্মি সম চিররাত্রি তাপসিনী
কুমারী হৃদয় পদ্মপানে ছুটে এল। (চিত্রাঙ্গদা)

৮. অরুণ লাবণ্য লেখা চির নির্বাপিত
উষার মতন, যে রমণী আপনার
শতস্তর তিমিরের তলে বসে থাকে
বীর্য শৈলশৃঙ্গ পরে নিত্য একাকিনী
কী অভাব তার! (চিত্রাঙ্গদা)

৯. প্রভাত প্রকাশে
বিচিত্র বিস্ময়ে যেন ফুটিবে চৌদিক
প্রতীক্ষা করিয়া আছি উৎসুক হৃদয়ে। (অর্জুন)

১০. আজ রাত্রে তবে
এ মুমূর্ষু রূপ মোর শেষ রজনীতে
অন্তিম শিখার মতো শ্রান্ত প্রদীপের
আচম্বিতে উঠুক উজ্জ্বলতম হয়ে। (চিত্রাঙ্গদা)

সূর্য-চন্দ্র-রাত্রি-দিনের এই চিত্রকল্প-মালায় সূর্য সত্যের প্রতিনিধি। চন্দ্র এখানে আলোর কুহক—সত্যের ছলনা। উদ্ধৃত অংশগুলির ৪ এবং ৭-সংখ্যক অংশে যোগ এবং তপস্যা-প্রসঙ্গ বিষয়টির রসগত তাৎপর্যকে স্পষ্ট করে তুলেছে। যোগভঙ্গের জন্য মায়াবিনী ছলনার ব্যবহারের জনশ্রুতি পুরাণ-সমর্থিত। তাই ৪-সংখ্যক উদ্ধৃতাংশে চন্দ্র সত্য নয়—অর্জুনের উপলব্ধিতেও নয়—মধ্যবিত্ত মানসে প্রেমের আকস্মিক আবেগেও প্রেমের সত্য নেই—যা আছে তা সত্যের কুহক। পক্ষান্তরে ৭-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে রবিরশ্মি তপস্যাক্লিষ্ট সত্যধর দেবতার সঙ্গে তুলনীয়। চিত্রাঙ্গদার দিক থেকে—নারীর সমগ্র ব্যক্তিত্বের পূর্ণায়ণের পথে তা এক পরম উপক্রমণিকা। ৮-সংখ্যক উদ্ধৃতির উষা চির নিঃসঙ্গ অথচ চরিতার্থতার জন্য ব্যাকুল নারীর আর্তিকে, অস্বিষ্টকে

বাঙ্ময় করে তুলেছে। এইটাই এই চিত্রকল্প-মালার পরমোজ্জ্বল মণি। 'ভাবসংবেগের প্রাবল্যে এবং অবৈকল্যে সে নাটিকা রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রায় অদ্বিতীয়' বলেই তার ছন্দে অমিত্রাক্ষরের সমুদ্রতরঙ্গ ধ্বনিত না হলেও, সংক্ষুব্ধ পার্বত্য নদীর ধ্বনিবৈচিত্র্য তাতে লভ্য। পুরাণ-প্রসঙ্গের ব্যবহারে সময়পুষ্ট কল্পনার প্রয়োগে আঙ্গিককেও এসেছে অবৈকল্য এবং নির্ভুল বিন্যাস। যে বাগ্‌বাহুল্য 'রাজা ও রানী'-র শেষাংশকে করে তুলেছে মন্থর সেই বাগ্‌বাহুল্য সত্ত্বেও 'চিত্রাঙ্গদা'-র সক্রিয়তা হারিয়ে যায় নি। অর্জুনের আত্মবিশ্লেষণ ও চিত্রাঙ্গদার আত্মজিজ্ঞাসার ফলস্বরূপ টেনশন এই ছন্দের কাঠামোকে নাট্যোপযোগী সার্থকতা এনে দিয়েছে।

চার

তিরিশের বাংলাদেশে সময়চেতনা ও সমাজচেতনার সাযুজ্যে অর্জুন পুনর্জীবিত হলেন বিষ্ণু দে-র 'পদধ্বনি' কবিতায়। চিত্রাঙ্গদা'-র অর্জুন যে পরিমাণে লিরিক্যাল, 'পদধ্বনি' কবিতার অর্জুন সে পরিমাণেই নাট্যরসান্বিত। অর্জুনের আত্যন্তিক ব্যর্থতার আর্তি এই নাতিবৃহৎ কবিতাটির সমগ্রার্থ। স্মৃতির ঐশ্বর্য এবং কালের প্রহারের অনিবার্যতায় যে বৈপরীত্য, তার সহাবস্থান ঘটিয়ে প্রথম শ্রেণীর নাটকীয় স্বগতোক্তির অবকাশ সৃষ্টি করা হয়েছে। পদ-ধ্বনির কবি তার সমুজ্জ্বল সদ্ব্যবহার করেছেন। সমস্ত মহিমোজ্জ্বলতার চূড়ার নির্বাপণের প্রাঙ্মুহূর্তে অর্জুনের যে মনোলোল্য, যে মথিত স্মৃতির শিয়রে বর্তমানের অসহায়তা—তাই কবিতাটির থীম্। বিষ্ণু দে-র হাতেই এই থীমের আধুনিক পুনর্জীবন ঘটেছে প্রথম। তারপরে এই বিষয়ের দ্বারে কবিরা আরো দু একবার উপনীত হয়েছেন।

ইতিহাসের চলিষ্ণু দীপশিখার ব্যবহার দুরূহ। এ আলোকরশ্মিকে ব্যবহার করতে হলে চাই বস্তুজ্ঞান এবং আলোকপরিমাণ-বোধ—দুইই। এই দুয়ের সমন্বয় বড় কবির প্রতিভাসাপেক্ষ। 'চিত্রাঙ্গদা'-র অর্জুনের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি তার শৈল্পিক সার্থকতায় এবং ব্যত্যয়ে কবির সমকাল, তার সফলতা এবং দুর্বলতা সমেত মূর্ত হয়েছে। 'পদধ্বনি' কবিতায় কবি সময়ের, ইতিহাসের সেই লীলাময় রূপান্তরকে আর এক লগ্নে আবিষ্কার করেছেন নিজেরই ত্রিকাল-বিস্তৃত দৃষ্টিতে। এই আবিষ্কারের তীব্র মুহূর্তের প্রেরণাতেই জন্ম নিয়েছে এই কবিতার শব্দ-বিন্যাস, তার গাঠনিক সিদ্ধি। 'পদধ্বনি'র অর্জুন 'চিত্রাঙ্গদা'-র অর্জুন নয়। 'চিত্রাঙ্গদা'-র অর্জুন কীর্তিমুগ্ধ অর্জুন, কীর্তি-মুখী তার কর্মৈষণা। কিন্তু মধ্যবিত্তের স্বর্ণযুগ দেখতে দেখতে লীন হল

অস্তসূর্যের রঙরেজিনীর খেলায়। শক্তির অবক্ষয় নয়, শক্তির রূপান্তর ; সে রূপান্তরের অবশ্যম্ভাবিতা 'পদধ্বনি' কবিতার বিষয়। দুই শতাব্দীর অর্জুন বাঙালী মধ্যবিত্তের উত্থান ও পতনের দুই বৃত্তের সূচক। সেদিন সেই উনিশশো আটত্রিশে, যখন নূতন সামাজিক শক্তির অভ্যুদয়কে বাঙালী মনীষা অনিবার্য বলে মনে করেছিলেন, যখন মধ্যবিত্তের একক অহমিকার অনেকখানিই ছিল পতনোন্মুখ, 'পদধ্বনির'-র অর্জুন সেদিনের সময়বর্তী স্বন্দ্বাহ্বানকে গ্রহণ করেছে। তার খেদোক্তির পরিমণ্ডলে ছিল স্মৃতির বিলীয়মান স্বর্ণাভা—তার সম্মুখে স্পন্দিত ছিল ইতিহাসের ভবিতব্য।

'পদধ্বনি' কবিতায় 'স্মৃতি' তাই পুনরাবৃত্ত শব্দ। 'মন্থিত স্মৃতির রাত্রে শালীন ঐশ্বর্যে স্বপ্নে বিচ্ছুরিত ঘুম', 'স্মৃতির বাসর', 'স্মৃতির ঐশ্বর্যে ধনী', 'দন্তুর ভয়াল/প্রাক্তন পৃথিবী ওঠে নিজস্ব স্মৃতির, করাল অতীত নিয়ে, আমার অতীতে', 'স্মৃতি তার দ্বারকায় অবসর বিনোদনে লোটে', 'স্মৃতি তার কদম্ব ছায়ায়'—অর্জুনের পুরাণ-পোষিত, তথা উনিশশো আটত্রিশের মধ্যবিত্ত নায়কের ইতিহাস-সমর্থিত কীর্তির প্রসংগসূচক এই শব্দপুঞ্জ। কিন্তু মহাভারতকার জানেন, ইতিহাসবেত্তা কবিও জানেন, সব কীর্তির ক্ষয় আছে। তাই কুরুক্ষেত্রের জয় মহিমাকে স্মৃতিতে লগ্ন রেখে দস্যুদের সমাসন্ন পদধ্বনির সামনে শেষ আত্ম নির্বাপণ—'চোখে তার কুরুক্ষেত্র কানে তার মত্ত 'পদধ্বনি'। সেই স্মৃতি এই লগ্নে এত মূল্যবান বলেই সুভদ্রা-সম্ভাষণ এই কবিতায় এত তাৎপর্যময়। সুভদ্রাহরণ এক হিসাবে পুরাণোক্ত অর্জুনের সর্বাপেক্ষা ব্যক্তিগত জয় এবং ব্যক্তিগত সিদ্ধির কাহিনী। সুভদ্রাই অর্জুনের স্বাধীন পদক্ষেপকে একদা আকর্ষণ করেছিল। তাই সুভদ্রা বীর জননী। তাই স্বাভাবিক সুভদ্রা-সম্বোধন। এ মধ্যবিত্তও কি একদা সামন্তযুগীয় বন্ধন ছিঁড়ে এমনি করেই তার ব্যক্তিক চরিতার্থতাকে ত্বরান্বিত করেনি? আজ কালান্তরের লোহিত লগ্নে, ক্ষমতা হস্তান্তরের করুণ গোধূলিতে সেই স্মৃতিই কি তাকে বিষণ্ণ করে তুলছে না? করে তুলছে না স্বন্দ্বময়? পদধ্বনির পরিসমাপ্তিতে পার্থের সেই স্বন্দ্বময় আর্তি কবির আধুনিক কল্পনার দান। মোহ এবং মনীষা, অহমিকা এবং ভবিষ্যৎ-বোধ দুয়ের মিশ্রণে কবির সৃষ্ট এই নায়ক যেমন তাকিয়ে আছে তার ঐতিহাসিক পরিসমাপ্তির দিকে তেমনি তার দৃষ্টি ন্যস্ত রয়েছে ভাবীকালে। সেই মনীষাই ইঙ্গিত তুলছে—'একি নব অবতার? এ কি যুগান্তর?' আবার পরক্ষণেই সেই মোহই সংশয়ের আবছায়া সৃষ্টি করেছে—'দস্যুদল উদ্ধত বর্বর'। মনীষা সেই দস্যুদলের প্রাণৈশ্বর্যের প্রতি অচেতনভাবে প্রশংসমান। পার্থের ব্যর্থতার মধ্যে 'পদধ্বনি'-র কবি ট্র্যাজেডির কারুণ্য এবং

নিয়তিসম্ভ্রমকে সঞ্চারিত করতে চাননি। প্রচণ্ড ভূমিকম্পের বিপর্যয়ক্ষণে একক মহিমার গিরিচূড়ার বৈকল্য যেমন এক হিসাবে আরও শক্তিমান এক প্রাকৃতিক সত্তাকে স্বীকৃতিদান, অর্জুনও তেমনি এই নবপর্যায়ে 'আপন বাহুর সাহসী বুদ্ধিতে দৃপ্ত ভবিষ্যে নির্ভর' দস্যুদলের আবির্ভাব-মুহূর্তে হতবীর্য। সেই আবির্ভাবের প্রকারান্তর sublimity অর্জুনের ব্যক্তিগত ব্যর্থতাকে গৌণ করে দিয়েছে। আমরা আগেই বলেছি যে, পুরাণ-প্রসঙ্গের ব্যবহারে আধুনিক কবি আসলে নিজের সমকালের জটিল চ্যালেঞ্জকেই গ্রহণ করেন। ইতিহাসের উৎক্রান্তির উদ্বেগ, তার সন্ধিলগ্নের উত্তেজন পুরাণ-প্রসঙ্গের ভিতর দিয়ে কালোত্তরণের ইঙ্গিত পায়। সেই উদ্বেগ এবং উত্তেজনার ছন্দ এবং লয়, সকল যুগে সমপ্রকৃতির নয়। 'চিত্রাঙ্গদা'-র অর্জুনের স্বগতোক্তি-কল্প ভাষণে এবং 'পদধ্বনি'-র অর্জুণের সুভদ্রা-সম্ভাষণে তাই এত প্রভেদ। 'চিত্রাঙ্গদা'-র অর্জুন বাঙালী মধ্যবিত্তের সেই সময়ের পটে ধৃত, যে সময়পটে মধ্যবিত্তের প্রতিষ্ঠা ছিল নিঃসংশয়। তার প্রেম যে সংশয়াকুল হয়ে উঠল, সেও প্রতিষ্ঠাকে সংশয়াতীত বলে জেনেই। তাই 'চিত্রাঙ্গদা'-র অর্জুনের মধ্যে অশান্ত যন্ত্রণা নেই, নেই চঞ্চলতা। কিন্তু 'পদধ্বনি'-র অর্জুন জিজ্ঞাসাচঞ্চল। তার দেউলিয়া দেবতা আজ নেপথ্যে নিষ্ক্রান্ত। অর্জুনের সংকট তার প্রতিষ্ঠারই সংকট। মধ্যবিত্তের নায়কত্বের পতনের কাল সেটা। কাজেই অর্জুনের বার্ধক্য সেখানে স্মৃতিকে আকর্ষণ করেছে বারে বারে। স্মৃতির দীর্ঘ ছায়ায় অর্জুনেরই দীর্ঘতর অতীত কীর্তির আত্মাবলোকন। ব্যর্থতার বোধ সেই স্মৃতির পটকে উজ্জ্বল করে তুলছে। অথচ এ-ব্যর্থতার বোধ পার্থকে অভিভূত করেনি। তার মনীষাই তাকে ইতিহাসের দুরূহ পাঠে সমাধান এনে দিয়েছে। 'পদধ্বনি'-র পার্থ যে ব্যর্থতার কথা স্বীকার করেছে তা সুভদ্রার কাছে ইতিহাসের অমোঘ নিয়মের ব্যাখ্যাছল মাত্র।

পাঁচ

বিষ্ণু দে-র 'পদধ্বনি'-র অর্জুনের সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর 'কালসন্ধ্যা'-র অর্জুনের সময় ব্যবধান তিরিশ বছর। এই তিরিশ বছরে মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের, তার প্রবল আত্মবিশ্বাসের পাদমূলে সময়ের ফেনিল ঢেউয়ের ছোবল পড়েছে অনেক। একদা যার আত্মবিশ্বাস ছিল প্রত্যয়ী ন্যগ্রোধের মতো দৃঢ় অথচ বহুমূল, আজ কালের বৈগুণ্যে সে মূল-ভূমি ক্ষয়ে গেছে। 'কালসন্ধ্যা' নির্দিষ্ট অর্থে রূপক নয়। তবু 'কালসন্ধ্যা' কাব্যনাট্যের কৃষ্ণ ইতিহাস-পুরুষ। অর্জুন ইতিহাস-চালিত মধ্যবিত্ত-নায়ক। তার আত্মসন্তুষ্ট বিশ্রামের

উপকণ্ঠেই গড়ে উঠেছে সর্বাতায়ের অলক্ষ্য আয়োজন। এখানে অর্জুনের চেতনায় যে বস্তুদর্শন ফুটে উঠল তা এক প্রাচুর্যপুষ্ট সমাজের উচ্চমধ্যবিত্তের স্থূল সন্তুষ্টির ক্লান্তির সংগে তুলনীয় :

ইদানীং সব চলে মৃদু ছন্দে, সূর্য ওঠে, ডুবে যায়,
নিশ্চিন্তে কৃষক করে কৃষিকর্ম, বেদমন্ত্র জপেন মুনিরা,
অর্থাৎ দিন ও রাত্রি নিতান্তই অভ্যস্ত, দৈনিক।
অবিরাম নিরাপত্তা ও বিশ্রামে, আমি
কিঞ্চিৎ হয়েছি ক্লান্ত।

এ ক্লান্তিও যথার্থ অর্থে ক্লান্তি নয়—ক্লান্তির বিলাস। অর্থাৎ এই ক্লান্তির কারণে এ চরিত্র যাবে না নিসর্গের সান্তনা বা প্রেরণার কাছে, হবে না মানুষের অন্তহীনতার মুখাপেক্ষী। এমনকি নিজের নিভৃত নৈঃসঙ্গ্যের মুখোমুখি হয়ে জগৎ-জীবনের নিহিতার্থের সন্ধানীও সে হবে না। এ অর্জুন তথা এই মধ্যবিত্ত নায়ক আর ইতিহাসেও বিশ্বাস করে না, ইতিহাসও বুঝি তাকে বিশ্বাস করে না। এদিকে কৃষ্ণ যে আত্মগ্লানিতে ভারাক্রান্ত তা ইতিহাসের দেবতার পক্ষপাতজনিত আত্মগ্লানি। তিনিই কর্তা, অর্জুন শুধু ক্রিয়া। কর্তার অন্তর্ধানে ক্রিয়া হারাল তার গতি, এবং কাল বা কালান্তর সৃষ্টির ক্ষমতা। 'কালসন্ধ্যা'-র অর্জুন অবশ্যই জানে যে, গিরিশ কিংবা ক্ষীরোদ-প্রসাদের অথরিটিভক্ত অনুবর্তীর দিন সে-শতাব্দীতেই শেষ হয়েছে। এখন এই নিদারুণ পতনের মুহূর্তে কালগর্ভে নিমজ্জিত তার অথরিটি—তার ভাবনিয়ামক। এই পতনের আলেখ্য 'কালসন্ধ্যা' নাটকে নাট্যগুণান্বিত হয়েছে কৃষ্ণের সংযত শান্ত আত্মসংবরণের দৃশ্যে, অর্জুনের আসন্ন সন্ধ্যা-চেতনায়।

কৃষ্ণের অন্তর্ধানে অর্জুনের বিহ্বল আত্মধিক্কার অভাবিষ্য চিত্তক্ষোভের সূচক। সমস্ত মূল্যবোধের ভাঙনের শিয়রে দাঁড়িয়ে এ মধ্যবিত্ত উপলব্ধি করেছে তার নিরভিভাবক এবং অধ্রুব সত্তার অসহায়তা :

শ্রুতি নেই শ্রবণে, দ্যাখে না চক্ষু, ত্বকে আর নেই স্পর্শবোধ,
ইন্দ্রিয়ের অন্তরালে স্ফুলিঙ্গ জ্বলে না—
নির্বাপিত, নষ্টবল, নিঃশেষ অর্জুন,
ধিক তোকে, ধিক তোকে, ধিক শতবার !

একদা যেসব নানারূপ অথরিটিকে আশ্রয় করে উনিশের শতকে এই মেধাবী এবং তীক্ষ্মমনা নায়ক ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, আজ মহাকালের হাতে সেই সব আশ্রয়ের পতন ঘটল। নায়কের ঔজ্জ্বল্যও সঙ্গে সঙ্গে গ্রস্ত-সূর্যের রুগ্ন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হল। এ কালসন্ধ্যায় অর্জুনেরা আর নায়ক নয়, ধর্ষিত

লাঞ্ছিত যদুরমণীদের শীৎকার ও চিৎকারের মাঝখানে, ক্লীবের ক্ষোভই বড়জোর সম্বল। এ নাটকে তারই প্রতিফলন। কিন্তু তাহলে তো মেনে নিতে হয় জীবন খণ্ডিত, এবং নাটকও নানা খণ্ডতায় ভগ্নভিত্তি চিত্রল প্রাসাদ। 'কালসন্ধ্যা'-র নায়ক কৃষ্ণ। কিন্তু তিনি ইতিহাস-পুরুষ বলেই নিষ্প্রতিরোধ। তিনি জানেন সকলেই, সকলই 'কালদষ্ট'। আর তিনি কালদ্রষ্টা। নামমাত্র পরিশ্রমে তিনি সমাসন্ন আর ঘটমানতার মাঝখানের ক্ষুদ্র ভেদরেখাটি তুলে দিলেন। যদি কারো মনে কোন মোহ থাকে তবে তাও অচিরে হবে রূঢ় অবসিত।

আমাদের বর্তমান আলোচনার প্রেক্ষাপটে ও নাটকে একথাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, মধ্যবিত্তের নায়কত্বের অবসান বর্তমানের ভবিতব্য। কিন্তু নাট্যকার যখন পুরাণের আলোকে বর্তমানকে পাঠ করেন, তখন বর্তমানের বর্তমানতাটুকু ছাড়িয়ে তিনি দুদিকে যেতে পারেন। এক হতে পারে, বর্তমানকে পুরাণের আলোকে রেখে পুনর্বিচার; আর হতে পারে পুরাণকে সেই অর্থদ্যোতনায় সম্মত করা, যাতে বর্তমান ইঙ্গিত পায় ভবিষ্যতের। 'কাল-সন্ধ্যা'-য় সে পুনর্বিচার বা ইঙ্গিত নেই। তাই অর্জুন যখন ব্যাসদেবের কাছে ইতিহাসের শ্মশানবৈরাগ্যের পাঠ নেয়ঃ

তুমি শুধু নিক্ষেপ করেছ শর
যারা হত, তাদেরই উদ্দেশে।
তুমি নও ধনঞ্জয়, জিষ্ণু, পরন্তপ—
সব তিনি।

অথবাঃ

যা কিছু সময়োচিত তাই যথাযথ।

অথবাঃ

…যাকে লোকে ভাবে যুগান্তর
কিন্তু যা নিতান্ত পুনরাবৃত্তি, শুধু বধ্য ঘাতকের স্থান বিনিময়।

—তখন তা জীবন-সংক্রান্ত কোনো বোধি নয়, পরাভূত, ভূমিকাহারার আত্মসান্ত্বনা। কিন্তু এ সান্ত্বনা কোনো নূতন উদ্যমের উপক্রমণিকা নয়—সব উদ্যমের অবসান। বিশ্বজোড়া মধ্যবিত্তের মহাপতনের অনিবার্যতাকে বিধিলিপি বা ইতিহাসলিপি বলে মেনে নিলে আর কিছু ভাবার থাকে না। জীবনেও না, নাটকেও না। এই নাটকও তাই কোনো গূঢ় নাটকের বশবর্তী হল না। শুধু একদল বর্বরতা, যাকে এই ধরনের অভ্যাসিকতাদুষ্ট মধ্যবিত্তের ব্যক্তিগত চিন্তায় জনগণের অভ্যুত্থানের নামান্তর বলে মনে করা হল, তার প্রমত্ত কোলাহলের

সম্মুখে চিত্রার্পিত রইল এক অতীত ইতিহাস। কবি বুদ্ধদেব যাকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বলে লালন করে এসেছেন, তা ব্যক্তির আত্মতোষণের অভিমান মাত্র, তার স্বাভিজ্ঞান নয়। তাই তাঁর অর্জুন শেষ অবধি এ কথাই বুঝে যায়;—জীবন অবজ্ঞেয়। কবি আমাদের বোঝাতে চান জীবনের চেয়ে শিল্প বড়—'একমাত্র অক্ষরেই নির্ধারিত এদের উদ্ধার'। সম্ভবত সে কারণেই, সেই ভূমিকাহারা নায়কের সান্ত্বনাহীন বর্তমানের কথা স্মরণে রেখেই আর একজন বাঙালী কবি অর্জুনের এই প্রচণ্ড পরাভবের রূপকে সান্ত্বনার অন্বেষায় ভেবেছেন ঃ

···অনেকে
সেই ঘোর সংকটের মুহূর্তে সেদিন—
অর্জুনকে নয়—
অরণ্যের এক দল আভীর দস্যুকে
প্রাপণীয় প্রেমিক পুরুষ বলে সাগ্রহে বরণ করেছিল।
জেনে রাখো
কোথায় আমার লজ্জা, কোথায় আমার পরাজয়।

(অকাল সন্ধ্যা / নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী)

'কালসন্ধ্যা'-র অর্জুন নেতৃত্বের ভূমিকাবিচ্যুত মধ্যবিত্ত ; জনগণের উত্থান যার চোখে বর্বরতা মাত্র। সে 'বর্বরতা'-কে প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও ইতিহাসই তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। 'অকাল সন্ধ্যা'-র নায়ক এক্ষেত্রে আবার আত্মগ্লানি স্খালনের প্রয়াস পেয়েছে। ক্লৈব্যের অপবাদকে সে এড়াতে চায়। তার বক্তব্য, তার ভূমিকা সে পালন করতে পারেনি নয়, পালন করতে চায়নি। চতুর্দিকবর্তী লাম্পট্যের মাঝে সে এখনো আপন সাধুত্বের অভিমানটুকু বাঁচিয়ে রাখতে চায়। 'কালসন্ধ্যা'-র অর্জুনের সঙ্গে 'অকাল সন্ধ্যা'-র অর্জুনের পার্থক্য এই মাত্র। তা নইলে, বর্তমান পরাভবের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়ে উভয়েই সমান ব্যর্থ। বিংশ শতাব্দীর ছয়ের দশকে এশীয় ভূখণ্ডে ভিয়েতনামের প্রতিবেশী দেশের কবির এই বিভ্রান্তি অসঙ্গত। এই বিভ্রান্তিই অর্জুনকে ভুল পরিচয়ে চিহ্নিত করে। নাটকও তখন জীবনের ভুল ব্যাখ্যায় নাটকীয়তা হারিয়ে ফেলে। সূর্যগ্রহণকে সন্ধ্যা বললে ভুল আবেগ মিথ্যা প্রশ্রয় পায়।

সময়গ্রন্থির কবি: জীবনানন্দ

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-র হেমন্তের জগতে স্বভাবতই ফুলের প্রসঙ্গ প্রায় অনুচ্চারিত। ইএট্‌স যে-অর্থে ডরোথি ওয়েলেসলিকে বলেছিলেন, Why can't you English poets keep flowers out of your poetry ?—কবি জীবনানন্দের এই ফুল-বিমুখতার সঙ্গে সে অর্থের কোনো সংযোগ নেই। এই অনুচ্চারণ একটা অস্তিবাচক সত্য। আমরা যখন রবীন্দ্রনাথ-সত্যেন্দ্রনাথ-নজরুলের রৌদ্ররাগ এবং পুষ্পরাগের পরিমণ্ডল পেরিয়ে সেই ধূসর ম্লানতায় প্রথম প্রবেশ করলাম তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। যে-সন্ধ্যায় মনে হয়, সূর্যাস্তের ওপারের সূর্যের কথা, এ সন্ধ্যা সে সন্ধ্যা নয়। এ হেমন্তের সন্ধ্যায় যেন কোনো দুর্মর অন্ধকারের বার্তা পাওয়া গেল। তাই 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-তে কবিসত্তার স্বনিয়মী স্বাভাবিকতায় ফুলেব ব্যবহার ঘটেনি বললেই হয়। কদাচিৎ এক আধটি শসাফুল, বিনষ্ট শসার পাশে, অথবা বাসি বকুল বা ছেঁড়া করবীর এক আধটি পাপড়ি ফুলের স্মৃতি মাত্র জাগিয়ে রাখে। নতুবা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-তে ফুল নেই। ফুল নেই সে সন্ধ্যায়—সে অভাবিত্য অস্পষ্ট অনালোকে মৃত প্রেমিকাদের মুখের মতো বিমর্ষ নক্ষত্রেরা ফুটে আছে। জীবনানন্দের সমগ্র কবিজীবনে অতঃপর নক্ষত্র স্থায়ী কাব্যপ্রসঙ্গ। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-তে এবং কমবেশি তারপরেও জীবনানন্দ শুধু হেমন্তের কবি নন—হেমন্ত সন্ধ্যার কবি। কেবলমাত্র হেমন্তের অনুষঙ্গ, অন্ততঃ বাংলাদেশে কিছুতেই বিষণ্ণতাবাচক নয়। হেমন্তের অনুষঙ্গে ফসল তোলার আশা-আনন্দই বাঙালী কৃষকের মনে জড়িত। কিন্তু হেমন্ত সন্ধ্যার নিরুদ্যমতাকে জীবনানন্দ অন্যতর অর্থে নিযুক্ত করতে পেরেছেন। বিশ্বব্যাপী যে মন্দা বাঙালী যুবকেরও উত্তাপ ও উৎসাহকে জুড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিল, জীবনানন্দের হেমন্ত-সন্ধ্যা কতকাংশে সেই নিরুদ্যমতার প্রতীক। আর গভীরতর অর্থে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-তে ক্রমশই একটা কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, জীবনানন্দ মানুষের বিপন্ন সৌন্দর্যবোধের কবি। আক্ষরিকভাবে বাস্তব-বাদিতাকে যদি বেশি প্রশ্রয় দেওয়া যায় তাহলে আবারও বিপন্ন সৌন্দর্যবোধের প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যার জন্য প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর জীবনের মন্দস্রোতের কথা ওঠে। কিন্তু এ সৌন্দর্যবোধের বিপন্নতারও ইতিহাস আছে। হয়তো তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে রোমান্টিকতার ভাবসংকটের জের ; জড়িয়ে আছে শিল্পবিপ্লবের পরবর্তী ব্যক্তির আত্মচ্যুতির অভিজ্ঞতা ; জড়িয়ে আছে ক্রমবর্ধমান আত্মসম্বিতের

ফলে সঞ্জাত ব্যক্তির নৈঃসঙ্গ্যের চেতনা। হয়তো শেষ পর্যন্ত এই সবকিছুরই ফলে কবিচেতনার তরঙ্গ এক উপলব্ধির তটে প্রহৃত হয়েছে—'মৎস্যকন্যাদের গান আমাকে উদ্দেশ্য করে নয়'। কবি জীবনানন্দের মধ্যে মানুষের সেই বিপন্ন সৌন্দর্যবোধের চেতনা নক্ষত্রের প্রতীকে রূপস্থ হয়ে উঠেছে। 'বেরিন তরঙ্গের নিটোল মুক্তা প্রবাল', আর, নারকোল-নাড়ু বিতরণকারিণী বাসমতী চালধোয়া-হাতে বিনুনি-বাঁধা মেয়ে সেই চেতনারই ইঙ্গিত নিয়ে পরে দেখা দিয়েছে।

বিষণ্ণ হেমন্তের যে অন্ধকারে প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষের এবং সভ্যতার তৎকালীন নিরাশ্বাস উদ্যমহীনতার ছায়া, সে-অন্ধকারে সচেতন-ব্যক্তি আত্মসম্বিত অর্জনের যে সুযোগই নিক, তার বিষণ্ণতায় কোনো সন্দেহ নেই। এ অন্ধকারে নক্ষত্রই একমাত্র আশ্রয়। রবীন্দ্রনাথের সূর্যের আলোকে যে অনাহত সৌন্দর্যচেতনা পরম প্রত্যয়ের সঙ্গে বিকীর্ণ হয়েছে, আলোছায়ার বিচিত্র আলপনা এঁকেছে, জীবনানন্দীয় জগতে সে প্রত্যয় নেই—থাকার কথাও নয়। অন্ধকার সেখানে সমাসন্ন, কুয়াসায় কম্পমান নক্ষত্রটুকুই সেখানে ভরসা। তখন আমরা কেউ কেউ ভেবেছি যে, সূর্যের আলোকে সেখানে জীবনের প্রসন্ন পাঠ সম্ভব নয়, নক্ষত্রের অস্পষ্ট আলোকেই সেই অন্ধকারকে যথাসম্ভব এড়াতে হবে। এই নক্ষত্র প্রেমের প্রতীক, এই নক্ষত্র শাশ্বত জীবনের প্রতীক, এই নক্ষত্র ব্যর্থ মানুষের সন্ধ্যায় নিজের কাছে (নীড়ে) ফিরে আসার প্রতীক। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-র এই কম্পমান নক্ষত্রকে দেখলে একথা মনে না হয়ে পারে না যে, জীবনানন্দ যতটা নতুন চেতনার উন্মেষের কবি, তার চেয়ে তিনি অনেক বেশি পুরাতন চেতনার বিদায়ের কবি। সৌন্দর্যের মতোই মানুষের সম্ভোগের বিপন্নতাকে জীবনানন্দ উপলব্ধি করেছেন। তাঁর পঞ্চেন্দ্রিয়-বাসনায় জীবনের স্বাদুতার স্মৃতি দুর্মর, কিন্তু মুমূর্ষু।

ক. বাতাসে ঝিঁঝিঁর গন্ধ—বৈশাখের প্রান্তরের সবুজ বাতাসে !
নীলাভ নোনার বুকে ঘন রস গাঢ় আকাঙ্ক্ষায় নেমে আসে ;

ক. ভালোবেসে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,
অবহেলা ক'রে আমি দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,
ঘৃণা ক'রে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে ;

নীলাভ নোনার বুকে রস ঘন হয়ে আসা, অথবা 'মেয়েমানুষ' শব্দটির প্রয়োগে নিঃসন্দেহে সেই গুণ প্রকাশমান বুদ্ধদেব যাকে বলেছেন শারীরিকতা। কিন্তু এ শারীরিকতাকে কোনো অর্থেই পঞ্চেন্দ্রিয়পরায়ণতা বলা যাবে না। বরঞ্চ একে বলা যাবে পঞ্চেন্দ্রিয়ের স্মৃতিসচেতনতা। উদ্ধৃত অংশ দুটিতে পঞ্চেন্দ্রিয়-পরায়ণতার লক্ষণ যতটা পরিস্ফুট, তার চেয়ে বেশি ফুটে উঠেছে পঞ্চেন্দ্রিয়-

আকুলতা। যৌবনের অস্তায়মান রক্তরাগকে দেখে ক্লান্ত প্রৌঢ়ের যে করুণ স্মৃতি এক অশরীরী আকুলতার জন্ম দেয়, এই আকুলতা সেই জাতীয়। এখানেও সন্ধ্যার স্মৃতি অনিবার্য কাব্য-প্রসঙ্গ হিসাবে দেখা দিয়েছে। এই সন্ধ্যার আকর্ষণেই ফুটে উঠেছে জীবনানন্দের নক্ষত্রেরা ঃ

ক. তুমি আর আমি
ঠাণ্ডা ফেনা ঝিনুকের মত চুপে থামি
সেইখানে রব প'ড়ে !—
যেখানে সমস্ত রাত্রি নক্ষত্রের আলো পড়ে ঝরে।

খ. মানুষের অন্তরের অবসাদ—মৃত্যুর জড়তা
সমুদ্র ভাঙিয়া যায় ;—নক্ষত্রের সাথে কয় কথা
যখন নক্ষত্র তবু আকাশের অন্ধকার রাতে—
তখন হৃদয়ে জাগে নতুন সে এক অধীরতা,
তাই ল'য়ে সেই উষ্ণ-আকাশেরে চাই যে জড়াতে
গোধূলির মেঘে মেঘ, নক্ষত্রের মত র'ব নক্ষত্রের সাথে।

গ. জীবন পুড়িয়া যায়--আমরাও ঝরে পুড়ে যাই
আকাশে নক্ষত্র হয়ে জ্বলিবার মত শক্তি—তবু শক্তি চাই।

ঘ. তোমার পায়ের শব্দ গেল কবে থামি'
আমার এ নক্ষত্রের তলে!
—জানি তবু—নদীর জলের মত পা তোমার চলে ;—

রবীন্দ্রনাথের গানগুলিতে যে অন্ধকার এবং নক্ষত্রের ছবি ও প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে তার সঙ্গে জীবনানন্দের নক্ষত্র প্রসঙ্গের অমিলটুকুও লক্ষণীয় ঃ

ক. যখন রাত্রি আঁধার হবে
হৃদয়ে মোর গানের তারা উঠবে ফুটে সারে সারে ॥

খ. প্রভু তোমার বীণা যেমনি বাজে
আঁধার মাঝে অমনি ফোটে তারা।

গ. আমার না-বলা বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে
তোমার ভাবনা তারার মতন রাজে।

ঘ. আঁধারের গায়ে গায়ে পরশ তব
সারারাত ফোটাক তারা নব নব।

রবীন্দ্রনাথের গানে 'তারা' এক নিঃসন্দিগ্ধ আশ্বাসের বার্তাবহ। অন্ধকারের পরাভবের ইঙ্গিত রয়েছে তাঁর নক্ষত্ররাজিতে, তাঁর নিশীথ আকাশের তারার মেলায়। জীবনানন্দের নক্ষত্রের ভিতরে এই আশ্বাসের প্রেরণার চেয়ে আশ্বাসের

জন্য কবির আকুলতাই ফুটে উঠেছে বেশি। সেখানে নক্ষত্রের দীপ্তি অপেক্ষা তার স্তব্ধ প্রশান্তিই প্রধান কথা। তাই বুদ্ধদেবের অসামান্য কবি-পরিচিতির প্রথম চরণ যতটা সত্য, (সে পথ নির্জন যে পথে তোমার যাত্রা,) ঐ কবিতাটির শেষাংশ—(একটি জ্বলন্ত তারা আকাশের জ্বলন্ত হৃৎপিণ্ড যেন এঁকে যায় সেই পথ ··)—ততটা জীবনানন্দের কবিত্বের পরিচয়বাহী হয়নি। আকাশের জ্বলন্ত তারা জীবনানন্দের নয়। সে আকাশ অধিকাংশ সময়ে কুয়াসায় আত্মলীন এবং ম্লানতায় স্বপ্নগাঢ়। নক্ষত্রে সেখানে শুশ্রূষার সঙ্কেত।

নক্ষত্রের সংকেতের সাহায্যে যে-সন্ধ্যাকে জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় গাঢ় করে তোলেন, সেই সন্ধ্যারই আকর্ষণে জীবনানন্দ সৃষ্টি করেছেন তাঁর আর এক গূঢ়ার্থসঞ্চারী কাব্য-প্রসঙ্গ। এ কাব্য-প্রসঙ্গটি হল 'নীড়'। এখানেও দেখা যাবে যে-নীড় রবীন্দ্রনাথের, সে-নীড় জীবনানন্দের নয়। রবীন্দ্রনাথ নীড়ের প্রতি মমতাসম্পন্ন নন। রবীন্দ্রনাথের আকাশ-পিপাসায় যে অর্থ-গৌরব তারই বিপরীত ব্যঞ্জনা 'নীড়' শব্দটিতে ধ্বনিত। প্রেমপাত্রীকে চিরবিদায় দেবার মুহূর্তেও তাই রবীন্দ্রনাথের কাব্যের নায়ক নীড়ে-ফেরা পাখির বিক্ষোভে নিজের বিবর্ণ মনের ছবি খুঁজে পায়। 'নীড়ে ফেরা পাখি যবে/অস্ফুট কাকলি রবে/দিনান্তেরে ক্ষুব্ধ করি তোলে'—প্রভৃতি অংশ এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু জীবনানন্দ যে নীড়-প্রসঙ্গ সৃষ্টি করেন সে নীড় বহুলাংশে আশ্রিত-বৎসল। জীবনানন্দেরই সৃষ্ট সন্ধ্যার অনুষঙ্গ-বাহী সেই নীড়। আকাশ পরিক্রমায় যেখানে নিরর্থকতাজনিত ক্লান্তি, নীড়ের জন্য বিধুরতা সেখানে অনিবার্য। এখানে আবার স্মরণীয় যে রবীন্দ্রনাথের আকাশ-পিপাসা রেনেশাঁসের জাগ্রত ব্যক্তির ব্যাপ্তির আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আত্মীয়তাবদ্ধ। স্বভাবতই প্রথম মহাযুদ্ধের পরে উনিশের শতকের বাঙালী যুবকের সেই ব্যাপ্তির বাসনা নানা নিরুত্তাপে হিম হয়ে গেছে। জীবনানন্দ এই সময়ের পটে দাঁড়িয়েই সন্ধ্যার ম্লান কুয়াসায় নীড়ের কল্পনা করেছেন। 'নীড়' নক্ষত্রের মতোই কবির আবেগের, স্মৃতির, কল্পনার আশ্রয়। যেখানে প্রত্যক্ষভাবে 'নীড়' ব্যবহৃত হয়নি, সেখানেও প্রত্যাবর্তনের প্রসঙ্গ বা আশ্রয়ের প্রসঙ্গ নীড়ের কাল্পনিকতাকেই প্রশ্রয় দিয়েছে। যেমন ঃ

ক. আমাদের অবসর বেশি নয়—ভালবাসা আহ্লাদের অলস সময়
আমাদের সকলের আগে শেষ হয়
দূরের নদীর মতো সুর তুলে অন্য এক ঘ্রাণ—অবসাদ—
আমাদের ডেকে লয়—তুলে লয় আমাদের ক্লান্ত মাথা—অবসন্ন হাত।

খ. পুকুরের পারে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ—মেয়েলি হাতের স্পর্শ লয়ে গেছে তারে।

গ. সন্ধ্যার কাকের মত আকাঙ্ক্ষায় আমরা ফিরেছি যারা ঘরে।

ঘ. সূর্যের আলোর পরে নক্ষত্রের মত আলো জেলে
সন্ধ্যার আঁধার দিয়ে দিন তার ফেলেছে সে মুছে অবহেলে।

ঙ. ফ্যাকাশে মেঘের মত চাঁদের আকাশ পিছে রেখে
চ'লে যাই ;—কোন্ এক রুগ্ন হাত আমাদের টানে ?
পাখির মায়ের মত আমাদের নিতেছে সে ডেকে
আরো আকাশের দিকে,—অন্ধকারে,—অন্য কারো আকাশের থেকে !

এইবার এর সঙ্গে 'রূপসী বাংলা'-র নীড়-মমতায় মাখা কবিতাগুলির কথা এবং 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থের নীড় প্রসঙ্গকে যদি আমরা স্মরণ করি তাহলে একথা দৃঢ় প্রত্যয়ে পরিণত হয় যে, জীবনানন্দের কল্পনার প্রবল আশ্রয় সন্ধ্যার নীড়। অথচ জীবনানন্দ জানেন, এ নীড় নিয়তির মতো উদাসীন এক বিরুদ্ধ শক্তির হাতে কত সহজে ভেঙে যায়।

ক. —চড়ুয়ের ভাঙা বাসা
শিশিরে গিয়েছে ভিজে—পথের উপর
পাখির ডিমের খোলা ঠাণ্ডা কড়কড়—

খ. ধানকাটা হয়ে গেছে কবে যেন—ক্ষেতে মাঠে পড়ে আছে খড়
পাতা কুটো ভাঙা ডিম—সাপের খোলস নীড় শীত।

সন্ধ্যা

শিকারী

ব্যাধ

তাই এ অনুমান নিরর্থক নয় যে, নীড়ের আকর্ষণে পাখি এবং পাখির জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতার অনুষঙ্গে ব্যাধ, আবার ব্যাধের অনুষঙ্গে হরিণের প্রসঙ্গ জীবনানন্দের কবিজীবনের প্রথম অধ্যায়ে এক চমৎকার কল্পনা-বলয়ের সৃষ্টি করেছে।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-র 'ক্যাম্পে' ও 'বনলতা সেনে'-র 'শিকার' কবিতা দুটি এই সূত্রে পৃথকভাবে স্মরণীয়। দুটি কবিতাতেই মৃত্যুর একটা বিমর্ষ পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। জীবনানন্দের কবিতায় অস্তিবাদের যে প্রভাবটুকু অনুভব করা যায় তার সূত্রপাত এখানে। তবু এ সিদ্ধান্ত অপরিহার্য যে, জীবনানন্দের কবিকল্পনায় মৃত্যু-চেতনা শেষ পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করতে পারেনি। মৃত্যুকে জীবনানন্দ যে দৃষ্টিতে দেখেছেন তা অস্তিত্ব-বাদীর দৃষ্টি নয় বলেই এমনটা ঘটেছে। জীবনানন্দ মানুষকে বিশ্ব-জীবনের মাঝখানে অকারণে নিক্ষিপ্ত এক সত্তা বলে মনে করেছেন বটে, কিন্তু অহৈতুকতাবেই চূড়ান্ত বলে শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে পেরেছেন, এ ধারণার যৌক্তিকতা মেনে নেওয়া যায় না। এ কথার প্রমাণ-স্বরূপেই উল্লেখ করা চলে 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থের 'সুচেতনা' কবিতাটি ঃ

মাটি-পৃথিবীর টানে মানব জন্মের ঘরে কখন এসেছি,
না এলেই ভালো হ'ত অনুভব করে ;
এসে যে গভীরতর লাভ হল সে সব বুঝেছি
শিশির শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জ্বল ভোরে ;

উদ্ধৃত অংশের শেষ দুই পদে যে-উপলব্ধি তা কিছুতেই মানুষের নিরর্থকতার অঙ্গীকার নয়। মানুষের চেতনার অগ্রাধিকার অবশ্য এখানে স্বীকৃত। কিন্তু তার পরম প্রেম সেই চেতনারই সারাৎসার। তাই সেই প্রেমের প্রতীক যে-নারী সে সুচেতনা। 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থের 'আমি' 'ধূসর পাণ্ডুলিপ'-র 'আমি' অপেক্ষা সত্তার গভীরতার ধ্বনি আরো বেশি ঝংকৃত করেছে। 'ধূসর পাণ্ডু-লিপি'-তে যে ছিল দ্রষ্টামাত্র—'বনলতা সেন'-এ সে নিজের পথিক অস্তিত্বের আবহমানতা সম্বন্ধে সচেতন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে 'আমি পথ হাঁটিতেছি' এ-কথার চেয়ে আরো সত্য 'বেবিলনে একা একা এমনই হেঁটেছি আমি রাতের ভিতর / কেন যেন ; আজো আমি জানিনাকো হাজার হাজার ব্যস্ত বছরের পর'। তাই 'বনলতা সেন'-এ পথিক এবং নাবিকের শ্রান্ত রক্তের মন্থরতায় সংবিতের অনাসক্ত মূল্যায়ন কবির অভীপ্সা। বারে বারে ভূমধ্যসাগরের কূলবর্তী নিবে যাওয়া-সভ্যতাগুলির কথা মনে পড়েছে। সমুদ্রগামী সেই সব নাবিকদের দূরাগত ক্লান্ত গুঞ্জনে ধ্বনিত হয়েছে মানুষের অন্তহীন প্রয়াসের কথা। এই সব প্রয়াসের অন্তহীনতা এবং হয়তো নিরর্থকতা' শেষ পর্যন্ত আর এক সাধ্য খুঁজে পাবে প্রেমে। এই সাধ্যসাধন-মীমাংসা 'বনলতা সেন'-এর কবিকল্পনার উপজীব্য ঃ

মানুষ কাউকে চায়—তার সেই নিহত উজ্জ্বল
ঈশ্বরের পরিবর্তে অন্য কোনো সাধনার ফল।

সেই সাধনারই লক্ষ্য সুচেতনা—যার অপর নাম : 'মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়।' নিজ কবিজীবনের এই অংশে জীবনানন্দের মুক্তি ঘটেছে প্রারম্ভিক শারীরিকতার হাত থেকে। এই মুক্তিই পরিণতি পেয়েছে 'বনলতা সেন' পেরিয়ে 'বেলা অবেলা কালবেলা'-য়। তখন 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-র সেই ইন্দ্রিয় সচেতনতা আর নেই। 'মেয়েমানুষ' শব্দটি এখন অনুচ্চার্য। 'বেলা অবেলা কালবেলা'-য় প্রধান কল্পনাসঞ্চারী শব্দ 'মহিলা'। এই মহিলা যিনি মননলোককে স্পর্শ করেন—যিনি অপূর্ব বস্তু রচনা করেন প্রত্যেক মানব-হৃদয়ে; তাঁর শক্তিকেই প্রতিভা বলা হয়েছে। এই চেতনা আকাশীসত্তার মতো দ্যুতিময় বলে 'বেলা অবেলা কালবেলা'-য় মহিলারই সংস্পর্শে নক্ষত্র শব্দটিরও ব্যঞ্জনাগত পরিবর্তন ঘটেছে।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি' থেকে 'বনলতা সেন' পর্যন্ত সৃষ্টি-পর্যায়ে জীবনানন্দের কবিতায় এক বিশেষ স্বরের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। 'হাওয়ার রাত' বা তার মত দু-একটি কবিতা বাদ দিলে এই সময়ের জীবনানন্দের অধিকাংশ কবিতার পাঠ জনিত প্রতিক্রিয়ায় এক বিষণ্ন পঞ্চমাঙ্ক নাটকের শেষ দৃশ্যের আবহাওয়া ও অনুভূতি তুলিত হতে চায়। যেন শুধু কোনো শত শতাব্দীব্যাপী প্রয়াসের অন্তহীনতাকে জানা গেল, যেন অপরিহার্য নিরর্থকতাকে মেনে নিতে হল নায়কের কণ্ঠে তারই বিষণ্ন স্বগতোক্তি। আসন্ন যবনিকাকে উপেক্ষা করে কথাগুলি নীরব প্রেক্ষকের উদ্দেশ্যে বিনা সম্বোধনে অন্ধকারে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এক একটি কবিতা আছে যাকে মনে হয় কোনো আন্তরিক কাহিনীর শেষাংশ। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-র 'পঁচিশ বছর পরে', 'বনলতা সেনে'-র 'কুড়ি বছর', 'ধান কাটা হয়ে গেছে', 'হাজার বছর শুধু খেলা করে' এবং 'অঘ্রাণ প্রান্তরে' এ জাতীয় কবিতা। এই দুই ধরনের কবিতার আত্মায় জড়িয়ে রয়েছে এক সমাপ্তি-বোধ। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-র নক্ষত্র-প্রসঙ্গের সে-ই জনক। সমাপ্তিবোধ স্থায়ীভাব। সঞ্চারী হিসেবে দেখা দিয়েছে কখনো নির্বেদ, কখনো ক্লান্তি, কখনো বা শান্তির নির্লিপ্ত। এই সমাপ্তি বোধের পিছনে রয়েছে কবির প্রচ্ছন্ন আত্মজ্ঞান। সমগ্র বিশ্বকে তিনি তাঁর দর্শন-স্থবির অহমের অন্তর্গত করে নিয়েছেন। এর ফলে জানার সমাপ্তি ঘটেছে। যে সমাপ্তি বোধ জীবনানন্দের কবিতায় 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থে কখনো কখনো ক্লান্তির সুর বাজিয়েছে, তারও মূলকথা ঐ জ্ঞানের সমাপ্তি। নায়ক বলছেন—আমার জানা শেষ হয়েছে এই কারণে, যে অবিরাম জেনে চলার সাধ আর আমার নেই।

সুতরাং কবি ঠিকই জেনেছিলেন যে, এই সমাপ্তির অনুভূতিকে সঞ্চারিত করার জন্যে এক কালগত সুদূরতার অভিব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তোলা দরকার। এই

শৈল্পিক উপলব্ধির সূত্রেই জীবনানন্দের কবিতার আবয়বিক রহস্যও উন্মোচিত হতে পারে। স্থানগত এবং কালগত সুদূরতাকে ব্যঞ্জিত করার জন্যই দীর্ঘস্বর-ধ্বনির প্রতি জীবনানন্দের পক্ষপাত। দীর্ঘ স্বরধ্বনি, বিশেষ 'আ'-স্বর জীবনানন্দের উক্ত উদ্দেশ্যসাধনে বিশেষ সহায়ক ঃ

ক. প'ড়ে গেছে পৃথিবীতে এশিয়ার ক্ষেত মাঠ প্রান্তরের পর
এই সব ত্যক্ত পাখি কয়েক মুহূর্তে শুধু ঃ—আবার করিছে আরোহণ
আঁধার বিশাল ডানা পাম গাছে,—পাহাড়ের শিঙে শিঙে সমুদ্রের পারে;

খ. চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য ;

গ. কাল তার অতি দূরে আকাশের সীমানার কুয়াশায় কুয়াশায় দীর্ঘবর্শা হাতে
করে কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে গেছে যেন—

ঘ. মনে পড়ে কবেকার পাড়াগাঁর অরুণিমা সান্যালের মুখ;

ঙ. মূল্যবান আসবাবে ভরা এক প্রাসাদ
পারস্য গালিচা, কাশ্মিরী-শাল, বেরিন তরঙ্গের নিটোল মুক্তা প্রবাল
আমার বিলুপ্ত হৃদয়, আমার মৃত চোখ, আমার বিলীন স্বপ্ন
আকাঙ্ক্ষা আর তুমি নারী —

ভাবছন্দের সঙ্গে বাক্যছন্দের সাযুজ্য জীবনানন্দের স্বভাবতই অন্যতম অন্বেষা। যেসব মুহূর্তে তাঁর কাব্যছন্দ কথ্যছন্দকে প্রশ্রয় দিতে পারেনি সে সমস্ত মুহূর্তে তাঁর ভাবছন্দের চারিত্রই অধিকতর আধিপত্যপরায়ণ। পূর্বে কথিত সমাপ্তি-বোধকে সার্থক করে তোলার জন্য নাবিক-ক্লান্তি এবং পথিক-ক্লান্তির যে-পটভূমিকা দরকার, 'আ'-ধ্বনি কালদৈর্ঘকে ফুটিয়ে তুলে সেই ক্লান্তিকে মূর্ত করছে। এই প্রয়োজন মেনে নিয়েই জীবনানন্দ লৈখিক ক্রিয়াপদকে একেবারে বিদায় দিতে পারেন নি। 'বনলতা সেন' কবিতাটির প্রথম এবং শেষ চরণের লৈখিক ক্রিয়াপদ দুটি এখানে স্মরণীয়। 'হাঁটিতেছে'-র বিলম্বিত স্বরধ্বনি ছাড়া হাজার বছরের ক্লান্তি ধ্বনিত করা যেত না। আবার শেষ চরণের 'বসিবার' ক্রিয়াপদটিই সমস্ত পাঠকহৃদয়কে এক অন্তহীনতার মাঝে নিক্ষেপ করে গেল। এবং এই প্রকরণের স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্যই জীবনানন্দ বলেন ঃ

···তাই বলে কবিতার মানে পাঠকসমাজে নির্বিশেষে বিমুক্ত করতে গিয়ে যে যুগে ও যে দেশে আমি রয়েছি সেখানকার মানুষের মুখের ভাষায় কবিতা লিখব এরকম, বা যে কোনো রকম সংকল্পে কবিতা উতরায় না,

> সংকল্পের সঙ্গে কবিতার সংস্রব নেই বল্লে নয়, সংস্পর্শ রয়েছে, সার্থক কবিতা হয়তো মুখের ভাষায় ফুটে উঠবে, কিংবা ঠিক মুখের ভাষা নয় এমনি কোনো ভাষায়, কিন্তু কোনো বিশেষ বাগ্‌রীতিতে বা অর্থে লেখা উচিত এই সংকল্পের ভিতর থেকে নয়।
>
> (মাত্রাচেতনা, কবিতার কথা ; জীবনানন্দ দাশ।)

নিজ কবিজীবনে জীবনানন্দ যে কারণে তাঁর কবিস্বরের বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করতে গিয়ে এই সিদ্ধান্তে পেঁৗছেছিলেন তার ব্যাখ্যা এখানে তিনি দেন নি। তিনিও একটি সংকল্পই নির্মাণ করেছেন মাত্র। এবং এই সংকল্প তাঁকে সব সময়ে শৈল্পিক সার্থকতার পথ দেখায় নি। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-তেই এই বাক্‌ছন্দ-সংক্রান্ত ভ্রান্ত পদক্ষেপের নিদর্শন তুলনাগতভাবে বেশি।

ক. হেমন্ত বিয়ায়ে গেছে শেষ মরা মেয়ে তার শাদা মরা শেফালীর বিছানার পর

খ. কারণ,—অনেক অশ্রু - রক্তের মতন অশ্রু ঢেলে
আমরা রাখিতে আছি, জীবনের এই আলো জেবলে

গ. সিন্ধুর ঢেউয়ের তলে অন্ধকার রাত্রির মতন
হৃদয় উঠিতে আছে কোলাহলে কেঁপে বারবার।

এই রকম আরো কিছু জায়গায় লৈখিক ক্রিয়া ও মৌখিক ক্রিয়ার মধ্যে সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা শৈল্পিক স্বাচ্ছন্দ্যের পরিপন্থী হয়েছে। 'বিয়োবার দেরী নেই আর'—এখানে 'বিয়োবার' শব্দে আপত্তি নেই। যে নারীর রূপ ঝরে যাবে তার সম্বন্ধে আচম্বিত অসম্ভ্রম তাৎপর্যবিহীন নয়। কিন্তু 'বিয়ায়ে গেছে' এই উদ্ধৃত অংশে লৈখিক ক্রিয়াভঙ্গীর সঙ্গে একান্তই প্রাকৃত ক্রিয়াটির মিলন সাধন সম্ভব হয়নি। 'রাখিতে আছি' এবং 'উঠিতে আছে' একদিকে লৈখিক ক্রিয়াপদ আবার অন্যদিকে জেলা বিশেষের বাগ্‌রীতির বিশেষত্বের স্মারক। এই অবৈধমিলনও কার্যকর হয়নি।

কিন্তু তাই বলে আমার বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে, জীবনানন্দের কানে কথ্যছন্দের গুরুত্ব ধরা পড়েনি। শাব্দিক বিন্যাসে জীবনানন্দের পারঙ্গমতা বহুশ্রুত। তাঁর কোনো কোনো কবিতার অংশবিশেষ এক্ষেত্রে আলোচ্য হতে পারে। সে-সব ক্ষেত্রে তাঁর ভাবনা ছন্দের প্রতিমুখেই যেন কথ্যছন্দকে ধরে দিয়েছেন জীবনানন্দ। যেমন ঃ

গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত ;
আমাকে কেন জাগাতে চাও ?

হে সময়গ্রন্থি, হে সূর্য, হে মাঘ নিশীথের কোকিল, হে স্মৃতি,
হে হিম হাওয়া
আমাকে জাগাতে চাও কেন ?
অরব অন্ধকারের ঘুম থেকে নদীর চ্ছল চ্ছল শব্দে জেগে উঠব না আর ;

উদ্ধৃত অংশটির প্রথম পঙক্তিটির দীর্ঘ স্বরধ্বনি জীবনানন্দের ঈপ্সিত শান্তিকে ধারণ করে রয়েছে। আত্মহত্যার বাসনা অস্তিত্বের নিরর্থকতা থেকে উদ্ভূত। সে অস্তিত্ব সকল সংগ্রামে বীতরাগ। তার অভিজ্ঞতা দীর্ঘ। তার ক্লান্তিও দীর্ঘ। দ্বিতীয় পঙক্তির সটান কথ্যভঙ্গি শেষ নিদ্রাতুরের বিরক্ত প্রতিবাদ। প্রথম চরণে নিদ্রাচ্ছন্ন স্খলিত গতি—দ্বিতীয় চরণে রূঢ় চমক। এ প্রতিবাদ তাদের প্রতি, যারা অস্তিত্বের সার্থকতার কথা কাব্যে, দর্শনে, রাজনীতিতে স্মরণ করিয়ে দেয়। তৃতীয় পঙক্তির দীর্ঘ স্বরগুলির সঙ্গে যোগ দিল মহাপ্রাণ বর্ণের সুমিত প্রয়োগ—দীর্ঘশ্বাসের ব্যঞ্জনা এল। অতঃপর চতুর্থ পঙক্তিতে আবার দ্বিতীয় চরণটিই ফিরে এল—শুধু 'কেন' শব্দটি স্থানবদল করে একটা আর্ত মিনতিকে ধ্বনিত করেছে। এর পরেই 'অরব' অন্ধকারে অপরিচিত বিলুপ্তির বাসনা—'অরব' বিশেষণটি নীরবের পরিবর্ত শব্দ মাত্র নয়। 'অরব' শব্দে নীরবের মিষ্টতা নেই। বিশেষণটিই ইতিপূর্বে কোথাও ব্যবহৃত হয়নি বলেই অপরিচিত। তার কাজ হল অন্ধকারের কঠিন অব্যাখ্যাত শূন্যতাকে ফুটিয়ে তোলা। এই শূন্যতার অনুভূতিকে বারে বারে জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় নানাভাবে মূর্ত করতে চেয়েছেন।

'অরব অন্ধকার', 'উটের গ্রীবার মত কোনো এক নিস্তব্ধতা এসে', 'পাখির নীড়ের মতো চোখ', 'বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ,' 'স্তন তার করুণ শঙ্খের মতো', প্রভৃতি বিশিষ্ট জীবনানন্দীয় শব্দচিত্রের মধ্যে তাঁর কবিভাষার গূঢ় রহস্য স্পন্দিত। এগুলি তাঁর কাব্যের স্বতন্ত্র স্বরের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। এই স্বর-স্বাতন্ত্র্য, সকল কবির ক্ষেত্রেই যেমন, তাঁর ক্ষেত্রেও তেমনি, তাঁর জীবন-দৃষ্টির দান। 'অরব অন্ধকার' এবং 'উটের গ্রীবার মত কোনো এক নিস্তব্ধতা এসে'—এই দুই ক্ষেত্রেই অন্ধকার বা নিস্তব্ধতা লক্ষ্য নয়, কবির লক্ষ্য ছিল এক অনির্দেশ্য শূন্যতার পাত্রবস্তু-নিরপেক্ষ অনাত্মীয়তাকে মূর্ত করা। 'পাখির নীড়ের মতো চোখ' এই উপমায় স্বভাবতই 'চোখ' কবির উদ্দিষ্ট নয়। উদ্দিষ্ট কবির নিজেরই আশ্রয়াকুল মন। আবার, যে ক্লান্ত মেয়েটির চোখ ম্লান, তার ম্লানতার অন্তর্গত স্বরূপকে আমরা জানিনা বলেই বেতের ফলের উপমার সার্থকতা। 'স্তন তার করুণ শঙ্খের মতো' আকারে উপমা, প্রকারে প্রতীক। করুণ শব্দটিই সেই প্রতীককে ধরিয়ে দিচ্ছে। ক্লান্তি, নিরর্থকতা, উদ্বেগ

প্রভৃতি কারণে মাতৃকল্পনা এবং মৃত্যুকল্পনা জীবনানন্দের কবিমানসকে কখনো কখনো প্রভাবিত করেছে। মাতৃজঠরে প্রত্যাবর্তন ও মরণাশ্রয়বাসনা একার্থক। মাঝে মাঝে জীবনানন্দ অতি আগ্রহে ব্যাখ্যা করে বলতে চান। তখন তাকে বাহুল্য বলে মনে হয়ঃ 'অন্ধকারের স্তনের ভিতর যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থাকতে চেয়েছি'। এখানে 'অনন্ত মৃত্যুর মতো' এই উক্তির আর প্রয়োজন ছিল না। করুণ শঙ্খের মতো স্তন নিঃসন্দেহে জীবনানন্দের মাতৃ-কল্পনার প্রতিক্রিয়াসঞ্জাত প্রতীক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'ধূসর পান্ডুলিপি'-র প্রেমিকা-কল্পনা এবং 'বনলতা সেনে'-র প্রেমিকা-কল্পনার মধ্যে যে পার্থক্য অনুভূত হয় তাও এই সূত্রেই বিচার্য। বনলতা সেনের প্রেমিকা-কল্পনায় জীবনানন্দের মাতৃ-কল্পনার প্রভাব নাতিপ্রচ্ছন্নভাবে কার্যকর থেকেছে। প্রেমিকা সেখানে আশ্রয়দাত্রী। অন্যদিক থেকে আবার মৃত্যুর ভিতরেও সেই আশ্রয়ের ব্যঞ্জনা। তাই নারীর মাথার চুলের প্রসঙ্গ জীবনানন্দের মৃত্যু-চেতনার সঙ্গে গ্রথিত হয়ে তাঁর আশ্রয়াতুর মনোভাবকে স্পষ্টতা দিয়েছে। 'ধূসর পান্ডুলিপি'-তে প্রেমিকা-কল্পনার এই বৈশিষ্ট্য ছিল না।

কিন্তু এত সত্ত্বেও জীবনানন্দের যে সমাপ্তি-চেতনার কথা আমরা পূর্বে বলেছি তা কিছুতেই পূর্ণতার চেতনা নয়। পূর্ণতার চেতনার জন্য যে দার্শনিক স্থিরীভবন প্রয়োজন তার অভাব জীবনানন্দে ছিল না। কিন্তু এই স্থিরীভূত দৃষ্টিভঙ্গিকে তিনি কোনো সংকটের সংঘাতে অর্জন করেন নি। করেন নি বলেই এটা তাঁর কাছে সহজ আশ্রয়ের ব্যাপার ছিল। দান্তে বা রবীন্দ্রনাথ যেমন করে তাঁদের আবেগগত বিশ্বাসের সঙ্গে বৌদ্ধিক বা দার্শনিক বিশ্বাসের সাযুজ্য ঘটাতে পারেন, জীবনানন্দ তেমন পারেন নি। মানুষের প্রক্ষিপ্ততা, নিঃসঙ্গতা তার গ্লানি ও উদ্বেগের কথা তিনি ঠিকই বলেন। তা থেকে উত্তরণের আশাও একজন মানবতামুখী ভবিষ্যৎবিশ্বাসী আবহমানতা-সচেতন ব্যক্তির মতই তিনি প্রকাশ করেন, কিন্তু এই দুই প্রান্তকে মেলাতে পারেন না। 'বনলতা সেন' এবং অনুরূপ কয়েকটি কবিতার অসামান্য সার্থকতা সত্ত্বেও একথা সাধারণভাবে সত্য যে, জীবনানন্দের প্রায় কবিতাতেই ভাবের কোনো অগ্রসরণ নেই। প্রথম স্তবকে বা কয়েক চরণেই কবিতাটির মূল কাজ শেষ হয়ে যায়। স্মরণীয়, রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতাতেই এ লক্ষণ ছিল। কিন্তু কবিতায় ফুলটির চারপাশে রবীন্দ্রনাথের যে পুঞ্জিত পল্লবের চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করতেন তার সজীবতাও অভিনন্দনীয়। সে ক্ষেত্রে জীবনানন্দের ভরসা ছিল তাঁর মননলব্ধ বিশ্বাস। এর যে সীমাবদ্ধতা তার দায় তাঁকে ভোগ করতেই হয়েছে। হ্রস্ব কবিতায় এবং দীর্ঘ কবিতায় সমান ভাবেই এই শৈল্পিক বিচ্যুতি ঘটেছে।

আমরা অবশ্যই রিচার্ড-কথিত আবেগগত বিশ্বাস এবং বৌদ্ধিক বিশ্বাসের পার্থক্যের সারবত্তা এবং এলিয়টের মতান্তর এখানে আলোচনা করতে চাই না। বরঞ্চ এলিয়টকে আমরা এখানে রিচার্ডের বক্তব্যের বিরোধী হিসাবে দেখি না। বিশ্বাসের গাঢ়তম মুহূর্তে বিশ্বাস সমগ্র চৈতন্যেরই বিষয়। আবেগের ভূমিকা সেখানে স্বতঃই গণনীয়। রিচার্ড থেকেই সে সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যাবে। বিশ্বাসের একমাত্র নিরিখ হ'ল তা কবিকল্পনাকে সক্রিয় রাখতে পেরেছে কিনা। 'বেলা অবেলা কালবেলা'-য় বিশ্বাসের সেই ভূমিকা ম্লান। অথচ 'বেলা অবেলা, কালবেলা'-য় জীবনানন্দের দার্শনিক অভিপ্রায় আরো স্পষ্টতা লাভ করেছে, সেই অভিপ্রায়-সিদ্ধির জন্য কবির প্রয়াসও শুরু হয়েছে।

বস্তুত 'আটবছর আগের একদিন'-এর সেই শূন্যতা-সঞ্চারী ক্লান্তিবোধ, সেই নৈঃসঙ্গ্য-চেতনা থেকে 'বনলতা সেন'-এ 'সুচেতনা' কবিতার বক্তব্যে পৌঁছে জীবনানন্দ আপন কবিসত্তার প্রতি অবিচল নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। 'বেলা অবেলা কালবেলা'-য় সেই অবিচল নিষ্ঠাই বক্তব্যের দিক থেকে তাঁকে আরো অগ্রসর করে দিয়েছে। কিন্তু কবিতা তো শুধু নিষ্ঠা নয়, শুধু বক্তব্য নয়। 'বেলা অবেলা কালবেলা'-য় এখানে ওখানে নিঃসঙ্গ কয়েকটি শিল্পিত কাব্যোক্তি অসংহত স্তবকগুলির পৃথুল কলেবরের পাশে পাশে রুদ্ধশ্বাস। সে পৃথুলতা আপন বিবৃতিতেই ক্লান্ত। 'আটবছর আগের একদিন'-এও শৈল্পিক বিচ্যুতি ঘটেছে, কিন্তু সে বিচ্যুতি অন্য জাতীয়। এই কবিতাটির প্রধান অসঙ্গতি দৃষ্টি-কোণ সংক্রান্ত অসঙ্গতি। যে সব দীর্ঘ কবিতায় দ্বিতীয় স্বরের সফলতা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি সেখানে উত্তম পুরুষের উক্তি, 'তার' এই সর্বনামের প্রসঙ্গ এবং নৈর্ব্যক্তিক বক্তব্যগুলি পারস্পরিকতায় সমগ্র কবিতাটিকে পূর্ণতা প্রদান করে। প্রসঙ্গত আমরা এলিয়টের বিখ্যাত দীর্ঘ কবিতা The Love song of J. Alfred Prufrock-এর কথা স্মরণ করতে পারি। 'আট বছর আগের একদিন'-এ প্রারম্ভে, মধ্যে কোথাও উত্তম পুরুষের নিজের কাহিনী বা কথা নেই। 'শোনো' বলে যাকে সম্বোধন করা হচ্ছে তার ভূমিকাও স্বভাবতই গৌণ। সমস্ত কবিতাটিই 'তার' কথা। এই কবিতায় যাকে 'তুমি' বলা হয়েছে এবং যাকে 'তার' এই সর্বনামে উল্লেখ করা হয়েছে এরা এক ব্যক্তি। 'শোনো' যাকে বলা হয়েছে সে টেবিলের ওপারের বন্ধু শ্রোতা। কবিতাটির শেষে 'আমি' এসেছে। একেবারে শেষে এসেছে 'আমরা'। 'জানি' বলে যে কথা বলেছে, তার দার্শনিক উক্তি এবং পরিশেষে 'আমরা' যে উক্তি করেছে, সেই 'আমরা'-র অন্তর্বর্তী আমি এক নয়। 'তবু' শব্দটিই তার প্রমাণ। 'আমরা' শব্দে যে অস্মিতা-বিচ্যুতি, তার প্রস্তুতি কবিতাটিতে নেই। আবার যে দ্বি-

ব্যক্তিত্বের কল্পনা শেষে প্রাধান্য বিস্তার করেছে, তার অনিবার্যতা জীবনদর্শন-সংক্রান্ত পূর্বোক্তির জন্য রচিত হতে পারে নি। এইভাবে কবিতাটি দ্বিধাখণ্ডিত হয়েছে। তথাপি যে কবিতাটি দাঁড়াতে পেরেছে সে 'তার' জন্যে।

কিন্তু 'বেলা অবেলা কালবেলা'-য় যে শৈল্পিক খঞ্জতা, তার ক্ষতিপূরণের কোনো ব্যবস্থা কবির হাতে ছিল না। 'মাঘ-সংক্রান্তির রাতে' কবিতাটি 'বেলা অবেলা কালবেলা'-র কবি-অভিপ্রায়ের সাক্ষ্য বহন করছে। আমরাও সচেতন হয়ে উঠেছি এই ভেবে যে, হৈমন্তিক বিষণ্ণতার অন্তে কোনো বাসন্তী আশ্বাসের তোরণে কবি পৌঁছলেন দেখা যাক :

মহাবিশ্ব তমিস্রার মতো হয়ে গেলে
মুখে যা বলনি, নারি, মনে যা ভেবেছ তার প্রতি
লক্ষ্য রেখে অন্ধকার শক্তি অগ্নি আর সুবর্ণের মতো
দেহ হবে মন হবে—তুমি হবে সে-সবের জ্যোতি।

নিঃসন্দেহ এই অমেয় আশার বাণীতে কাব্যগ্রন্থটি ধন্য। কিন্তু এই আশার বাণীকে কবিতার ভাষায় রূপান্তরিত করতে গেলে যে প্রকরণ প্রয়োজন, সেখানে কবির শৈথিল্য ঘটেছে। কেননা, যে বিশিষ্ট সৌন্দর্য-ধারণার সঙ্গে জীবনানন্দের ইতিপূর্বের মূল্যানুগত্য গ্রথিত ছিল, তার সবটুকু না হলেও অধিকাংশই ছিল অতীত-নির্ভর। তিনি সন্ধ্যার বিষণ্ণতার কবি, শেষরৌদ্ররাগ মুছে যাবার বেদনায় নীড়ের জন্য বিধুর কবি। আমরা আগেই বলছি যে হেমন্তের যে মাঠের ধান কাটা হয়ে গেছে, যার সম্মুখে সর্বৈব শূন্যতা, তা কবি জীবনানন্দের প্রিয় প্রসঙ্গ। এইখান থেকে মাঘ সংক্রান্তির রাতে উত্তরণের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কিন্তু এই উত্তরণের প্রস্তুতির দিকে জীবনানন্দের তেমন দৃষ্টি ছিল না। দ্বিরুক্তির আশংকা মেনে নিয়েও একথা আর একবার বলা দরকার—'সুচেতনা' জীবনানন্দের কবিজীবনের সন্ধিলগ্নে লিখিত কবিতা। এইখানে আর সেই বিপন্ন বিস্ময়ের কথা নেই, যা আমাদের ক্লান্ত করে। অন্য এক বিস্ময়ের কথা আছে, যা আমাদের মূক করে রাখে। তবু সে বিস্ময়কে উপেক্ষা করেই চারিদিকে রক্তক্লান্ত কাজের আহ্বান। কর্মীদের সুধীদের বিবর্ণতার কথা জীবনানন্দ এর আগেই বলেছেন। কিন্তু 'সুচেতনা' কবিতায় দেখা গেল ঐ বিবর্ণতাই সব কথা নয়। এই পথে আলো জেলে এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে—এই দূর শতাব্দীমুখী এক অসংহত ভবিষ্য-বিশ্বাসও এই কবিতায় প্রথম দেখা গেল। 'সূর্যোদয়' কথাটিকে এর আগে এমন করে জীবনানন্দ আর কখনো উচ্চারণ করেন নি, যেমন করলেন সুচেতনায়। 'সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত এই পৃথিবী

যেন কোটি কোটি শুয়োরের আর্তনাদে উৎসব সুরু করেছে'—এ অনুভূতি এবার বিদায় নিল।

তথাপি এই কবিতাতেই আমরা উপলব্ধি করি যে, জীবনানন্দ তাঁর আবেগময় বিশ্বাসের সব ফাঁকটুকু মননের সাহায্যেও ভরাট করতে পারছেন না। যখনই তিনি কর্মনিষ্ঠ মানবতার সূর্যের সঙ্গে নক্ষত্ররূপা নারীপ্রেমের মিলিত আশ্বাসকে খুঁজতে যান, তখনই তাঁকে বর্তমানের প্রসঙ্গ অপরিহার্য বলে মেনে নিতে হয়। ঠিক সেই মুহূর্তেই তাঁর সেই সুদূর অতীতের ব্যঞ্জনাসঞ্চারী ভাষার ভূমিকা পঙ্গু হয়ে পড়ে। তখনই তাঁর ভাষার শৈল্পিক অস্বাচ্ছন্দ্য দেখে আমরা ব্যথিত হই। জীবনানন্দের বাগ্‌ভঙ্গিতে যে ত্রুটি ক্ষীণভাবে বরাবর বিদ্যমান তা অসতর্কতার প্রশ্রয় পেয়ে এবারে প্রকট হয়ে উঠল। দীর্ঘায়িত বাক্য কথ্যছন্দ, ভাবছন্দের সীমা ছাড়াল। 'প্রয়াণ পটভূমি' কবিতার নবম পঙক্তি থেকে সপ্তদশ পঙক্তি এর একটি সাধারণ প্রমাণ বলে উপস্থাপিত করা চলে। জীবনের যে বিস্তৃতির দিকটি কবি কোনোদিন দেখেন নি—মানুষের ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে গিয়ে সেই বিস্তৃত জীবনের কথাই তাঁর মনে পড়েছে। কিন্তু এই বিস্তৃতিকে আয়ত্ত করতে গেলে তাঁর দরকার ছিল নতুন করে টেকনিকের রহস্য মোচন। দুর্ঘটনা তাঁকে সেই সময় দেয় নি।

জীবনানন্দ তাঁর সাফল্যের ভিতর দিয়ে মানুষকে শিখিয়েছেন ঃ ভালবাসা। আর তাঁর ব্যর্থতার ভিতর দিকে শিল্পীকে শিখিয়েছেন ঃ থীম্ অথবা আঙ্গিক এককভাবে এর কোনোটাই যেন শিল্পীর কাছে চরম বা absolute না হয়।

নিঃশব্দ নীলিমা ঃ কবি অমিয় চক্রবর্তী

এক

কবি অমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্রজগতেই স্থাপিত এবং লালিত এ জাতীয় একটা দুর্মর কিংবদন্তীকে আমরা সবাই নিঃসপত্ন প্রশ্রয় দিয়ে থাকি। কিন্তু সেই সূত্রে অনেকগুলি প্রশ্নই অমীমাংসিত থেকে যায়। তার মধ্যে প্রধান হল এই যে, তাহলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রবিমন্ডলের সদস্য বলে যাঁদের আমরা জানি, তাঁদের সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর পার্থক্য কোথায় ? সত্যেন্দ্রনাথ, করুণা-নিধান অথবা কালিদাস রায়ের সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীকে কি একই পঙ্‌ক্তিগত বলে গ্রহণ করব ? এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে পারলে, তবেই, অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যকীর্তির বিচারভূমিকা রচিত হতে পারে। 'রবীন্দ্রনাথের জগৎ'—এই কথাটি আমরা যখন কারো প্রসঙ্গে ব্যবহার করি, তখন কথাটির তাৎপর্য সম্বন্ধে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা বড়ো শিথিলমনস্ক থাকি। 'রবীন্দ্রনাথের জগৎ' কথাটি বড়ো ব্যাপক। আর, ব্যাপক বলেই ছোট্ট কথায় বড়ো অস্পষ্ট। 'সোনার তরী'-র জগৎ, অথবা 'গীতাঞ্জলি'-র জগৎ, কিংবা 'বলাকা'-র জগৎ বা 'পুনশ্চে'-র জগৎ নিশ্চয় একার্থক নয়। সৌরমণ্ডলের জগতের ন্যায় রবীন্দ্রনাথের জগৎও গম্‌ধাতু নিষ্পন্ন। কাজেই রবীন্দ্রনাথের জগতের একমাত্র পরিচয়চিহ্ন তার চলিষ্ণুতা। এবং একথা অকুতোসংকোচে স্বীকার্য যে চলিষ্ণুতার জগৎ কোন কবি লালিত হলে তাঁর পক্ষে সেটা অপ্রশংসার কিছু নয়।

বস্তুত রবিমণ্ডলের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে আধুনিক যে-কোনো কবির পার্থক্য এইখানে যে, প্রথমোক্তেরা রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতার জগতেই শেষ পর্যন্ত স্থাপিত, কিন্তু শেষোক্তেরা রবীন্দ্রনাথকে ব্যবহার করেছেন উত্তরাধিকার হিসাবে। অমিয় চক্রবর্তীর ক্ষেত্রে সেই উত্তরাধিকারের প্রশ্নটি সচেতনভাবে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা এটা বিশেষভাবে আলোচ্য। উত্তরাধিকারে সমৃদ্ধ পথিকের পক্ষে যাত্রারম্ভের বিন্দুটি বড়ো কথা হলেও, শেষ কথা নয়। শেষ কথা তাঁর যাত্রিকতা। অন্যেরা সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথে যাত্রা শুরু করে সেই নির্দিষ্ট যাত্রাবিন্দুতেই আবর্তিত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ততক্ষণে নিজেকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেছেন। তাই রবীন্দ্রনাথের সাকুল্যসৃষ্টির পটভূমিকায় রবিমণ্ডলের অধিকাংশ কবির রচনাই কালানৌচিত্যে আক্রান্ত বলে প্রতিভাত হয়। এ'রা রবীন্দ্রনাথের মধ্যবর্তী পর্যায়কেই আঙ্গিকত ও ভাবত গ্রহণ করেছেন। কিন্তু

আধুনিক কবিরা রবীন্দ্রনাথ যেখানে থেমেছেন, সেখানে থেকে শুরু করেছেন। সেই কারণেই এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যবধান শেষ পর্যন্ত বেড়েই চলেছে।

দুই

কবি অমিয় চক্রবর্তীর গোষ্ঠীপরিচয় সম্বন্ধে কোনো সন্দেহাত্মক জিজ্ঞাসা থাকা উচিত নয়। যদি তাঁর কবিতায় রবীন্দ্রনাথের স্থায়ী সুরের কোনো একটি বেজেই থাকে, তবে তা এই কবির প্রাতিস্বিকতায় অনন্য হয়েই বেজেছে। যেমন 'দূরযানী' কাব্যগ্রন্থের 'বিয়াত্রিচে' কবিতাটির কথা ধরা যাক। এ কবিতাটির ফলশ্রুতিতে রবীন্দ্রস্মৃতি নিঃসন্দেহে প্রগাঢ়তা পায় ঃ

তোমারই মাধুরী জপি অন্য নামে আজো ঘরে ঘরে
তোমাকেই পেয়ে বুকে চিনেছি আপন প্রেয়সীকে,
ধন্য বিয়াত্রিচে।

এই অংশে স্বচ্ছত 'মানসী'-র 'অনন্তপ্রেম' কবিতার রসলোক প্রতিবিম্বিত হয়েছে। কিন্তু একথাই কবিতাটি সম্বন্ধে শেষ কথা নয়। কবিতাটির সর্বত্র মানব-সংসার সম্বন্ধে যে মমতা স্বগতভাষিণী নদীর মতো ছলছল্ করছে সেটাই কবির নিজ কণ্ঠস্বর। নদীর মতো বলেই অন্ত্যমিলবিযুক্ত প্রবহমানতায় এই কবিতার ছন্দ 'মানসী'-র 'নিষ্ফল কামনা'-র আড়ষ্টতাকে অতিক্রম করেছে। এমন কি ভাব-দৈর্ঘ্যরচনায় এ হয়তো 'বলাকা'-রই প্রায় সমকক্ষ। 'প্রায়' শব্দটি ব্যবহার করছি এ-কারণে যে 'বলাকা'-র ছন্দে সুধীন্দ্রনাথ ইংরেজী আয়াম্বিক ছন্দের গুণবত্তার যে-তুলনা পেয়েছেন, অমিয়বাবুর বিয়াত্রিচের ছন্দে সে তুলনা অচল। উভয়ের কাব্যপ্রকরণের এই পার্থক্যের মূলে রয়েছে দুই কবির আত্মিক অভিলাষের পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথের কাছে মাটি মূলকথা হলেও বস্তুত তিনি ঊর্ধ্বাভিসারী, আর অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় ঊর্ধ্বগগনের ইঙ্গিত থাকলেও মাটির মমতায় তিনি বারে বারে ধরা দিতে চান। তাই, বাক্যে ক্রিয়াপদের কাব্যিক স্থাপনা 'বিয়াত্রিচে' কবিতার চরণ থেকে চরণান্তরে ধাবমান দীর্ঘ বাক্য-বিন্যাসের কথ্য-ছন্দকে স্বাধীন হতে দেয়নি—একথা সত্য হলেও—একটা হার্দ সংলাপের গলা এ কবিতায় মাঝে মাঝেই শোনা গেছে। তা বিষয়ের সঙ্গে ঊর্ধ্ব-প্রয়াণ করে নি। যেমন—

স্বর্গমর্ত পাতালের অনন্ত আখ্যান
তুমি তো নিলে না, তুমি চলে গেলে দূরে ;
তোমারই উদ্দেশ্যে তাই প্রবাসী ধেয়ানী

পথচারী দান্তে, আজীবন,
বারে বারে বলে গেল সর্বমানবের কবিতায়
জ্বলন্ত তেরজা রিমা ছন্দে।

এখানে বিয়াত্রিচে-কল্পনার আধারে কাব্যের যে পারাদিসো-কে স্থাপন করা হয়েছে তা মূলত মৃন্ময়। আর, মৃন্ময় বলেই এখানে কাব্যছন্দ বিশেষ করে বাক্-ছন্দকে প্রাধান্য অর্পণ করেছে। উদ্ধৃত অংশের দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ চরণে মাত্রাগণনায় তানপ্রধান কাঠামো অটুট থাকলেও বাক্ছন্দ যতিস্থাপনাকে লোকায়ত গতিবেগ দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বলাকার ছন্দে তা ছিল না।

অথচ বলাকারই কোনো কোনো কবিতায় দার্শনিকভাবনাক্রান্ত কবিচিত্তে বাক্ছন্দের জন্য আকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। ৪১ সংখ্যক কবিতাটি ('যে কথা বলিতে চাই…') এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই কবিতায় যে-নদীর কথা বলা হয়েছে, তা 'চঞ্চলা' কবিতার নদী নয়। হাঁস 'বলাকা' কবিতার হংস-বলাকার কেউ নয়। 'আধজাগা নিমেষ নিহত'—এই প্রধান চিত্রকল্পে স্খলিত চরণের ইঙ্গিত। পুনশ্চের গদ্যছন্দে অবতীর্ণ হবার আগে এসব কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সহজ জীবনকে রূপ দেবার জন্য সহজ ভাষার অভাব অনুভব করেছিলেন। এ কবিতা থেকেই কবির মনোলোকে পুনশ্চের ভাবপ্রেরণার নেপথ্য প্রস্তুতি শুরু হল। কিন্তু গদ্যছন্দে কবি সেই সহজের ছন্দকে খুঁজে পান নি। রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতার সীমাবদ্ধতা এই যে, এখানে কবিতা গদ্যময় জীবনের বিস্তৃত অঙ্গনে প্রবেশাধিকার পায়নি, পদ্যই শৌখিন গদ্যবেশের চর্চা করেছে। রবীন্দ্রনাথের কথ্যগদ্যের বিশিষ্ট ক্রিয়াস্থাপনা তাঁর গদ্যকবিতার ডিক্শনকে প্রেরণা দিয়েছে বটে, কিন্তু ক্রিয়াস্থাপনার এই বিশিষ্ট ভঙ্গি গদ্যকবিতার স্বতন্ত্র পর্যায়ের আগে, গদ্যরচনাতেও ব্যবহার করেন নি। গদ্যকবিতার বিশিষ্ট ক্রিয়া-স্থাপনার পিছনে বাংলা মৌখিক লোককথার নিজস্ব ক্রিয়াভঙ্গির প্রেরণা যতটা ক্রিয়াশীল, তার চেয়ে বেশি ক্রিয়াশীল তাঁর এবং আবহমান বাংলা কবিতার নিজস্ব ক্রিয়াস্থাপনার আদর্শ। এই ক্রিয়াস্থাপনার বিশিষ্ট ভঙ্গিকেই রবীন্দ্রনাথ কাব্য থেকে গদ্যে নিয়ে গেছেন, এবং আবার সেখান থেকে তাকে কাব্যে নিয়ে এসেছেন। 'লিপিকা' 'পুনশ্চে' বাক্যবিন্যাসের যে আদর্শ তিনি রচনা করেন তাই তাঁর শেষবর্তী গদ্যসাহিত্যের বাক্যবিন্যাসকে প্রভাবিত করেছে।

ক. একটা কুকুর ছিল ওর পোষা —
কুলীন জাতের নয়,
একেবারে বঙ্গজ।

চেহারা প্রায় মনিবের মতো
ব্যবহারটাও।
অন্ন জুটতো না সব সময়ে,
গতি ছিল না চুরি ছাড়া।

খ. ঘরের প্রাঙ্গণে আবার শাঁখ উঠল বেজে,
জাগল হুলুধ্বনি,
দলবল নিয়ে রোঘো দাঁড়ালো সভায়
শিবের বিয়ের রাতে ভূতপ্রেতের দল যেন।

এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই সময়ের গদ্যের কাব্যবিন্যাসের প্রভেদ নির্ণয় দুষ্কর ঃ

ক. কখন রস এল শুকিয়ে, একপা একপা করে এগিয়ে এল মরু, শুষ্ক রসনা মেলে লেহন করে নিলে প্রাণ, লোকালয়ের শেষ স্বাক্ষর মিলিয়ে গেল অসীম পান্ডুরতার মধ্যে।

খ. ভোজ্য জিনিসে ভাণ্ডার উঠল ভরে, রান্নাঘরে হাঁড়ি চড়েছে, তবু ভোজ বলে না তাকে। আঙিনায় পাত পড়ল কত, ডাকা হয়েছে কতজনকে, সেই হিসাবেই ভোজের মর্যাদা।

এ গদ্যশৈলী বাগ্‌শৈলী বটে, কিন্তু তা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ব্যক্তিগত বাগ্‌ভঙ্গিমার স্বারা আক্রান্ত। সেই বাগ্‌বিন্যাসকে সহজেই রবীন্দ্রনাথ গদ্য-কবিতায় রূপায়িত করতে পারতেন। তার জন্য পঙ্‌ক্তিবিন্যাসের অভিনবত্ব ছাড়া আর কিছু প্রয়োজন হতো না। সমালোচকের চোখে এই গদ্যই হয়ে উঠেছে বিন্যস্তপঙ্‌ক্তি গদ্যকবিতা ঃ

কখন রস এল শুকিয়ে,
একপা একপা করে এগিয়ে এল মরু,
শুষ্ক রসনা মেলে লেহন করে নিল প্রাণ,
লোকালয়ের শেষ স্বাক্ষর
মিলিয়ে গেল অসীম পাণ্ডুরতার মধ্যে।

অর্থাৎ তিনি তাঁর গদ্যে কবিতার রঙ ধরিয়ে তাকেই কাব্যের সমীপবর্তী করে তুলেছেন। কবিতায় লোকায়ত কথ্যগদ্যের স্রোত, অন্তত গদ্যছন্দের কালে জাগে নি। বরঞ্চ রবীন্দ্রনাথের গদ্যছন্দের চিহ্নিত পর্যায়টি বাদে, তার আগে এবং পরে অন্যান্য পর্যায়ে কথ্যস্রোতের তীব্রটান, তার ক্ষিপ্রতা, দীপ্রতা এবং ঋজুতা মাঝে মাঝে তাঁর আভিজাতিক ছন্দকে ছুঁয়ে দিয়েছে। এবং সেসব ক্ষেত্রে কাব্যবাণীর আভিজাতিকতা ক্ষুণ্ণ হয়নি, বরঞ্চ এসেছে এক উদারতার অভিপ্রেত শ্রী। 'সোনার তরী' কবিতাটি, 'ক্ষণিকা'-র কিছু কবিতা এবং 'পলাতকা' এর প্রমাণ।

রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারীদের কাছে ছন্দের সমস্যা নতুনভাবে প্রতিভাত হলো। তাঁদের কাছে বিষয়টি কেবল ছন্দের সমস্যা বলেই অনুভূত হলো না, কাব্যের ভাষার সমস্যারূপেই তা তীব্র হয়ে উঠল। পদ্যছন্দ এবং গদ্যছন্দ সে সমস্যার একান্তই বহিরঙ্গ। কবির ভাবনাগতি নৈয়ায়িকের বা নীতিজ্ঞের ভাবনাগতি নয়, কবিরই ভাবনাগতি। আর সে কারণেই তা প্রকাশমাধ্যম খোঁজে ছন্দে, রূপ পায় চিত্রকল্পে—একথা রবীন্দ্রনাথই শিল্পসৃষ্টিতে ও শিল্পদৃষ্টিতে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্যভাষায় ছবি গান হয়ে উঠতে চায়। সেখানে যা কিছু চিত্রল তাই গীতল হতে অভিলাষী। যা গীতল তা-ই চিত্রলতায় মুঞ্জরিত হতে আকুল। তাঁর উত্তরাধিকারী আধুনিক কবির কাছে কিন্তু visual image-ই প্রধান ব্যাপার। সাধারণভাবে যাকে আমরা sensual imagery বলি, রবীন্দ্রনাথের পক্ষপাত কোনোদিনই তার দিকে প্রকট নয়। কবির 'গীতাঞ্জলি'-র ইমেজ সম্বন্ধে May Sinclair-এর পত্রাংশ এক্ষেত্রে স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনাকালে ক্রিশ্চিয়ান মিস্টিকদের সম্বন্ধে May Sinclair বলেছেন: It deals too much in sensual imagery, it is not sufficiently austere and subtle—it has not really seen through the illusion of the world. এখানে যে ন্যূনতার জন্য সিনক্লেয়ার মহোদয়া অনুযোগ করেছেন, তিনি জানেন, তার পূরণ ঘটেছে রবীন্দ্রনাথে। আধুনিক কবিরা সেক্ষেত্রে যে-চিত্রকল্পের উপর নির্ভরশীল, তার মৌলশক্তি চিত্রকলা-নির্ভর। আত্মশক্তিনির্ভর রবীন্দ্রনাথের চিত্রলভ্য যথাযথতা বা exactness-এর জন্য পৃথক প্রযত্ন ছিল না। চিত্র আর সংগীতের পরম সখ্য সেখানে সর্বদাই কবির সহায় হয়েছে।

কবি অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যভাষায় সেই exactness বা চিত্রলভ্য যথাযথতার চর্চা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। তাঁর বিশিষ্ট কবিস্বভাবের মধ্যে এই চিত্রান্বয়ী যথাযথতার প্রেরণা সক্রিয়, আবার এই প্রেরণার সঙ্গেই তাঁর নিজস্ব ছন্দপ্রকরণের সংযোগও নিবিড়। যে দেখাকে তিনি অনুভব করেছেন, তাঁর কবিতায় তাকেই তিনি মূর্ত করতে চান। প্রবাসী যেমন করে ঘরের কথা ভাবেন তেমন করে নয়, পর্যটক যেমন করে নতুন দৃশ্য দেখেন তেমন করে নয়, তীর্থংকরের চলা এবং দেখার সঙ্গে বরঞ্চ অমিয় চক্রবর্তীর মিল বেশি। সে দেখা মনের দেখা এবং চোখের দেখা। সে তীর্থ রসতীর্থ। এই দেখাকে ফুটিয়ে তুলতে গিয়েই কবি বুঝেছেন যে গদ্যছন্দ তাঁর কাব্যভাষার উপযুক্ত আশ্রয় নয়। গদ্যছন্দ অনুভূতির ওঠাপড়াকে ধারণ করতে সহজে সক্ষম—অভিজ্ঞতার বিস্তৃতিকে সে আয়ত্ত করতে পারে। কিন্তু গদ্যছন্দে ঘনবন্ধতার অভাব বলে চিত্রকল্পের

কাব্যিক যথাযথতা অনেক সময় ফুটতে চায় না। তা পর্যবসিত হয় প্রসঙ্গোক্তিতে। তাই অনেক কিছুর সঙ্গে বাংলা কাব্যের আধুনিক পর্যায়ের কবিরা পয়ারের শক্ত মেরুদণ্ডের মধ্যে আরেক গভীরতর শক্তি আবিষ্কার করলেন। তাঁরা দেখলেন কাব্যে কথ্যভাষার শক্তিমত্তাকে ধারণ করার জন্য গদ্যছন্দকে আমন্ত্রণ আবশ্যিক নয়। আরো দেখলেন, পয়ার যে শুধু যে-কোনো পরিমাণ যুক্তাক্ষরকে বহন করার যোগ্যতা রাখে তাই নয়, কথ্য স্রোতের স্বাধীন বেগবত্তাকে ধারণ করার ক্ষমতাও তার অসীম। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে-র কবিতার মধ্যে এ ধারণার যথেষ্ট সমর্থন মেলে। আর, এখানেই কবিরও পরীক্ষা বটে। স্বেচ্ছাবিহারের প্রান্তরে নয়, টেকনিকের সন্নিবদ্ধ সীমারেখার মধ্যেই কথ্যভাষার কাব্যিক পুনর্বাসনই তাঁর লক্ষ্য। অমিয় চক্রবর্তীর 'অভিজ্ঞান বসন্তে'-র কোনো কোনো কবিতায় শব্দের ও ছন্দের বিচিত্র নিরীক্ষা অনুধাবনীয় ঃ

আকাশ চাদরটা ময়লা জেটির একটানা কালো কয়লা,
নুর নবীর মাসপয়লা
অত্যন্ত ঘটা করে নয় ট্যাঁকে পয়সা গোটা ছয়
গড়ের মাঠ পেরিয়ে ঘোরে
ফুটবল দেখে, ডোরাকাটা গেঞ্জি খেলোয়াড় লাফাচ্ছে জোরে
চানাচুর একপয়সা মুখে পোরে।

উদ্ধৃতিটি কবির ছন্দ এবং শাব্দিক নিরীক্ষার নিজস্ব অভিজ্ঞানে স্বতন্ত্র। এর বাণীবিন্যাসে ও ছন্দোরীতিতে কাব্যের পুরনো সংস্কার ভাঙবার প্রয়াস সহজেই লক্ষ্য করা যায়। লোকায়ত কথ্যস্রোতকে ধরার প্রয়াস এর সর্বাঙ্গে। কবিতার 'থিম'-ও তার উপযোগী। কিন্তু 'ফুটবল দেখে' এই বর্ণনার পর 'ডোরাকাটা গেঞ্জি খেলোয়াড়'-এর 'খেলোয়াড়'-শব্দটি বাহুল্য 'দোষ'। শুধু বাহুল্য-দোষ নয়, বাংলা বাগ্‌বিধির ব্যতিক্রমও বটে। 'ডোরাকাটা গেঞ্জি' ওখানে সহজে বহুব্রীহি ; অযথা কর্মধারয় ভার বাড়িয়েছে মাত্র। 'চানাচুর একপয়সা'-ও বাংলা কথ্যরীতি-লঙ্ঘনের নিদর্শন। দু-জায়গাতেই শব্দবিন্যাসে এই লক্ষ্যভ্রম হয়েছে ছন্দকে ঈপ্সিত আকার দিতে চাওয়ার জন্য। 'চানাচুর মুখে পোরে এক পয়সার'—এমন লেখা হলে পয়ার জাতীয় ছন্দের দিকে ঝুঁকে পড়ত।

'অভিজ্ঞান বসন্ত'-এর ছন্দ ও ভাষা কথ্যভাষার সজীবতাকে ধারণ করার প্রয়াসে বিশিষ্ট। রবীন্দ্রনাথের গদ্যছন্দে সম-বিষম মাত্রার পর্বগুলি পাশাপাশি থেকেছে। কিন্তু ক্রিয়াপদ স্থাপনায় ব্যক্তিগত আচরণের জন্য তারা গদ্যের কাছাকাছি গেলেও কথ্যভাষার সজীবতা সেখানে আসে নি। অমিয় চক্রবর্তী

অভিজ্ঞান বসন্তে ছন্দের যতিস্থাপনায়, বিরাম-চিহ্নে, অন্তর্মিলে ও অন্ত্যমিলে একটা আপাতপারুষ্য এসেছে যা রবীন্দ্রনাথের গদ্যছন্দে দুর্লভ। যে মিশ্রসুরের বাদীসম্বাদী লীলায় এই ছন্দের সার্থকতা আসে, তা অবশ্য অভিজ্ঞান বসন্তে কবির করায়ত্ত হয়নি। কিন্তু এই আপাত অমসৃণতা পলকাটা হীরক খন্ডের মতো কবির অন্তর্লোকের দ্যুতিকে বিচ্ছুরিত করেছে। 'চীনে বুড়ো' কবিতাটি সেই দুর্লভতা প্রসঙ্গেই স্মরণীয় ঃ

মাটির বুকের কাছে থাকার ফল ?
বুড়োর মুখটা চাষকরা রৌদ্রপড়া শীতবসন্তের কুঞ্চিত মাঠ
আসল যা জীবনের তারি ঘনতা ধরেছে ললাট ?
না, গাছপালার মতো সহজ, সহজাত সরল, এই ফল
উঠেছে বেড়ে, পেকেচে চুল। মুখের মহিমা
যেমন ধান, সবুজ শীষ, জলের প্রসন্ন ভঙ্গিমা ?

এ ছন্দ চোখ দিয়ে পড়ার ছন্দ নয়, কান দিয়ে শোনার। সেভাবে না পড়লে, ছন্দোগত সংস্কারের যে অভ্যাস গড়ে উঠেছে, সেই অভ্যাসে পড়লে এ ছন্দের শক্তিকে চেনা যাবে না। অথচ চরণ থেকে চরণে বহতা ভাবনার ছন্দকে বাহ্যত ধরা হয়েছে পয়ারের বনিয়াদে। কিন্তু পয়ারের সেই মিশেল চোখে দেখা গেলেও, পড়তে গেলেই শোনা যাবে মৌখিক বাগ্‌ভঙ্গির স্বচ্ছন্দ ধ্বনি। এই counterpoint সৃষ্টির ক্ষমতা আছে বলেই অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় ছন্দ এলিয়ে যায় না। আবার ঃ

জীবন, জীবন মোহ
ভাষাহারা বুকে স্বপ্নের বিদ্রোহ—
    মেলাবেন তিনি মেলাবেন।

দুপুর ছায়ায় ঢাকা
সঙ্গী হারানো পাখি উড়ায়েছে পাখা
পাখায় কেন যে নানা রঙ তার আঁকা
প্রাণ নেই তবু জীবনেতে বেঁচে থাকা
        —মেলাবেন।

ধ্বনিপ্রধানে ছয়মাত্রায় নিশ্চয় একে রেখাঙ্কিত করা চলে। কিন্তু পড়তে গেলেই কানে আসবে কথ্যস্রোতের সতেজ ধ্বনি। একমাত্র 'পাখি উড়ায়েছে পাখা' —পুরনো কাব্যিক চাল। কিন্তু 'মেলাবেন' শব্দের ব্যবহারে যে ধ্বনি-বৈপরীত্য সৃষ্ট হয়েছে তার কাব্যিক ব্যঞ্জনাও অনুভব করার মতো।

কবিতার ছন্দের চালকে ঘুরিয়ে বেঁকিয়ে এক সুরমিশ্রণ সৃষ্টি কথকের চির-অভিপ্রেত। বাংলা লোকসাহিত্যের যে অংশ কথন-নির্ভর তার মধ্যে এ নিদর্শন দুর্লভ নয়। রূপকথার বিখ্যাত গল্পে কথক বলেন ঃ

না দিব না দিব ফুল উঠিবে শতেক দুর
যদি আসে রাজার ঘুঁটে কুড়ুনি দাসী
তবে দিব ফুল।

এর প্রথম চরণে তানপ্রধান ছন্দের যে গঠন—দ্বিতীয় চরণে তার ব্যতিক্রম। এবং এ শুধুই ছন্দের ব্যতিক্রম কিংবা বিপরীতায়ণ নয়, সুরের বিচিত্রতা সঞ্চারও বটে। অনুরূপভাবে স্মরণীয় :

নীলকমলের আগে লালকমল জাগে
আর জাগে তবোয়াল
দপ দপ করে ঘিয়ের দীপ জাগে—
কার এসেছে কাল।

ছড়ার চার মাত্রার চালই এর মূল ভঙ্গি। স্বভাবতই যে শক্তিমান তীব্রতা এর সর্বাংশে তা কথ্যস্রোতনির্ভর। তাই স্বরধ্বনির সংকোচবিস্তার কথার সুরকেই মেনে চলেছে। একমাত্র কৃত্রিম আলাপনে অভ্যস্তেরাই মনে করেন যে কথ্যভাষা সুরশূন্য, বিবর্ণ এবং নিরাবেগ। প্রকৃত কথ্যভাষা চলতে ফিরতে আলো ছড়ায়, সুর ফোটায়। বাংলা লোকসাহিত্যের আবহমান রসলোকে সেই লোকালাপনীর মাধুর্য চিরন্তন। কবি অমিয় চক্রবর্তীর রচনায় সেই লোকায়ত বাগ্‌ভঙ্গিমার জাদু অবশ্যই সক্রিয়।

তিন

তাই তাঁর শব্দচয়নে এবং গ্রন্থনেও কৃত্রিমকে পালনের জন্য বৃথা আকুলতা নেই, ব্যাকরণকে তিনি কথা ভুলে গিয়ে তোষণ করেন না। বিচিত্র তাঁর শব্দের ভাঁড়ার। 'কাঁসাটে', 'পিদিমছায়া', 'শাঁখনীল হাওয়া', 'সোনালি কাঁটা কাঁঠাল', 'শেয়াল ডাকানো চাঁদ', 'মাদুরে চ্যাপটানো প্রাণ', 'আপনতা', 'রাত্রি প্রান্তরিক', 'না দাড়ি কামানো বুড়ো', 'এককতা', 'হাঁস সাঁতারের জল', 'ঝাঁঝর রোদ', 'তুমি হীন জীবনতা', 'নব তৃণতায় অগণন', 'খেজুরের চোখা সবুজ',—কবির নিজস্ব অভিজ্ঞতালব্ধ অনুভূতির ফল। চলিষ্ণু বিশ্বজগৎ আপন বিস্ময়দীপকতায় কবির অনুভূতিটিকে চমকিত করেছে ক্ষণে ক্ষণে।

কবির অমর্ত ভাবনার প্রতিমা মর্তের প্রশ্রয়েই গড়ে উঠেছে বলে তার উপাদান-বৈভবের একদিকে রয়েছে :

জিইয়ে তুলবে বর্ষার নতুন কল্মিশাক
লাউডগা, কচি শসা, কাঁচা আমড়া, কচি লঙ্কা ;
সিঁদুরে মেঘের দূর মৃদু ডঙ্কা
গাছে কিচির মিচির পাখির ডাক
মেয়ে দুটি পুতুল নিয়ে ব্যস্ত, ছোট ছেলে দৌড়চ্চে দুরন্ত
—বাড়ন্ত, প্রাণবন্ত—(বসুধা)

অন্যদিকে ঃ

কিছুই না বলে
কী কথা গেলেন তিনি বলে
ভগবান বুদ্ধ, হাতে তুলে ধরে
পদ্মটি, আলোয় তুলে ধরে।
(ধর্মতার্কিক ব্রাহ্মণকে···)

আর মাঝখানে আছে :

অদৃশ্যে শেলাই করে কে এই শরীরে
রিপু তার বিনি সুতো ব্যথার গভীরে
(ভাঙা গোড়ালি)

মমতাময় জীবন, জীবনের অনির্বচনীয়তা এবং মানবিক দুর্জ্ঞেয় বেদনার ত্রিস্তরে কবির মনোভূমি গড়ে উঠেছে। এবং এখান থেকেই আমরা পেয়েছি অগণ্য চিত্রকল্পের পাপড়ি—পূর্ণ কুসুমের মতো কবিতাগুলিতে যেগুলি দৃঢ়লগ্ন। 'অগণ্য নিস্তরু ডাঙা ছায়া সাক্ষীহীন', 'বিদ্যুৎ করাতে চিরে শায়িত বৃক্ষের শরীর বানাই বুকের তক্তা', 'চীনে তুলিতে বুলিয়ে শাদা শূন্যে বকের ফিতে', 'কিছুক্ষণ শুয়ে থাকি ভুবনমাটির সঙ্গে শংখশুক্তি কালের বেলায়', 'চোরিশুভ্রতায় বন্দী বসন্তের ধ্যান', 'গাছে ধরে আছে ত্রিসংসার'—এবং এরকম আরো অব্যর্থ চিত্রকল্পের কাব্যময় প্রয়োগে কবি সিদ্ধহস্ত। জটিল চিত্রকল্প অথবা বিস্তৃত চিত্রকল্প অপেক্ষা সরল চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিত্রকল্পেই কবির পক্ষপাত বেশি। যে-চিত্রকল্প আপন স্বাধীন আচরণে জীবনানন্দীয় সাবলীলতায় প্রতীক হয়ে উঠতে চায়, সে-চিত্রকল্প অমিয় চক্রবর্তীর নয়। অনুভূতির প্রত্যক্ষ সঞ্চরণকেই ইনি মূর্ত করে তুলতে চান। তাই তাঁর প্রেমের কবিতায়—যেখান অনুভূতি আপনাতেই গাঢ় এবং গভীর—সেখানে সে গাঢ়তা সহজ সন্নিবিষ্ট মেঘের মতো বর্ষণকাঙাল ঃ

ঘুমোওনি জানি
তাই চুপি চুপি গাঢ় রাত্রে শুয়ে
বলি, শোনো,
সৌরতারা ছাওয়া এই বিছানায়
—সূক্ষ্মজাল রাত্রির মশারি—
কত দীর্ঘ দুজনার গেল সারাদিন
আলাদা নিশ্বাসে—
এতক্ষণে ছায়া ছায়া পাশে ছুঁই
কী আশ্চর্য দুজনে দুজনা—
অতন্দ্রিলা,
হঠাৎ কখন শুভ্র বিছানায় পড়ে জ্যোৎস্না
দেখি তুমি নেই। (রাত্রি)

এখানে ঋজু সম্ভাষণ, এখানে বচনের অন্যতীরবর্তী অনির্বচনীয়কে বিকিরিত করার প্রয়াস। এবং এই প্রয়াসের কথাটি বিশেষ করে স্মরণীয় এই কারণে যে 'অভিজ্ঞান বসন্ত'-এর কাব্যভাষায় চিত্রলভ্য যথাযথতা যেমন ছিল মুখ্য অভিপ্রায়, 'পালা বদল'-এ তেমন অনুভূতির শব্দোত্তর রহস্যকে সঞ্চারিত করার চেষ্টা। 'রাত্রি' কবিতাটি তার প্রমাণ। ব্যঞ্জনান্ত শব্দের সমাবেশে অভিজ্ঞান বসন্তে এসেছে এক নির্দিষ্ট পুরুষতা, তা ইংরেজী ছন্দোবিন্যাসের আধুনিক চারিত্রের সাদৃশ্যবহ। 'পারাপার'-এ ও 'পালাবদল'-এ বাংলা ভাষার স্বাভাবিক স্বরান্তপ্রবণতা আবার প্রাধান্য পেয়েছে। বাংলা ভাষার কোমল লাবণ্যের অন্তর্গূঢ়তাকে কবি বেশি বিশ্বাস করেছেন। 'কখনো আধ্যাত্মিক শান্ত তরল দৈগন্তিক' অথবা 'তোমার আঙ্গিকক অমোঘ আবর্তন' পারাপার ও পালাবদলে খুঁজে পাওয়া যায় না।

চার

'পারাপার' ও 'পালাবদল' অমিয় চক্রবর্তীর কবিকীর্তির পরমলগ্ন—তারপর থেকে 'পুষ্পিত ইমেজ' পর্যন্ত এই পর্যায়েরই অনুবর্তন। 'পারাপার'-এ কবির দৃষ্টি বাইরে থেকে ভিতরের দিকে যাবার পথ খুঁজেছে—বিষয়ের বাইরে থেকে বিষয়ের ভিতরে, সেই সূত্রে নিজের বাইরে থেকে নিজের ভিতরে। 'দূরযানী' কাব্যগ্রন্থে যেমন রবীন্দ্রভাবাশ্রয়ী কবিচেতনা অমিয় চক্রবর্তীর নিজ স্বভাবকে গৌণ করে ফেলেছিল, 'পারাপার'-এ তেমনি স্বভাব ও স্বধর্ম প্রাধান্য পেল।

'পারাপার'-এও রবীন্দ্রছায়ায় উপস্থিতি অনুভব করা যায়—কিন্তু সে ছায়ায় এই কবির কল্পনা বরং মুঞ্জরিত হয়েছে স্বাধীনভাবে। মানুষের যে চিরন্তনে রবীন্দ্রনাথ অমেয় বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন, যে-বিশ্বাস তাঁর শেষতম কাব্যগ্রন্থ পর্যন্ত অনির্বাণ, কবি অমিয় চক্রবর্তীর 'পারাপার' ও 'পালাবদল'-এ সেই বিশ্বাসেরই গুঞ্জরন। রবীন্দ্রনাথ যে-ভাবনাংশে চিরন্তন, অমিয় চক্রবর্তী তার চিরন্তনত্বের ভবিষ্যৎ সেই অংশেই অর্পণ করে রেখেছেন। সে ভাবনাবৃত্তের মূল কথা হল জীবনের ভাণ্ডার অফুরান—মধুর, তোমার শেষ যে না পাই।

'পারাপার'-এ কবির বর্ণসম্পদ-চেতনা জীবনের রূপতরঙ্গেরই ইঙ্গিতবহ। এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে 'ঠিকরোনো রাঙা বন্যা', 'লাল মনসা', 'তীব্র তামাটে পাহাড়', 'শাদা নীল কাঠের এ বাড়ি', 'নীল বাঁধানো স্বচ্ছ মুকুর', 'শাদা ভাবনা', 'হাতল সবুজ তামা', 'সবুজ অন্ধকার', 'স্ট্রবেরির ঝোপে লাল মিষ্টি ফল', 'নীল ঢেউ', 'চেরির শাদা পুষ্পোচ্ছ্বাস', 'সারি দেওয়া উইলো আর শাদা বাড়ি', 'নীল ইচ্ছা', 'চোখা সবুজ', 'কাঠের সবুজি দীপে গাছ', 'সুরের শাদা চূড়ো'। একেকটি কবিতায় রঙের আলাপ চিত্রীসুলভ তৎপরতায় পূর্ণ। যেমন :

ফেলো ছায়া
ফেলো রঙ কবিতার কাঁচে
রঙিন আগুনি কাঁচে
ঘন মায়া, ঘন মায়া।
কাঠের সবুজি দীপে গাছ,
জলের আলোর নীলে মাছ
শাঁখে সাদা ছায়া নাচে
হলুদে বালির নাচে
দ্রুত বাঁচে
আমার কথার কাঁচে।

লক্ষণীয়, কোনো কবিতাতেই বিবাদী রঙের সংঘাত সমন্বয়ের জন্য কবি আকুল নন। তার সব রঙই প্রসন্নতার স্মারক, প্রশান্তির দিকে তাদের ইঙ্গিত। তাই শাদা রঙ তাঁর স্থায়ী বর্ণপট। সেই বর্ণপটে তাঁর যে কোনো বর্ণাভা আমাদের নিয়ে যেতে চায় কলরবের বাইরে। তিনি জানেন ভিড়েরই আছে দেশিকতা—অথচ ভিড়ের মধ্যেই যা রয়েছে তা ভিড়কে ছাড়িয়ে, তা সার্বদেশিক।

এই সার্বদেশিকতার মধ্যেই অমিয় চক্রবর্তীর নিজস্ব ভারতীয়তা। যা

ধূলির ধন, যা চক্ষের জলে ভিজে, তা নয় ; যা ঊর্ধ্বশিখ, ঊর্ধ্বচূড়, যা অনন্ত নীরবের দ্বারস্থ, সেই নিরপেক্ষ ধ্যানজগতের সন্ধান করেন তিনি। মন্দির আর গির্জার চূড়া তাই কবির মনকে আকর্ষণ করে সহজে। যে কোনো উচ্চতা তাই কবিকল্পনায় সেই আরোহীচিত্ততার অনুষঙ্গ হিসাবে কাজ করে। উঁচু বাড়ি, গাছের চূড়া একই স্মৃতিবহ। 'দূরযানী' কাব্যগ্রন্থের এই পরম অনুভূতির প্রস্তুতি ছিল 'সিঁড়ি'র প্রসঙ্গে :

ক. আসন্নিক লগ্ন বয়ে যায়
তার মধ্যে বাসনার শুভ্র ধ্যানে
উষার সিঁড়িতে বসে আছি ॥

খ. তোমারই চোখের দীপে আলো দেখে, একা
সিঁড়ি দিয়ে যেতে ধাপে ধাপে
সারাজীবনের ঊর্ধ্ব দীর্ঘপথে অনির্বাণ
জেনেছিল তোমাকেই ধ্যানে।

গ. প্রেম হাতে ধরে
কেন নিয়ে চলে ঊর্ধ্বে, কেন সিঁড়ি ওঠা ;

ঘ. তোমার মন্দিরে প্রভু সারা সূর্যবেলা
সিঁড়িতে ধুয়েছি ধাপ,

ঙ. পূজারির হাতে প্রদীপে কাঁপানো আলোয়
ঘুরে যায় চোখে সৃষ্টি দৃশ্য
পাহাড়-সিঁড়িতে-আকাশে আঁধারে মেশা
শঙ্কর মন্দিরে।

উত্তরণের প্রতীক এই 'সিঁড়ি'। 'পারাপার' গ্রন্থে সিঁড়ির ভূমিকা অনেকটা নূ্যন, তার বদলে সেখানে এসেছে সেই সব প্রসঙ্গগুলি যা আকাশের আলোক-বিধৌত নীলিমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। 'পারাপার' নামকরণের আপাত-অর্থের আড়ালে যে গভীর অর্থ দ্যুতিশীল তা হল ঐ আলোকসিন্ধুর এপারের মর্তকূল আর ওপারের অমর্ত আভাসের মধ্যে পারাপার। বারে বারে তাই ঊর্ধ্বলোকের ভাবনা কবির ব্যবহৃত কাব্যপ্রসঙ্গে ছায়া ফেলেছে ঃ

ক. ওঙ্কার উঠেছে বাঁকা পাথুরে নিখাদে মুয়েজিন
মরমী ধূসর ধ্বনি শূন্যে ঈশ্বরিত।

খ. নয়নীল ছিন্নের শূন্যে ত্রিশূল।

গ. ঝোড়ো শূন্যে দেওদার,

ঘ. গাছের মর্মরে শান্তি থরথর, পর্বত উঁচুপথ
সেইখানে প্রার্থনায় বহুকণ্ঠে যার কণ্ঠ ছিল
ঢং ঢং ঘন্টা বাজে মনে হয় তাকে ফিরে চিনি।
ঙ. লাল নীল বিদ্যুৎ অক্ষরে
রাত্রির শূন্যের শীর্ষে চিহ্নমালা জ্বলে গেছে শুধু
চ. মাথা নাড়ে 'জানি' 'জানি' ক্যাথলিক গির্জা চূড়া স্থির।
ছ. উজ্জ্বল আকাশ-চেরা গম্ভীর বিরাট উঁচু বাড়ি,
জ. প্রকাণ্ড পিতল বাঁধা কাঠের তোরণ অগণন

অনন্তের স্বচ্ছ জ্যোতিঃকণা যে সংগীত শুনে স্তব্ধ সেই বার্তাবহ স্তব্ধতার দিকেই কবির দৃষ্টি।

এবং এইখানে কবির ভারতীয়ত্বের নিজস্ব চেতনা। এক চিরধ্রুবজ্যোতির দিকে সমস্ত পরিবর্তনশীল মর্ত-নশ্বরতার যাত্রা—এই অধ্যাত্মবোধই কবিকে তীর্থংকর করে তুলেছে। সেখানেও রবীন্দ্রনাথের মতোই তিনি জানেন যে তাঁর তীর্থ পথের প্রান্তে নয়, পথের দুধারের জীবনের মাধুর্যই তাঁকে দেবালয়ের সন্ধান দিয়েছে। অবশ্যই তিনি অলৌকিককে খোঁজেন না, খোঁজেন লৌকিকের চলচ্ছবিতে অমর্ত্যের প্রসাদ ঃ

অপার্থিব জাদু খোঁজে ধার্মিকেরা দৈবঘটনায়
তারো চেয়ে অলৌকিকলোকে আছি প্রত্যেক নিমেষে,
নিয়মের ভেল্‌কি সে তো সব প্রত্যাশার পারে মেশে,
স্বপ্নে ওড়ে প্রজাপতি গুটি-কাটা রেশমি মাথায়।

ভারতবর্ষের ঋষির ধ্যানলব্ধ সত্যকে তিনিও অনুভব করেছেন—তদ্দূরে তদ্বন্তিকেচ।

পাঁচ

কিন্তু এই অনুভূতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অনুভূতির অমিলও দুস্তর। এবং সেই অমিল অমিয় চক্রবর্তীকে সাহায্য করে নি। খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে ঃ রবীন্দ্রনাথের শুভ্রতার ধ্যান অন্ধকারের পটেই সমুজ্জ্বল। অমিয় চক্রবর্তীর শুভ্রতার পিছনে কোন নির্দিষ্ট ব্যর্থতার কৃষ্ণবর্ণ বা বেদনার নীলের পটগত বৈপরীত্যের সমর্থন নেই। 'তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে'-- রামকেলি-আশ্রিত এই গীতপদের জন্মবৃত্তান্ত ছিন্নপত্রাবলীর ১৫২ সংখ্যক পত্রে বিবৃত হয়েছে। যে পত্রে এই আলোক-চেতনার উদ্ভাসন, তার পরবর্তী ১৫৩

সংখ্যক পত্রে বাংলার জীবনের বাস্তব অন্ধকার সম্বন্ধে কবির বেদনা ও বিক্ষোভের প্রকাশ ঘটেছে ? তখনকার বৃটিশ উপনিবেশের জীবনগত নানা অন্ধকারের সঙ্গেই মিশে গিয়েছিল তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত অন্ধকার-চেতনা। অভিধা এবং ব্যঞ্জনায় মিশে তাঁর অন্ধকারের অনুভূতি তাই বিশিষ্ট। 'সেদিনে ধন্য হবে তারার মালা/তোমার এই লোকে লোকে প্রদীপ জ্বালা/আমার এই আঁধারটুকু ঘুচলে পরে'—এখানে অন্ধকারকে সেই তাৎপর্যেই বুঝতে হয়। অন্ধকারের এই ব্যঞ্জনা অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যে নেই বলেই তাঁর কাব্যভাবনা অগ্রসরধর্মী নয়, বৃত্তধর্মী। তাঁর শেষতম কাব্যগ্রন্থ দুটিতে তাই একই ভাবনার দ্যুতি একই প্রসঙ্গে বিচ্ছুরিত। প্রেমের আলোকভাতিকে কোন্ পটে ধারণ করবেন এ বিষয়ে তাঁর কোনো আগ্রহ নেই। পাঠকের কাছে এদের মূল্য শুধু এই যে, নম্র বিনয়ী ব্যক্তিত্বের স্নিগ্ধ প্রসাদ এখানে সহজেই লভ্য। প্রেম 'পুষ্পিত ইমেজ'-এ বিপুল সমারোহে আবির্ভূত কেউ নয়, প্রেম সেখানে প্রত্যহের রৌদ্রের মতোই সহজ, বৃষ্টির মতোই প্রাকৃতিক। অথচ তাঁর মৃদুকণ্ঠে এ ভ্রান্তিরও অবকাশ নেই যে, সে প্রৌঢ়-অবসন্নতায় ম্লান। কিন্তু সেই মৃদুকণ্ঠে পূর্ণকুম্ভের ব্যঞ্জনা নেই—আমাদের অতৃপ্তি এইখানে।

অমর্ত গ্যাসের আলো সারি
আমি-যে প্রেমের যাত্রী, চলেছি কোথায়
ভুলে যাই আর সব, শুধু জানি বুকের পকেটে
তার শাদা কাগজের চিঠি আছে, এ-জীবনে
পেয়েছি সে ডাক-চিঠি, যেতে হবে শুধু
অনির্ণীত যুগ্ম পথে ; হোক দুঃখে, হোক সুখে জাগা ॥

বাচ্যে, ব্যঞ্জনায় এবং রূপায়ণে 'রাত্রি' কবিতার থেকে এ কবিতা অগ্রসর হয় নি। যে অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনের পূর্ণতা 'রাত্রি' কবিতায় স্বাদ্য, তা এখানে নেই। এ যেন উপসংহারের এপিলোগটুকু বলার জন্যই বলা। প্রেমে কোথায় উপসংহার! সবই নতুন করে পাওয়া, সবই আর এক উপক্রমণিকা।

'পুষ্পিত ইমেজ'-এই বোঝা গেল যে, অমিয় চক্রবর্তীর জীবনে ও জগতে সর্বত্র নৈঃসঙ্গ্যের যন্ত্রণা অনুপস্থিত। এক আত্মগত প্রশান্তি কবিকে প্রেমিকার মতো, জননীর মতো লালন করেছে। সেই প্রশান্তির পূর্ণতায় একাকিত্ব থাকতে পারে, কিন্তু নৈঃসঙ্গ্য নেই। তাই দেখা গেল, তাঁর অধ্যাত্ম-অনুভূতিতে প্রেম কোনো বিশিষ্ট আলোকসম্পাত করে নি, তাঁর প্রেমের চেতনাও স্নিগ্ধতার

কবিপ্রশস্তির বাইরে গেল না। এক সীমান্তবিহীন বৃহৎ জগতের ভাবৈক্য সন্ধান করতে গিয়ে কবি নিত্যপ্রত্যক্ষের রৌদবৃষ্টি জলকাদাকে এড়িয়েছেন। তাই তাঁর কবিতায় শান্তমধুর কোনোদিন সুদৃঢ় পটভূমির সমর্থন পেল না। কথ্যছন্দ সম্বন্ধে তীক্ষ্ন শ্রুতির অধিকারী তিনি, এক নিজস্ব ছন্দঃপ্রত্যয়ও তাঁর আয়ত্তে এসেছিল, তথাপি তিনি তাঁর সমস্ত টেকনিক-চেতনাকে বড় সহজে আপস করতে দিলেন। যে স্নিগ্ধতাকে তিনি অর্জন করেছেন, তা যে আজকের প্রত্যক্ষ জগৎ থেকে নিষ্কাশিত করে অর্জন করেছেন, এ নিদর্শন তাঁর কাব্যে কোথাও নেই।

বিষ্ণু দে—নদীতেই নিশ্চয় প্রতীক

এক

দীর্ঘ কবিতায় আধুনিক কবি সিদ্ধি অর্জন করেন বহু বিপরীতের পরস্পর প্রতিঘাত ও ঘনিষ্ঠ সন্নিবেশজনিত এক ঐকরস সৃষ্টির মাধ্যমে। এই জটিলতা যখন এত দুর্মোচনীয় ছিল না, যখন অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতা ছিল প্রধানত দ্বৈত সঙ্গীতের মতো দুই সহযোগী, তখন দীর্ঘকবিতা প্রায়শই ছিল কাহিনী-নির্ভর। কোলরিজের প্রাচীন নাবিকদের গান সেই অর্থেই পুরাতনী দীর্ঘ কবিতা নয়, যে অর্থে সেখানে কবি-কল্পনা 'একাধিকের ঐক্য' রচনা সম্ভব করেছে। কোলরিজের 'রাইম অফ দি এন্‌শ্যেন্ট ম্যারিনার' কতখানি প্রতীকী কবিতা সে সম্বন্ধে যদিও বিতর্কের সূচনা করা চলে, এবিষয়ে তো কোনো সন্দেহই নেই যে এই কবিতায় চিত্রকল্পগুলি ক্রমশই ব্যাপকতর অনুষঙ্গ সৃজনের মাধ্যমে সমৃদ্ধতর হয়েছে—কবিতার সূর্য এবং চন্দ্র, অপরাধ এবং প্রায়শ্চিত্ত, ন্যায় এবং অন্যায় সংক্রান্ত সাবয়ব কাহিনীকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। আমাদের অবশ্য এর পরে মনে হয় যে অতঃপর একে প্রতীকী বলতে বাধা কী? কেননা চিত্রকল্পগুলি অনুষঙ্গের পরিধি বাড়াতে বাড়াতে এক সময় স্বাধীনতা পেতে চলেছে। তখনই এ কবিতার সূর্যের মতোই অনেক কিছুই হয়ে উঠেছে প্রতীক। অথচ এ যদি প্রতীকী না হত, তা হলে Angel's head-কে পরিবর্তিত করে gods' own head লেখার কোনো প্রয়োজনই হত না। ক্রান্তীয় সূর্যের প্রথম প্রকাশে যে গৌরবী সমুজ্জ্বলতা, তা অচিরে হারিয়ে যায়, সে সূর্যই হয়ে ওঠে অপ্রিয় এবং অশুভ। ক্রান্তীয় সূর্যের এই দ্বৈত রূপ প্রাকৃতিক সত্য—এই সত্যের দ্রষ্টাদের কাছেই তা দ্ব্যর্থক!

এই অংশেই আধুনিক কবির জগতের সঙ্গে কোলরিজের জগতের ব্যবধান। কোলরিজের নাবিকেরা নৈতিক সঙ্কটে দ্বন্দ্ব দীর্ণ। কিন্তু যে বিশ্ব তাদের অস্তিত্বের ধারক, সে বিশ্বের সকল কিছুই যথাস্থানে যথাদত্ত ভূমিকা পালন করছে। পক্ষান্তরে আধুনিক কবির জগৎ নানা বৈপরীত্য, নানা অসঙ্গতিতে বাদীবিবাদীর লীলায় দুরূহ। সেখানে দীর্ঘ কবিতায় যে তৃতীয় স্বর শ্রুতি-গোচর, সে তৃতীয় স্বর ঐ জটিলতার মধ্যবর্তী দ্রষ্টা—তারই অভিঘাত বা impact-এর বাহক-কণ্ঠস্বর ঐ তৃতীয় স্বর।

দুই

উনিশশো তিরিশ থেকে উনিশশো সত্তর পর্যন্ত রবীন্দ্রোত্তর বাংলাকাব্যের মূল ছবিটিতে দুই বিন্যাসের তাৎপর্য বুঝতে ভুল হয় না। তার একটির প্রধান কবি সুধীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ। বুদ্ধদেব বসু, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অরুণ মিত্র, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষ কমবেশি এই ধারারই অনুবর্তী। মুখ্যত এটা প্রতীকী কবিতার ধারা। আর একটি ধারার প্রধান কবি বিষ্ণু দে। এটি আধুনিক কবিতার ধারা। সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, মঙ্গলাচরণ ও মনীন্দ্র রায় এই ধারার কবি। উনিশশো থেকে উনিশশো পঞ্চাশ পর্যন্ত য়ুরোপীয় কাব্যধারায় এই জাতীয় এক বিপরীত বিন্যাসের কথা স্মরণীয়। তার একদিকে ছিলেন ইয়েট্স, ভালেরি, রিল্কে, উনামুনো,—আর একদিকে ছিলেন যে যার দেশজ ভূমিতে ও কালে উদ্ভূত এডিথ সিট্ওয়েল, টি. এস. এলিয়ট, পল এলুয়ার, মায়াকোভস্কি, লোরকা, পাস্তেরনাক ইত্যাদি। অবশ্যই আমরা বাংলা কাব্যের এই জাতীয় ধারা বিশ্লেষণে এক নিঃসম্পর্ক গোত্রভেদ কল্পনা করছি না। বরং মনে করতে পারি জীবনানন্দের ও বুদ্ধদেবের অধুনিক সচেতন বেদিতার নিদর্শনগুলি, মনে করতে পারি বিষ্ণু দে-র কবিতার প্রতীক-গূঢ় অংশগুলি। সে কারণেই এ শ্রেণী বিভাগ কাব্যের তথ্য-সন্ধ ইতিহাসকারের কাছে যতটা প্রয়োজনীয়, বিশুদ্ধ রসনান্বেষীর কাছে হয়তো ততটা নয়। একথা য়ুরোপের কাব্যধারা ও রসবিচার সম্বন্ধে যেমন সত্য, রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার ধারা সম্বন্ধেও তেমনই সত্য।

জীবনানন্দ চেয়েছেন অবগাঢ় হতে। বিষ্ণু দে হতে চেয়েছেন অবহিত। প্রতীকী কবি, প্রসঙ্গত আমরা ইয়েটস-এর কথা বলতে পারি, তাঁর চিত্রকল্প-গুলিকে ব্যবহার করেন ঊর্ধ্বপ্রয়াণের সোপান হিসাবে। আধুনিক কবি চিত্র-কল্পকে ব্যবহার করেন তাঁর প্রাত্যহিকের প্রতি মুহূর্তের দৃঢ় ও সজাগ সচেতনতার প্রতিচিত্ররূপে। বাংলা কাব্যসাহিত্যে বিষ্ণু দে অনন্যসাধারণ সচেতনতার অধিকারী বলেই তিনি এই যুগের প্রধান আধুনিক কবি। কালের সাম্প্রতিক ছন্দে ধৃত দেশ এবং বিশ্বে কবি প্রত্যক্ষ করেছেন ঘাতে-প্রতিঘাতে, সহযোগে এবং দ্বন্দ্বে আলোড়িত মানবিক চিদাকাশকে। সেখানে প্রতিটি অদ্যতনী অতীত এবং আগামীর উষা-রজনীতে নিত্যস্নায়ী। ঐতিহ্য-প্রাণিত এই কবির চিন্তা শুধু বৌদ্ধিক স্তরেই আবদ্ধ নয়। চিন্তা তাঁর কাছে অভিজ্ঞতা। হেনা চামেলি, শাদা বেলফুল বা গোলাপের মতোই চিন্তা তাঁর কাছে প্রত্যক্ষ ভাবে সংবেদ্য। অবগাঢ় হলেই মুক্তি মেলে, কিন্তু অবহিত হলে না জানানো পর্যন্ত মুক্তি নেই। অবহিত হলে ভাষা দিতে হবে, অভিব্যক্তি

দিতে হবে সময়ের সুতীক্ষ্ন আবেগকে। বিষ্ণু দে-র চিত্রকল্প সেই প্রগাঢ় অবধানতার চিত্রকল্প।

তিন

বিষ্ণু দে-র 'অন্বিষ্ট'-অধ্যায়ের কবিতাগুলির দুটি প্রতিনিধি-স্থানীয় কবিতা 'এলসিনোরে' এবং 'জল দাও' বর্তমান আলোচনার বিষয়। অন্বিষ্ট-অধ্যায়ে কবি সময়ের মর্মগত ভাষাকে কাব্যভাত করতে চেয়েছেন। এই পর্বের কবিতাগুলিতে যে সব চিত্রকল্প এবং কাব্যপ্রসঙ্গের ব্যবহার ঘটেছে তারা ঐ সময়ের ভাবরূপ গড়ে তুলেছে, গড়ে তুলেছে তার বস্তুরূপ। কবি-ব্যবহৃত কাব্যপ্রসঙ্গগুলি এই ঃ

১. সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত
২. শ্রাবণ-আশ্বিন
৩. চামেলি হেনা গোলাপ শাদা বেলফুল
৪. দগ্ধদিন
৫. বাহু
৬. নরক>দুর্গন্ধ>দুঃসহ>কুম্ভীপাক>স্বর্গহীন লুসিফর
৭. পথ চলা, ঘরে ফেরা বা নীড়ের প্রসঙ্গ
৮. নদী>বান>সমুদ্র
৯. সঙ্গীত
১০. বিপরীত বর্ণ সমাবেশ কল্পনা।

অন্বিষ্ট-অধ্যায়ের প্রায় সব কবিতায় কমবেশি ব্যবহৃত এই প্রসঙ্গপুঞ্জ কবির বিস্তৃত অবধানতার, তাঁর গভীরতম বোদিতার রূপকল্প হিসাবে দেখা দিয়েছে। 'সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত' সময়ের নিরবচ্ছিন্নতার স্মারক। 'শ্রাবণ-আশ্বিন' কালের অনিবার্য পরিবর্তমানতার সাক্ষ্য। চামেলি, হেনা, গোলাপ, বেলফুল সময়-প্রহারিত জর্জর অস্তিত্বের মাঝে সহসা-প্রত্যক্ষ এক ভবিষ্যতের ইঙ্গিত।

আমার চামেলি আকাশে আঁধারে গোলাপ বন কে হানল ?
কার গানে জাগে ঘুম ভাঙানিয়া বন শিউলির গন্ধ ?
(প্রতীক্ষা)

অথবা

কর্মের সম্বিতে স্তব্ধ
অভ্রান্ত সম্পূর্ণ সত্তা

রাত্রির নক্ষত্রে যেন প্রকৃতিস্থ অস্তিত্বের আকাশে স্বাধীন
একরাশ শাদা বেলফুল। (জল দাও)

ফুল এখানে স্বপ্নোত্তর উপলব্ধির প্রতীক। সেই শক্তিকে উপলব্ধি, যে শক্তি আঁধারের বুকে ফুটিয়ে তোলে রক্ত উষা, যে শক্তি সবলে অধিকার করে ক্লান্ত জীবনের সমস্ত ম্রিয়মানতা, তা-ই—এই ফুল>গন্ধ প্রসঙ্গে রূপান্বিত হয়েছে। নাট্যরসাশ্রিত এই প্রয়োগে ফুল বা গন্ধ এক নতুন তাৎপর্য পেল। জীবন সচেতনতার একটা পর্যায়ের সহসা সঞ্চারণ এই ফুলের প্রতীকে আভাসিত হল। চিন্তা সেখানে এমনই প্রত্যক্ষ যে ইন্দ্রিয়ের সীমাগুলিও মিলে মিশে যায়ঃ

গন্ধের আলাপ তার বাজে
পাপড়িতে পাপড়িতে তার পরাগের পাখোয়াজে (জল দাও)

প্রসঙ্গত এখানে এবং অন্য নানা ক্ষেত্রে কবি যে সঙ্গীতের চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন তারা শুধু সঙ্গীতের অনুষঙ্গ নয়, বরং সঙ্গীত যে vital import-এর তাৎপর্য বহন করে এ তারই স্মারকঃ

এ কে গান করে! আহা শোনো শোনো এ কী
অশরীরী প্রাণদান!
আকাশে এ কার পাখা ঝিকিমিকি
নীল নাস্তিক আখরে ভরাট তান
উপল স্রোতের এই আঁকা বাঁকা, এই বুঝি ঋজু
তুষার চূড়ায় স্বচ্ছ হাওয়ার কৈলাস নির্মাণ। (এক জলসায়)

তদুপরি "গন্ধের আলাপে তার বাজে···" এই অংশে ইন্দ্রিয়ের সীমানাগুলি মিলে মিশে গেছে। সচেতন অস্তিত্বের রূপকল্প রচনার এও এক কবিপন্থা।

রুদ্ধশ্বাস বিবর্ণ অস্তিত্বের ছায়া পড়েছে দগ্ধদিনের চিত্রে ও চরিত্রে। এই সূত্রেই উচ্চারিত হয়েছে নরকের অসহায়তার কথা। 'নরক' নিঃসন্দেহে সময়ের তদানীন্তন বিকলতায় ক্লিন্ন দুরবস্থার সূচক। কতবার 'নরক' প্রসঙ্গ উচ্চারিত হয়েছে দেখা যাকঃ

১। নরকে আমারও যাত্রা ··
২। নরকের পরে এ রচনা···
৩। পিছনে নরক যাত্রা
৪। আগুনে তুষারে নরকের শাদায় কালোয়···
৫। আদিম গ্লানির কঠিন কুম্ভীপাক···
৬। দান্তে নরকে এ জীবন লোলিহান···
৭। নরকে দিয়ো না বলি····

এই নরক-বোধের মূলে যে সময় চেতনা তা সর্বাংশে তুলনীয় নয় হ্যামলেটীয় খেদোক্তির (Time is out of joint :—O cursed spite / That ever I was born to set it right.) সঙ্গে, কিন্তু সেই সময়ের অবৈকল্য-সন্ধানী উদ্‌গ্রীব নায়ককেই সর্বাগ্রে মনে পড়ে এই নরক-বোধের প্রসঙ্গে।

তখনই তাৎপর্যে দুলে ওঠে "বাহু" :

১। আজ শুধু রাখি তোমাকে দু বাহু ঘিরে···
২। তোমার বাহু পেয়েছি বাহুডোরে···
৩। মুক্তি দাও বুক্তে বুক্তে তোমার বাহুতে· ·
৪। আমরা বেঁধেছি ঐ নীলাকাশ বাহুর বন্ধনে···
৫। তোমার বাহুর পটভূমি গ্রীক ফাঁসিকাঠ···
৬। মিলুক ধান ও বাহু···
৭। নবীন তোমার দু বাহু আমারই পিয়াল গাছের শাখা

'অন্বিষ্ট'-অধ্যায়ে বাহু শুধু প্রেমের আবেগের ধারক অথবা আশ্রয় নয়—বাহু মানুষের সমগ্র অস্তিত্বের কর্মিষ্ঠ আর্তির প্রতীকও বটে। এবং এই সব মেলালেই হৃদয়াভিরাম হয়ে ওঠে বিষ্ণু দে-র বিকাশশীলতা, তাঁর সমগ্র চেতনা। 'অন্বিষ্ট'-অধ্যায়েরই কোনো কোনো অংশে কবির বর্ণ-চেতনাও আধুনিক চিত্রীর মতোই সীমাহীন বাস্তবের অশেষ বার্তার দিকে ইঙ্গিত করে :

সন্ধ্যা সোনালি বয়ে আনে নদী
সাগরের স্রোতে দক্ষিণ হতে শাদা ঝাঁকে ঝাঁকে
ফিরোজা আকাশে কষায়িত মেঘে সুনিল আকাশে
চংক্রমণের তুরঙ্গ পাকে উত্তরঙ্গ পাতি
একঝাঁক আলো, আলো করে গান (এক জলসায়)

চার

মানবিক জীবনের ত্রিকাল-প্রাণিত চেতনাই প্রগাঢ় হতে হতে রচিত হয়েছে 'এলসিনোরে'—রচিত হয়েছে 'জল দাও'। 'এলসিনোরে' কবিতায় 'অন্বিষ্ট' অধ্যায়ের প্রধান চিত্রকল্প ও কাব্য প্রসঙ্গগুলি যথা—'বৈশাখ>শীতল বন্যা', 'সারেঙীর গান', 'নরক>দুর্গন্ধ', 'বাহু', 'আষাঢ়', 'ফুল'—সবই সংহত হয়েছে কবির সময়-চেতনার ও জীবন-চেতনার বিস্তৃত পটে। বিষ্ণু দে র কবিতায়, 'ওফেলিয়া'-য় প্রথম এবং কতদিন বাদে 'এলসিনোরে'-তে দ্বিতীয়বার সময়স্পৃষ্ট চেতনা কথা বলতে চেয়েছে হ্যামলেটের আবরণে। 'ওফেলিয়া'

কবিতায় তিরিশের কবি দেখিয়েছিলেন যে দৈনন্দিনের জীবনযাত্রায় অকৃতার্থ-তার প্রবেশাধিকার দুষ্প্রতিরোধ্য হলেও সেই সময়ের মধ্যবিত্ত নায়ক যে প্রাণদা শক্তিকে ওফেলিয়া বলতে চায়, তার কাছে প্রার্থনার মধ্যেই রয়েছে জীবনের স্বান্দিক অস্তিত্বের অনুভূতি :

মুক্তি-ইশারা নয়নে তোমার দূরবিহঙ্গ নভোবিহার,
শান্তি তুষার মুঠিতে তোমার, ছড়াও বারেক বৃষ্টিধারে।
হৃদয় ওড়াও আকাশে, জীবন হোক তুষার ॥
(ওফেলিয়া)

'এলসিনোরে' কবিতায়ও উদ্দিষ্ট ওফেলিয়া—কিন্তু কবিতার নাম এই কারণে 'এলসিনোরে' যে, এখানে সময়ের সেই বিকলতার চেতনা আরও তীব্রতা পেয়েছে। এলসিনোরের অভিজ্ঞতা থেকেই হ্যামলেট এ সিন্ধান্তে পৌঁছেছিলেন :

Hamlet—Denmark's a prison
Ros—Then is the world one.
Hamlet—A goodly one ; in which there are
many confines, wards and dungeons,
Denmark being one of the worst.

হ্যামলেট আরো জেনেছিলেন, The goodly frame, the earth, seems to me a sterile promontory ; this most excellent canopy, the air, look you, this brave o'erhanging firmament, the magestical roof fretted with golden fire,—why, it appears no other thing to me than a foul and pestilent congregation of vapours.

—অম্বিষ্ট অধ্যায়ে 'এলসিনোরে'-র হ্যামলেট অনাচার-জর্জর সময়ের দিকে তাকিয়ে জর্জরিত হতে হতে বলে ওঠেন :

এখানে যখন প্রসাদ ওখানে প্রতিবেশী উপবাসী
ওদিকে আকাশ মুক্ত অথচ এলসিনোর তো কারা
দানেমার্কের রাজাসনে লাগে ঘৃণ
হাওয়ায় কলুষ লুব্ধ পাপের খুন।

অথচ একালের হ্যামলেট ছদ্মবেশের সুযোগেও একথা বলতে পারে না man delights not me, তাই এই স্তবকটি পূর্ণতা পায় এই চরণে :

তুমি আনো আজ জীবনের বিশ্বাস।

প্রকৃতির পরিপূর্ণতা ও মানুষের ভগ্নাংশিকতায় যে বৈপরীত্য শেক্সপীয়রের

নায়ক তাকে দেখিয়ে দেন নির্ভুল ভাবে। বিষ্ণু দে হ্যামলেটের মধ্যস্থতায় 'অথচ' অব্যয়ের প্রয়োগে সেই বৈপরীত্যের মধ্যে উজ্জীবনকে ডাক দেবার প্রেরণা পান। foul and pestilent congregation of vapour 'এলসিনোরে'-তেও স্বীকৃত এই সব উক্তিপুঞ্জে: "কুটচক্রের অন্ধ আঁধারে" "এ প্রেতলোকের দুর্গন্ধে", "মৃত্যুর পূতি"। কিন্তু এখানে প্রধান হয়ে উঠেছে ছদ্মবেশ মোচনের তথা নিষ্কর্ম অবসাদ ভেঙ্গে ফেলার আবেগ। যে চেতনায় লব্ধপ্রজ্ঞ হ্যামলেট বলেছিলেন:

The readiness is all.

—তা থেকে ভিন্ন এক চেতনায়, অন্যতর জীবনার্থে বিষ্ণু দে বলেন:

হাওয়ায় হাওয়ায় হাতে হাতে নীড় দাও
দ্বন্দ্ব মুখর অবসাদ ছিঁড়ে নাও
মুখে এনে দাও প্রস্তুতি ঘন ভাষা।

'নরক', 'দুর্গন্ধ', 'মৃত্যুর পূতি', 'প্রেতলোক' প্রভৃতির মধ্যে উজ্জীবক ফুলের আশ্বাস অন্ধকারের বিপরীতে সূর্যোদয়ের মতো:

সে সূর্যোদয়ে তুমিই তো ফুল
কিম্বা কালের বাগানে আমার ঘুম ভাঙানিয়া মালিনী।
ঘোচাও আমার অধীর ছদ্মবেশ।।

ওফেলিয়া তথা জীবনই এখানে প্রেম, এখানে উজ্জীবক। সেই উজ্জীবক জীবনই গ্রথিত হয়েছে তাঁর চেতনায়, গাঢ় করেছে তাঁর বেদিতাকে।

হ্যামলেটের মৌল ট্র্যাজিক সত্তার আলোকেই আমরা কবি বিষ্ণু দে-র আপন মুখপাত্র-নির্বাচনের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারি। সে প্রসঙ্গে লক্ষণীয় কবিতার 'দিনেমার' শব্দটি। 'দানেমার্কের রাজপুত্র' অপেক্ষা 'দিনেমার'-শব্দটি তাৎপর্যসূচক। দানেমার্কের একজন অপাপবিদ্ধ মনস্বী নাগরিক হিসাবেই শেক্‌সপীয়রের নায়ক জেনেছিলেন যে, সে রাষ্ট্রের দুষ্ট ক্ষতকে অস্ত্রোপচারে দূরীভূত করার দায়িত্ব তাঁরই। এ দায়িত্ব তিনি উপেক্ষা করতে পারেন না, একজন সচেতন সামাজিকের মতই পারেন না। এ নায়কেরও স্বভাব-জগতে এবং পরিবেশে ঘটেছে দারুণ বিপর্যয়, তত্রাচ সেই বিপর্যয়ের মধ্যে হ্যামলেটের মতই (His normal world has been upset, but some enlightenment has dawned ··) তাঁরও চেতনায় এক নব প্রত্যূষ সমাসন্ন হয়েছে। 'এলসিনোরে' কবিতার শেষতম স্তবকের 'সূর্যোদয়' তারই ইঙ্গিত। এ কবিতার যে-'দীপাধারে' এ জীবনশিখা জ্বলে উঠল, তাও কবি

বিষ্ণু দে-র নিজস্ব রচনা। ই. এম. ডবলিউ. টিলিয়ার্ড তাঁর Shakespeare's Problem Plays-নামক আলোচনায় এই সূত্রেই বলেন : And when Hamlet curses the spite by which he was born to be the victim and the cure, we thrill because it might be any of us. এইখানেই 'হ্যামলেট'-এর সঙ্গে আধুনিক সময়-তাড়িত ব্যক্তিপাত্রের অভেদ-কল্পনার আরম্ভ। কিন্তু আরম্ভ মাত্র, আর কিছু নয়। কেননা আমাদের এও জানা আছে যে, 'হ্যামলেট'-নাটকে ম্যাকবেথের মতো সামাজিক অথবা রাজনৈতিক তাৎপর্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। কিন্তু তাতে কী যায় আসে? হ্যামলেটের সমস্যা ব্যক্তির দায়িত্ব-সম্ভূত উদ্বেগের ফল। তিনি তো দায়ী ছিলেন না তাঁর মাতার ব্যভিচারী পুনর্বিবাহের জন্য। তাঁর পিতৃব্যের অনাচারেও তো তাঁর প্রশ্রয় ছিল না। তবু তাঁকেই বহন করতে হবে সব অনাচারের যন্ত্রণা। এ যুগের শুদ্ধচিত্ত নায়কও একথা জানেন যে, জর্জরতা এবং অনাচার তাঁর সৃষ্ট নয়। কিন্তু এর দায় তাকে বহন করতে হবেই। এই অনাচারকে লক্ষ করেই সক্রিয় হবার জন্য তাঁর উদ্বিগ্ন ব্যাকুলতা। যে উদ্বাস্তুতা আধুনিক মানসতার একটা অমোচনীয় লক্ষণ তাও এই ব্যাকুলতাকে দিয়েছে তীব্রতা :

তোমার হৃদয়ে ঘরভাঙা পাক ঠাঁই
তোমাকে আজকে হাওয়ায় হাওয়ায় চাই
বটের ছায়ায় চৈতালী নিশ্বাস। (এলসিনোরে)

এই অনুভূতি 'অন্বিষ্ট' পর্যায়ের অন্য কবিতাগুলিতেও রেখায়িত, যথা 'দিনান্ত' কবিতার বিভিন্ন আলাপ, অথবা এই অধ্যায়েরই আরো কোনো কোনো কবিতার পথ ও প্রত্যাবর্তনের আবেগ। আরেক পর্বে 'ওফেলিয়া'-কবিতার এ অংশ স্মরণে আসে :

তুমি যেন এক পরদায় ঢাকা বাড়ি
আমি অঘ্রাণ শিশির-সিক্ত হাওয়া—
বিনিদ্র তাই দিনরাত ঘুরে ফিরে—(ওফেলিয়া)

এবং এই উদ্বাস্তুতার উদ্বেগ বুকে নিয়ে এ যুগের নায়ক তার অন্বিষ্ট প্রেমকেই জানে প্রেমের থেকেও মহত্তর—'আমি যে তোমাকে ভালবাসি সে কি তাই শুধু ওফেলিয়া'? অথবা 'তুমি সখী, বধূ, মাতা হে প্রেয়সী তুমিই প্রাকৃত গতি'।

পাঁচ

এবং এই ভাবঘনতা 'এলসিনোরে' কবিতায় এনে দিয়েছে সংহত গঠন। ছোটো ছোটো স্তবক একদিকে মনে করিয়ে দেয় সেই দিনেমারের "wild and whirling words", অন্যদিকে এ যেন আজকের চরিত্রপাত্রের আত্যন্তিক বিচ্ছিন্নতার হাত থেকে মুক্তির প্রাণপণ প্রয়াসে এক ক্ষিপ্র অথচ দীপ্র ভঙ্গি। অনেকগুলি স্তবক পেরিয়ে শেষতম স্ববকে পৌঁছলে পাঠকের মনে এক মহাকাব্যিক প্রশান্তি স্থির হয়ে উঠে। এবং এই অসম স্তবক পরম্পরা এক অলক্ষ্য পরিকল্পনায় ধৃত। সমগ্র কবিতাটিতে তিনটি তরঙ্গ—'এ কী বৈশাখী সারাদিন আজ ধারা' এখান থেকে 'শপথ জানাই আমি তো জানাই শপথ'-পর্যন্ত প্রথম তরঙ্গ। সময়ের বিকলতা সম্বন্ধে অবধানতা এর মূল সুর। 'পিতৃপুরুষ আমিই বইব জীবনের দায়ভাগে'—এই অংশ থেকে 'কে বাপ কে ভাই জীবনের দাবি ধুয়ে দেয় যারা পদলেহী চাটুকারে'-পর্যন্ত দ্বিতীয় তরঙ্গ। এই অংশে এ চরিত্রপাত্রের আধুনিক জিজীবিষা হয়ে উঠেছে আবেগকম্প্র। 'তুমি জয়গান আষাঢ়ের গান মেঘে মেঘে একাকার' এই চরণ থেকে 'ঘোচাও আমার অধীর ছদ্মবেশ'-পর্যন্ত তৃতীয় তরঙ্গ। এই চরিত্রপাত্র জীবনের টানেই অতঃপর নেমে পড়তে চায় কর্মের স্রোতে। সেখানে সে নতুন কালের নায়ক।

ছন্দে ছয়মাত্রার ধ্বনিপ্রধান চাল হ্রস্ব দীর্ঘ ঢেউ জাগিয়েছে। তা কবি-কল্পনার স্বভাবেই হয়ে উঠেছে চরিত্রটির ভাবনার হ্রস্ব দীর্ঘ ঢেউ। স্বাধীন বাক্যাংশের দিকে দৃষ্টি রাখলে আবৃত্তিকারক জানতে পারেন যে 'চিন্তা আমার গুহাহিত', বা 'উদ্দেশ/রাজার পায় না', বা 'হন্তারকের হাতে/অধরা চিন্তা', প্রভৃতি অংশে বাগ্‌ভঙ্গি কথ্য গদ্যরীতির অনুগামী। কিন্তু সেই গদ্যগত বাস্তবতার মাঝেই, তার ওপর দাঁড়িয়েই গড়ে উঠেছে কবিতার উন্নীত ভাষা:

—এদিকে হৃদয় হৃদয় আমার মাতে
পাহাড়ে সাগরে রাজপথে পথে দুর্গের দৃঢ় ছাতে।
হোরেশিও শুধু চেনে সে ছদ্মবেশ।

এবং এই দুই প্রান্তের দিকে কবির দৃষ্টি অপক্ষপাতী বলেই তাঁর কবিতা শুধু ভাষার সঙ্গীত নয়, ভাষ্যের সঙ্গীতও বটে। বাগর্থের যে মিলিত সঙ্গীত এখানে গুঞ্জরিত হতে হতে মুক্ত কণ্ঠ, তাঁর পরিচয় আমাদের কথিত তৃতীয় তরঙ্গের সর্বত্র। সেখানেও 'উদ্বায়ু সন্ত্রাসে' বা 'প্রস্তুতি ঘন ভাষা' পূর্বগামী এবং অনুগামী ভাষাদের মাঝখানে থেকে এক অপরূপ অর্থদ্যোতনা সৃষ্টি করে। তা-ই এই কবিতার সঙ্গীত।

ছয়

পঞ্চম দশকের শেষে 'জল দাও' কবিতাটি লিখিত। সময়ের এই বিশিষ্ট পটভূমি কবিতাটিতে ব্যবহৃত। কিন্তু যে-ব্যক্তিপাত্র কবিতাটিতে কথা বলেছে তার চারিত্রের কারণে কবিতাটি সময়সীমাকে লঙ্ঘন ক'রে চিরকালের বাণীতে রূপান্তরিত হয়েছে। এই রূপান্তর, এই এক ভাব থেকে শাশ্বতকে নিষ্কাশিত ক'রে নেওয়ার জন্য কবির অনেক কবিতাই শিল্পধন্য; কিন্তু 'জল দাও' কবিতাটি বিশেষ মূল্য অর্জন করেছে এই কবিতার যিনি নায়ক তাঁর ব্যক্তিত্বের জন্য। বস্তুচেতনা ও চরিত্রপাত্রের পারস্পরিক সম্বন্ধ পাতের ভিতর দিয়েই দীর্ঘ কবিতার রসসিদ্ধি ঘটে। সেই অংশে দীর্ঘ কবিতার নিজস্ব আধারে মহাকাব্যের তন্ময় বৈশিষ্ট্যের দৃঢ় শৈলীর আভাস পাওয়া যায়। 'জল দাও' সেই গুণবত্তায় সম্পন্ন। দেশ বিভাগ, দাঙ্গা, রাজনৈতিক হঠবাদ, আত্যন্তিক শোচনীয়তা এবং এক সার্বত্রিক হতাশার ভিতর দিয়ে একটি বিশুদ্ধির দিকে অবিরাম যাত্রার প্রেরণা এই কবিতার বিষয়। ব্যক্তিপাত্রটির চিৎমুকুরেই সমগ্র বিষয়ের প্রতিফলন। ধীরে ধীরে ব্যক্তিপাত্রটির বেদনা সূচিমুখ তীব্রতায় প্রাতিস্বিক হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই প্রাতিস্বিকতার মধ্যে রয়েছে সার্বজনীন অভিজ্ঞতার সারাৎসার।

কবিতাটিতে কতকগুলি সর্বনাম ব্যবহৃত হয়েছে। 'আমি', 'তুমি' এবং 'তার' বা 'সে'—এই সর্বনামগুলি কবিতার ভাব ও পরিবেশাশ্রিত কল্পনার ধারক। কবিতার প্রথম উচ্চারণেই যে-'তাব'—আর একেবারে শেষ প্রান্তে যে-'তুমি', এদের দুজনের অভেদ অনুধাবনীয়। এই উভয়ের মধ্যে আপাতপার্থক্য একটা, হয়তো কল্পনার বাইরে নয়। সে হিসাবে বলা যেতে পারে প্রথম সর্বনামটি প্রকৃতির বিকল্প এবং শেষ সর্বনামটি প্রেমিকার জন্য। কিন্তু পৃথিবীর দিক থেকে যিনি প্রকৃতি, কবির দিক থেকে তিনিই প্রেম। বিষ্ণু দে-র ব্যবহৃত নিসর্গ রূপকতঃ জীবনের স্বরূপকে উদ্‌ঘাটিত করে। তাই তাঁর প্রকৃতি আর প্রেম একই চেতনার দুই পিঠ—সে চেতনার মূল কথা হলো জীবনের ব্যাধি নিরাময়ের ক্ষমতায় আস্থা। জীবন শুধু জীবন নয়, তা সঞ্জীবনীও বটে।

'জল দাও' কবিতার 'আমি' সেই পরিমাণেই কবি বিষ্ণু দে, 'লাভ সং অফ জে. আলফ্রেড প্রুফ্রক' কবিতার 'আমি' যে-পরিমাণে এলিঅট স্বয়ং। কবি এবং তার কল্পনাসম্ভব চরিত্র—এই দুই ব্যক্তিত্বই যেমন জে. আলফ্রেড প্রুফ্রকের আধারে রূপায়িত, 'জল দাও' কবিতার 'আমি'-ও তেমনি একটি জীবনযন্ত্রণায় দাহ্যমান চরিত্র এবং কবি নিজে। চরিত্রটি এই ডাবলিং অফ দি পার্সনালিটি-র

প্রতিনিধি বলেই তা আমাদের কাছে অভিজ্ঞতার মতো সত্য হয়ে উঠেছে। এই কবিতার 'আমি'-র কণ্ঠে কখনো কখনো 'আমাদের' সর্বনামটি উচ্চারিত হতে শোনা যায়। প্রেমিক যেমন 'আমি-তুমি'-কে মিলিয়ে 'আমাদের' বলেন, এখানে 'আমাদের' শব্দে সেই অর্থকে লক্ষ্য করা হয়নি। এখানে 'আমি'ই ব্যাপকতা লাভ ক'রে 'আমাদের' হয়েছে। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় 'আমরা' বা 'আমাদের' বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করেছে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও কবিদের নিজ-নিজ চেতনা অনুসারে 'আমরা' শব্দের ব্যঞ্জনাও পৃথক হয়েছে। জীবনানন্দের 'আমরা' আর বিষ্ণু দে-র 'আমরা' এক কথা নয়। আলোচ্য কবিতায 'আমাদের' শব্দটি কাব্যের মূল থীমকে সহায়তা করে। যন্ত্রণাবাহী 'আমি' যাতে শেষ পর্যন্ত যন্ত্রণার অহঙ্কারে চিহ্নিত না হয়, 'আমাদের' শব্দটিতে তারই ইঙ্গিত।

কবিতাটির প্রারম্ভে, প্রকৃতির কর্মসূত্রের ইঙ্গিতে জীবনের অদম্য প্রবাহের রূপক নির্মিত—সেই রূপকটাই কবিতাটির যেখান থেকে প্রকৃত আরম্ভ ('তাই আজ যখন আকাশে নির্জন বিষাদ') তার পটভূমি হিসাবে গ্রাহ্য। যে ভৌম দৃঢ়তায় বনস্পতি ডালপালা মেলবার শক্তি পায়, আলোচ্য প্রথমাংশটুকু তারই সঙ্গে তুলনীয়। আর অনুধাবনীয় বাচনের ধীর লয়। মহাকাব্যোপম নিরাসক্ত প্রশান্তি এই ধীর লয়ের বাচনভঙ্গির সঙ্গে তুল্য। বিস্তৃত কাল কালান্তর, বিস্তৃত প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে কবি বা কবির নায়ক সেই অনুভূতিকেই প্রাণবন্ত করেছেন, যে অনুভূতিতে বাংলাদেশের বাউল কবি বলেছেন—'ওরে নিঠুর গরজী তুই মানস মুকুল ভাজবি আগুনে...'

'অন্ধকার পরোয়ানা শিমুলের লালে'—এই প্রত্যক্ষ চিত্রকল্পের সাহায্যে কবিতাটির রচনাকাল মূর্ত হয়েছে। সেই সময়ে—ব্যক্তিস্বাধীনতা যখন দলিত, রাজনৈতিক চিন্তা যখন নানা দিকে আহত, দেশবিভাগের যন্ত্রণা তীব্রতর, তখন 'পরোয়ানা' শব্দটি অশুভ ছায়ার চিত্রকল্প হিসাবে, শুধু সুনির্বাচিত নয়, অব্যর্থ তাৎপর্য সঞ্চারী হয়ে উঠেছে। অথচ এই অংশেই প্রকৃতির মুকুরে জীবনের অন্তহীন অপরাজেয়তা দূরাগত আশ্বাসের অভয়বাচন শোনাতে চেয়েছে। তা তৎকালে প্রচলিত গরমাগরম ছন্দঝুমঝুমি-বাজানো ছেলে-ভোলানো রাজনৈতিক আশাবাদ নয়। তা আমাদের পরিচিত পাত্রটির, তথা কবির অস্তিত্বের বৃহত্তর অংশের অভিজ্ঞতার দান। 'জল দাও' কবিতার 'আমি' অত্যাচারে এবং অনাচারে উদ্‌ভ্রান্ত সময়ের বুকে এক যাত্রী-চরিত্র। ব্যক্তির নিজ জীবনে এবং তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশে যখন আশ্বাসের উৎসগুলি বিপন্ন হতে থাকে, যখন নির্জনতা ঘনিয়ে আসে জনতার মধ্যে দাঁড়িয়েই, যখন সমস্ত

আকাশে হয় দাহ, নয় বিষণ্ণতা, যখন ভীষ্ম বা বৃহন্নলার মতো কর্মস্রোত স্থগিত, অথবা অন্য-পথচারী—তখনই সমগ্র সত্তার পরতে-পরতে, অদৃশ্য অথচ সুনিশ্চিত অন্বেষার যন্ত্রণা শুরু হয়। স্থানিক সমগ্রতাকে অতিক্রম ক'রে কালগত সমগ্রতার লক্ষ্যে মানুষের পূর্ণতার সাধনা। তৃষ্ণা এবং জলের রূপকে এই বিপুল অন্বেষার বেদনা এবং আবেগকে এই কবিতায় ধারণ করা হয়েছে। 'গরমে বিবর্ণ', 'গরম হাওয়ায় ঝরে নীল আর বেগুনি ফুরুষ', 'হিংস্র গরম', 'বালিচড়া মরা নদী', 'দগ্ধ দিনের মৃত্যুর শহরে'—প্রভৃতি প্রসঙ্গে সেই তীব্র তৃষ্ণার অস্তিত্ব। তৃষ্ণার মতো বারি-বোধক আর কিছু হতে পারে না। তাই তৃষ্ণার তীব্রতায় জলের প্রতীক্ষা এত জীবন্ত। এই উজ্জীবন-বারির জন্য প্রতীক্ষাই 'জল দাও' কবিতার মূল থীম।

'রৌদ্রের কুয়াশা জ্বলে ঝরা মরা পোড়ো লেবার্ণমে'—এই প্রাকৃতিক পটভূমিতে 'দেশছাড়া লোক ছায়ায় হাঁপায়'। এই সব কর্মহীন, অর্থহীন ছন্নছাড়া স্বদেশে ছিন্নমূল, জীবনের ভগ্নতায়, ব্যর্থতার অসহায় অবস্থায় মনে হয় 'হয়তো-বা নিরুপায়/হয়তো-বা বিচ্ছিন্নের যন্ত্রণাই বর্তমানে ইতিহাস'। এই যন্ত্রণামথিত চিত্তে পূর্ণতাকে খুঁজে ফেরা। অথচ কবিতাটিতে কোথাও নৈঃসঙ্গ্যবিলাস নেই। কিন্তু একটি ক্লান্তি, একটা জটিল পথ অতিক্রমের অনুভূতি, মাঝে মাঝে এক দুঃসহ অচরিতার্থতা, নানা আকারে ছায়া ফেলেছে। 'সমুদ্রের আন্দোলন বান-ডাকা সন্ত্রাসে নিঃশেষ'—এমনি একটি মর্মান্তিক আক্ষেপোক্তি। যে কোনো অমূল উদ্‌ভ্রান্ত উন্মাদনার পটভূমিতে এ এক আশ্চর্য সময়োত্তীর্ণ উক্তি।

সময় 'জল দাও' কবিতার বিষয়। নির্দিষ্ট কালখণ্ডের সঙ্গে ব্যক্তির বোঝাপড়া, সেই আকালের বাঁকাচোরা গলিপথে অথবা ঋজু রাজপথে ব্যক্তির যাত্রা ও পরিশেষে, সিদ্ধি নয়—সিদ্ধান্তই কবিতাটির বাস্তব বহিরঙ্গ। প্রতি মুহূর্ত যখন অত্যাচারে অনাচারে উদভ্রান্ত, তখনও ইতিহাসের পরিণতির অমল মহিমাকে বিশ্বাস ক'রে যে-যাত্রা, তারই প্রতি মুহূর্ত ছড়িয়ে আছে এই কবিতায়। ভয় তখন সব থেকে বেশি বিচ্ছিন্নতাকে, নৈঃসঙ্গ্যকে। চিত্রকল্পের মূল ধারা তারই সঙ্গে সংলগ্ন ঃ

ক. যখন আকাশে নামে নির্জন বিষাদ

খ. হয়তো-বা নিরুপায়
হয়তো-বা বিচ্ছিন্নের যন্ত্রণাই বর্তমানে ইতিহাস
. বালিচড়া মরা নদী জলহীন পায়ে পারাপার

গ. নির্বাক নিমেষহীন সন্ধ্যা পূর্ণচাঁদের মায়ায়
হেমন্ত বিষাদ এ কি বসন্তে এনেছে ?

ঘ. কুরুক্ষেত্রে ভীষ্ম যেন কিংবা সেই বিরাট প্রাসাদে
অজ্ঞাত বাসের বীর বৃহন্নলা অর্জুনের গান

ঙ. অথচ নিঃস্রোত মনে হয় একা কর্মহীন
প্রতিবেশী নেই
থাকলেও নিঃসঙ্গ সে, কারণ, সর্বদা
পরধর্ম ভয়াবহ ভাঁটায় জোয়ার
সমুদ্রের আন্দোলন বান ডাকা সন্ত্রাসে নিঃশেষ

অথচ এই নির্জন বিষাদকে ঘিরে রয়েছে প্রকৃতির অমেয় প্রসাদ। বিষাদকে ভেঙে সেই প্রসাদে মিলিয়ে দেওয়ার কোনো গাণিতিক সূত্র কবি জানেন না। বরং প্রকৃতির প্রসাদের সুবিস্তীর্ণ পটে বিষাদকে স্থাপন করার মধ্যে জীবনে বিচিত্র সমগ্রতার আভাস মেলে। জীবনেও প্রকৃতিতেও নানা বিপরীতের দ্বন্দ্ব। তাই গরমে বিবর্ণ হয় গোলমোরের সাবেক জৌলুস—সেই যাত্রিকের চোখে আনে জ্বালা কিন্তু তার বিস্ময় বিপন্ন নয়, সে তার আগেই জানে :

সন্ধ্যার প্রান্তরে এসে নিঃস্বার্থ আকাশে দেখি
ফুটে আছে শান্ত শুচি
সময়ের জড়ো করা ভুল একটি মুহূর্তে ধুয়ে
বিনীত পদ্মের মত নিশ্চিন্ত অথচ দান্ত
কর্মের সংবিতে স্তব্ধ
অভ্রান্ত সম্পূর্ণ সত্তা
রাত্রির নক্ষত্রে যেন প্রকৃতিস্থ অস্তিত্বের আকাশে স্বাধীন
একরাশ শাদা বেলফুল।

তার বিস্ময় বিপন্ন নয় বলেই তার যন্ত্রণা আরো তীব্র। চিত্রকল্পে চিত্রকল্পে অস্তিত্বের যন্ত্রণার রূপাধার গড়ে উঠেছে। পদ্ম সৌন্দর্যময় পরম প্রশান্তির ভারতীয় প্রতীক। প্রসঙ্গত আমরা আরেকবার স্মরণ করতে পারি 'অন্বিষ্ট'-অধ্যায়ের ফুলের প্রতীকী ব্যঞ্জনার কথা। স্মরণ করতে পারি উত্তরণের সেই পরমা প্রতিমাকে। কিন্তু বিষ্ণু দে এই স্বাভাবিক প্রতীকের সঙ্গে 'বিনীত' শব্দের সংযোগে ছবিটিকে অন্যতর গভীর অর্থে মূল্যবান করেছেন। চারিদিকের অত্যাচার অনাচার পাপের মাঝে পদ্মের শুচিতা যেমন স্মরণীয়,

তেমনি বিনয়ও। বিনয়ই তার শুচিতাকে গ্লানিময় সমগ্রের দিকে তাকিয়ে মূল্যবান করে তুলেছে। যন্ত্রণার মোচড়ে মোচড়ে যাত্রিকের অভিজ্ঞতায় রূপাধারগুলি এই আকার নিয়েছে :

ক. তবু লুব্ধ রুদ্রের মাঘের
পাতাঝরা পাতা-ঝরানোর ক্ষোভের রাগের
তবু সেই বাঁচার মরার মরীয়া যন্ত্রণা চলে
আমাদের দিনের শিকড়ে রাত্রির পল্লবে

খ. তবু সন্ধ্যা চৈত্র সন্ধ্যা সমুদ্রের বার্তাবহ
দগ্ধ দিনে মৃত্যুর শহরে
তবুও পূর্ণিমা আসে পথে ছাদে প্রত্যক্ষ কায়ায়
ডুবিয়ে দিনের ছায়া কূট দুর্বিষহ..

গ. যখন সামনে দেখি সেতুর ফাটলে
অতলের প্রত্যাখ্যান এবং আহ্বান

ঘ. তাই প্রতীক্ষায় স্তব্ধ কিন্তু সমুদ্যত
অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে খরদীপ্ত নৃত্যমঞ্চে বোল ছড়াবার
আগের মুহূর্তে আভঙ্গআতত
বালাসরস্বতী কিম্বা রুক্মিণী দেবীর মতো—

দেখা যাবে চিত্রকল্পগুলি কোথাও আকস্মিক সাহসিকতায় উদ্বেল নয়। অথচ দীর্ঘ কবিতার উপযুক্ত আততি এদের প্রত্যেকটিতে বিদ্যমান। পক্ষান্তরে এই আততি নিজে কোনো পৃথক দৃষ্টির পক্ষপাত দাবি করে না। 'গ' চিহ্নিত অংশে চিত্রকল্প কালখণ্ডকে তার আত্মবিরোধ সমেত মূর্ত করেছে। 'ঘ' চিহ্নিত চিত্রকল্পের রূপাধারটিকে তুলে ধরার পরিশ্রমদীর্ঘ প্রয়াস যদিও বিচ্ছিন্নভাবে ক্লান্তিকর ব'লে মনে হয়, সে প্রয়াসকে সময়ের পটে স্বাভাবিক ব'লে মেনে নিতে কষ্ট হয় না। ক্লান্তি এবং প্রতীক্ষার কবি-কল্পনা, নিঃস্রোত এবং ঢেউ-এর চিত্রকল্প, যখন শেষ স্তবকের সিদ্ধান্তে আসে, 'তোমার স্রোতের বুঝি শেষ নেই...'তখন এই রূপকল্পের ভিতর দিয়ে জীবনের রূপক উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। শেষ স্তবকের যাত্রিকের এই হৃদয়াভিরাম আত্মনিবেদনের জটিল প্রস্তুতি ছড়িয়ে রয়েছে এই দীর্ঘ কবিতাটির পর্বে-পর্বে, চরণে-চরণে। পৃথকভাবে চিত্রকল্প গুলির কথা তখন আমাদের মনে থাকে না। থাকে শুধু কবিতাটির শুদ্ধ রসপরিণাম।

কবিতাটিতে প্রকৃতির বিচিত্র ভূমিকা লক্ষণীয়। আতুর এবং আর্ত অস্তিত্ব-

পীড়িতের কাছে প্রকৃতি অবশ্যই আশ্রয়। কিন্তু এ-কবিতার প্রকৃতি মানুষের সহযোগী। যেগুলি জীবনের মূল ধারার পরিপন্থী শক্তি, এ-প্রকৃতি তাদেরই প্রতিস্পন্দী: 'হয়তো-বা শুনিনিকো হাসি' স্তবকটি এক্ষেত্রে স্মরণীয়। 'হাসুবে কি একাই নিষাদ' কিংবা তারো আগে 'অথচ বৈশাখী হাওয়া বাংলার সমুদ্রের'—প্রভৃতি অংশে বিনষ্টির প্রতিস্পর্ধী প্রকৃতিকে অনুভব করা যায়। এই প্রকৃতি শেষ পর্যন্ত আর কেবলমাত্র প্রকৃতি নয়—অপরা প্রকৃতির ভিতর দিয়ে পরা-শক্তির সঙ্গে তুলনীয় (এ তুলনা কবির নয়) যে পরম সঞ্জীবনী শক্তি কাজ করে চলেছে, তাকেই দেখা গেল 'সাগরউত্থিতা সেই অধিষ্ঠাত্রী সুন্দরীর আবিশ্ব আভাসে,' ইনিই কবির সমগ্র অস্তিত্বের সারাৎসার প্রতিমা। কবিতার শেষ স্তবকে যে প্রশান্তি তা এঁকে উপলব্ধি ক'রেই। তা শুধু তৃষ্ণারই নিবৃত্তি নয়, প্রেমের প্রত্যয়ও। 'তোমার স্রোতের বুঝি শেষ নেই...'এখান থেকে শেষ চরণ পর্যন্ত শান্তরসাশ্রিত অংশ কবিতাটির গঠনে শৈল্পিক পূর্ণতা প্রদান করেছে। যে যন্ত্রণা, যে বেদনা এই কবিতার সর্বত্র মূর্ত, তা বৃহৎ এক উপলব্ধির আশ্বাসে শান্ত – সেই প্রশান্তিই পূর্ণতা। গাঠনিক সৌষম্য এবং শৈল্পিক অভিপ্রায়ের সাযুজ্যে কবিতাটিও অখন্ডতা লাভ করেছে। প্রথমাংশের উপস্থাপনা ('একরাশ শাদা বেলফুল' পর্যন্ত), দ্বিতীয়াংশের অস্তিত্বের যন্ত্রণাভাতি ('সমুদ্রের আন্দোলন বান-ডাকা সন্ত্রাসে নিঃশেষ' পর্যন্ত) যেন নানা বাঁকে নানা মোড় ফিরে কবিতাটির তৃতীয় এবং শেষ অংশে সমুদ্রের বিস্তার লাভ করেছে। আর সবটাই বলা হয়েছে এক লোকায়ত বেগবান কথ্যস্রোতের সহায়তায়। ঐতিহ্যপুষ্ট শব্দরাশির সঙ্গে সজীব কথ্য ভাষার নিজস্ব ছন্দকে মিলিয়ে এ-কবিতার বাক্‌সিদ্ধি অর্জিত হয়েছে। কখনো বিষাদ, কখনো প্রত্যয়, কখনো অতীত, কখনো বর্তমান এই নানা অসবর্ণের জটিলতা এখানে চরিত্রবান ভাষাতেই জীবন্ত। আর এই মিলহীন কবিতায় কবির ব্যবহৃত সুপ্রচুর অন্তর্মিল ('আমাদের ঘরে-ঘরে আমরাও নানান মানুষ···বাঁকুড়ায় চলেছে ঢাকায়' অংশটি প্রসঙ্গত স্মরণীয়) যেন আপাত অনৈক্যের অন্তর্বর্তী যোগসূত্রের মতো ক্রিয়াশীল। এবং ঐ বেগবান কথ্য স্রোতের তরঙ্গ-ভঙ্গে এ কবিতার শেষাংশের সঙ্গীতকল্প vital import রচিত হল। এ কবিতায় চিত্রকল্পপুঞ্জ কবির সচেতনতার মূর্তিপুঞ্জ। লক্ষণীয় 'পথ' বা 'ঘরে ফেরা' অন্বিষ্ট অধ্যায়ে আরেকটি প্রধান প্রসঙ্গ। অন্বিষ্ট কবিতার ২ সংখ্যক অংশ, অথবা '১৪ই আগস্ট' কবিতার 'দেখেছি মেলায় এক'-অংশ কিংবা 'অবিচ্ছিন্ন কাব্য'-কবিতার 'ঘুরে ফিরে সেই স্বপ্নেরা পথে ঘোরায়'-অংশ, বা 'শব্দের ছন্দের স্পন্দ'-কবিতার 'নেই গলির সীমানা, পায়ে চলার শেষ কোথা'

—ইত্যাদি পুনরাবৃত্ত পথ-প্রসঙ্গ এই অধ্যায়ের কবিমানসতার একটি দিককে নির্দিষ্ট করছে। 'জল দাও' কবিতায় পথ পরোক্ষভাবে এক বৃহত্তর তাৎপর্য সৃষ্টি করে। অন্বেষার প্রতীক এই পথ, পথই অন্বিষ্ট। তাই এখানে অনিবার্য স্বর ধ্বনিত :

আমি দূরে কখনও বা কাছে পালে পালে কখনও বা হালে।
তোমার স্রোতের সহযাত্রী চলি ভোলো তুমি পাছে
তাই চলি সর্বদাই...

এই চলাই জীবন। কবির কাছে এবং আমাদের কাছেও।

উদ্বিগ্ন বিষাদ ও কবি সুধীন্দ্রনাথ

ফর্মের সাহায্যেই সুধীন্দ্রনাথ প্রমাণ করলেন তাঁর জীবনদর্শন। যখন প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর জগতে চারিদিকে পরিকীর্ণ রয়েছে নানা ভগ্ন মূর্তি, নানা বেপথু 'ফর্ম', নানা পুরাণো সঞ্চয়ের আবর্জনা, তখন সুধীন্দ্রনাথ ব্যাকুলভাবে খুঁজে ফিরেছেন শব্দের সুঠাম সমাবেশ, ফর্মের স্বভাষী মাহাত্ম্য। এই সন্ধান একদিকে বিস্ময়কর। অপর দিকে এই সন্ধানের মধ্যেই সুধীন্দ্রনাথ লিপিবন্ধ করে গেলেন তাঁর ভবিতব্যের ইঙ্গিত। বিস্ময়কর বলছি এই কারণে যে, এই ফর্ম-সচেতনতা প্রমাণ করে, তাঁর কবিচেতনায় প্রতিবিম্বিত চতুর্দিগ্বর্তী 'না'-এর মাঝখানে একটা সঠিক 'হ্যাঁ'-এর সন্ধান তিনি কী করে রেখেছিলেন, যা না হলে ঐ ফর্ম-সচেতনতা সিদ্ধি পেত না। আর এখানেই ছিল তাঁর ভবিতব্যের ইঙ্গিত একথা বলার কারণ এই যে, আকৃতির মহিমা ধ্যানে তন্ময় কবি এই আসনে বসেই ভুলে গেলেন পরিবর্তনশীল প্রকৃতিকে।

অথচ সুধীন্দ্রনাথের ধ্যানী মনীষাও অস্বীকার করতে পারেনি তদানীন্তন জীবনের দ্বান্দ্বিক অভিব্যক্তিকে। তাঁর প্রথম কাব্য-সাধনায় চিত্রকল্প প্রায়ই ধূসর বর্ণানুষঙ্গের পক্ষপাতী হয়েছে 'জঞ্জাল', 'আবর্জনা' প্রভৃতির উল্লেখে। যেমন ঃ

ক. তুমি কৃপা করি,
এনেছিলে আজন্মের সকল সম্বল
সে-জঞ্জাল কিনে নিয়ে যেতে

(মূর্তিপূজা/অর্কেস্ট্রা)

খ. তাই আজি তব স্মৃতি, মগ্নতরী জঞ্জালের মতো
সহে না আশার ভার, করে হায়, বিদ্রূপে বিব্রত।

(বিকলতা/অর্কেস্ট্রা)

গ. পশিনি তোমার মর্মে, নিজের গহনে
জমায়েছিলাম শুধু মিথ্যার জঞ্জাল।

(নাম/অর্কেস্ট্রা)

ঘ. করিব না পুঁজি
প্রেমের সমাধিস্তূপে মমত্বের জঘন্য জঞ্জাল।

(সর্বনাশ/অর্কেস্ট্রা)

ঙ. হে কাল হে মহাকাল ?
অতিক্রান্ত উৎসবের উচ্ছিষ্ট জঞ্জাল
পলাতক পৃথ্বীশের নগণ্য পাথেয়
প্রয়োজন তোমার তাতেও ?

(কাল/ক্রন্দসী)

চ. শুধুই জঞ্জালে তাই ভরিয়াছি প্রাণের পসরা ,
গায়ত্রী জপেছি, কিন্তু শোনা গেছে নিরর্থ নিনাদ ॥

(অকৃতজ্ঞ/ক্রন্দসী)

ছ. মনে হলো রন্ধ্রচারী মূষিকের মতো
শটিত জঞ্জালকণা কুড়ায়েছে এতকাল ধরে
কৃপণের ভাণ্ডারে ভাণ্ডারে ;

(সমাপ্তি/ক্রন্দসী)

'ক্রন্দসী' পর্যায়ে জীবনের অপচার-সম্বন্ধীয় এই চেতনা আরো তীব্রতা পেয়েছে এই জাতীয় রূপান্তরসাধনী (transformative) চিত্রকল্পে ঃ

শর্বরীর রুগ্ণ মুখ ভ'রে গেলে মারী গুটিকায়
ভাবিব না উৎসুক আমরা
আমাকে ও-পার থেকে আরাত্রিকে আহবান পাঠায় ;

(প্রত্যাখ্যান/ক্রন্দসী)

তৃতীয় দশক থেকেই সুধীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সমবয়স্কদের কাছে এই শতাব্দী বিষন্নতায় আক্রান্ত হয়েছে। অকিঞ্চিৎকর পুরুষকার এবং ইতিহাস ভবিতব্য প্রবল—এ বোধ থেকে জাত এই সব আত্মদর্শন কখনো কখনো প্রবাদবাক্যের মতো সূচিমুখ হয়ে উঠেছে। ব্যক্তির ট্র্যাজেডি এবং গ্লানি-বোধ সেখানে ব্যঙ্গরসে জারিত ঃ

মৌল আকৃতি মরমেই যাবে ম'রে।
জনশূন্যতা সদা মোরে ঘিরে রবে।
সামান্যাদের সোহাগ খরিদ ক'রে
চিরন্তনীর অভাব মিটাতে হবে।

(জাতিস্মর/ক্রন্দসী)

তবু এরই শিয়রে কোথাও স্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করছে ঝড়। একমাত্র ঝড়েই বুঝিবা মুক্তি। সে ঝড় কখনো ব্যক্তিগত প্রেম। সমুদ্রপারের ঝড়ে কল্লোলে তোলপাড়ে সেখানে মানসী মূর্তির কল্পনা। কখনো বা মৃত্যুরূপা প্রেয়সী ঃ

শুধু যবে অন্তিম নিশীথে
চারিভিতে
ফিরিবে বীভৎস নৃত্যে আজন্মের নিষ্ফলতা যত,
দ্বারের বাহিরে
ঝঞ্ঝার গর্জন-মত্ত অখণ্ড তিমিরে
বৈতরণী পুনর্বার ডাকিবে আমারে অবিরত,
(পুনর্জন্ম/অর্কেস্ট্রা)

আজিকে আমার চিত্তে পুঞ্জিত যে-উদ্বিগ্ন বিষাদ
ভবিতব্য ভারাতুর, স্তব্ধ মূক মেঘের সমান
কালবৈশাখীর ঝড়ে টুটিবে সে-সংহতির বাঁধ,
চপলা দরশ দিবে ; মুক্ত হবে অবরুদ্ধ দান ॥
(ভবিতব্য /অর্কেস্ট্রা)

কবির অন্তর্দ্বন্দ্ব ঝঞ্ঝাতেই মুক্তি খুঁজেছে সব সময় এমন নয়। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব উদ্বিগ্ন বিষাদ ঝঞ্ঝাকে প্রতিরোধ করতেও চেয়েছে ঃ

ক্ষুধাভরে
যেন না ভরাই বারংবার
বিরহ সন্তপ্ত এই শূন্যতা আমার
নব নব ঝঞ্ঝারে আহ্বানি। (প্রলাপ/অর্কেস্ট্রা)

আবার অন্যদিকে উদ্বিগ্ন বিষাদ কখনো কখনো স্মৃতির শান্তিবারি ও সান্ত্বনা ছেড়ে নব জীবনপথের সন্ধানী হয়েছে। 'উটপাখি' কবিতাটি এ প্রসঙ্গে অন্যতম উদাহরণ।

এই বিষাদ, গ্লানি, পরাভব অথচ জিজ্ঞাসার অপরাজেয় আবির্ভাবে সুধীন্দ্রনাথ বিশিষ্ট। 'তন্বী'-'অর্কেস্ট্রা' পর্যায়ে রীতির দিক থেকে তিনি রবীন্দ্রনাথের 'পূরবী'-র স্মারক। 'পূরবী'-র মতোই তাঁর কবিতাতেও এক মানসীর-স্মৃতির প্রাধান্য। কিন্তু 'পূরবী'-তে যা নেই তা হল প্রথম যুদ্ধোত্তর যুবকের ধূসরতা বোধ। সুধীন্দ্রনাথ—যুবক সুধীন্দ্রনাথ শুরুই করলেন এক প্রৌঢ় পরিণত অভিজ্ঞতার উপান্তে এসে। মালার্মের মতো জল-রঙে নয়, পোল ভালেরির মতো ভাস্কর্যপ্রতিম স্থিরতায় ও নিশ্চিতিতে তিনি এক আধুনিকের আর্তিকেই মূর্তিদান করলেন।

"মূল্যহীন সোনা হয় তব স্পর্শে, হে শব্দ অপ্সরী"। (বাক্য/ক্রন্দসী) সমালোচকই একা কবির জন্য বিশেষণ সংগ্রহ করেন। কবি নিজে করেন না।

তিনি শুধু খোঁজেন তাঁরই চৈতন্যের নিরঞ্জন স্বরূপকে। তাই কোনো কবি রোমান্টিক, কি সিম্বলিস্ট অথবা মডার্নিস্ট এ-মীমাংসার গুরুভার প্রায় তাঁদের কাঁধেই থাকে কাব্যের স্বর্গেও ধানভানা থেকে যাঁরা রেহাই পান না, নেন না। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার রহস্যমোচনে তাঁর জাতগোত্র বিচারকে প্রাধান্য দেওয়া বাহুল্য বলে মনে হয়। কারণ, এই বিচার ভঙ্গিমায় বাংলাদেশের কনে দেখার মতো নাক চোখ কান, হাতের পাতা, চলার ছাঁদ সব কিছুর বিচার হয় বটে, কিন্তু মেয়েটি কেমন এই প্রশ্নটি থাকে নিরুত্তর। এমন কি হয়তো শেষ অবধি মেয়েটির মুখও আর মনে থাকে না। তাই, মালার্মে ডেগাস্‌কে লেখা চিঠিতে যে শব্দাত্ম কবিলক্ষ্যের কথা বলেছেন সুধীন্দ্রনাথের আত্মাবলোকনেও এই লক্ষ্যেরই সাদৃস্য দেখে সুধীন্দ্রনাথকে সিম্বলিস্ট ভাবলে ভুল হবে। কেননা সিম্বলিস্টদের মতো সুধীন্দ্রনাথ প্রেরণায় বিশ্বাসী থাকতে চান নি। এদিক থেকে তাঁকে মডার্নিস্ট স্কুলেরই অন্তর্ভুক্ত ভাবা যায়। চিত্রকল্পের বৈপরীত্যে ও সহযোগিতায় কবিতার রসরূপ নির্মাণের যে প্রচেষ্টা সচেতন মমতায় তিনি দীর্ঘকাল লালন করেছেন তাও মডার্নিস্টদের সারূপ্যের স্মৃতিবহ। আবার তাঁকেই শব্দের আভিজাত্য রক্ষায় সতর্ক দেখে নতুন করে ছক পাততে হয়। এবং এই সমস্তের দ্বারা আর কিছু প্রমাণিত হয় না, প্রমাণিত হয় শুধু এই কথাটি, যে পাঁজি পুঁথি দেখে কোষ্ঠি বিচার চললেও কাব্য বিচার চলে না। বিশেষতঃ সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় যেভাবে শব্দ-শুদ্ধি, প্রতীকীভাষণ ও চিত্রকল্প-চারিতার সাযুজ্য রচনার চেষ্টা নিয়ত জাগ্রত ছিল তা সাধারণ কবিত্বে দুর্লভ বলেই সরল সংজ্ঞায় তাঁকে ধরা দুষ্কর।

(সুধীন্দ্রনাথের যে কোনো একটি কবিতা পড়লে সেটিকে আমরা গ্রহণ করব একটি প্রেমের কবিতার পরাকাষ্ঠা হিসেবে। যে কোনো দুটি কবিতা পড়লেই জানা যায় এগুলি যতখানি প্রেমের কবিতা তার চেয়ে বেশি, এগুলি এক প্রেমিকের কবিতা। তিনটি কবিতার পরেই বোঝা যায় যে, কবিতাগুলির ভিতরে এক সমগ্রার্থ-পরিকল্পনা কাজ করে চলেছে। সেই সমগ্রার্থ-পরিকল্পনা এবং কবিতাগুলির শব্দীয় কাঠামো কবির তপস্যাসম্ভব সিদ্ধিতে পরস্পর অন্বিত। যে প্রেমিকের প্রৌঢ়স্মৃতি এ কবিতা-গুলির রসোৎস, সেই প্রেমিকের চারিত্র-নির্মাণে এই শতকের দত্ত কবি কোনো আসক্তির পরিচয় দেননি। তাঁর কামনা ও কাম, আবেগ ও বাসনা, দৌর্বল্য ও পরাজয়কে নাট্যকারের নির্লিপ্ততেই ফুটিয়ে তুলেছেন। এই প্রেমিক-প্রৌঢ়—যার প্রৌঢ়তা অনেকাংশেই মনের প্রৌঢ়তা —কোনোদিনই এক বিদেশিনীর কেশের স্বর্ণাভাকে ভুলতে পারে নি।) ও শতকের দত্ত কবি হেব্‌সাই শহরের অনাত্মীয় প্রবাসিকতায় বারে বারে মনে

করেছেন কাব্য-সম্ভব স্বদেশিনীকে; (এ শতকের দত্ত-কবির সৃষ্ট চরিত্রের স্বদেশে-প্রবাসী-আত্মা ফিরে ফিরে মনে করেছে এক সিন্ধুপারের স্বর্ণ-কেশিনীকে। প্রেমিকের কাছে প্রেমই স্বভূমি, বাকি সব কিছুই প্রবাস। সেই প্রবাসের বেদনায় পীড়িত সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় সোনালি চুলের দুর্মর স্মৃতিই অন্তহীন দৈহিক আক্ষেপে আত্মিক যাতনায় গাঢ় হয়ে আকর্ষণ করেছে পিঙ্গল বালুকাময় মরুকল্পনাকে। অর্কেস্ট্রা থেকে দশমীর পূর্ব পর্যন্ত এই মরুকল্পনা সুধীন্দ্রনাথের কবিজীবনে এক স্থায়ী ভাববৃত্তের সৃষ্টি করেছে।) মরু, মরীচিকা, মরুদস্যু, ফণিমনসা, মরুঝড় প্রভৃতি মরুপ্রসঙ্গ তাঁর কবিতায় পুনরাবৃত্ত হয়েছে। অতৃপ্ত তৃষ্ণার এক নিগূঢ় টানে এই মরুচিত্রের ব্যবহার ধীরে ধীরে চিত্রকল্পের বিশিষ্ট ভাষায় পরিণত হয়ে পৌঁছেচে প্রতীকের স্বাধীনতায়।

তারই তরে
উৎসুক প্রত্যাশা মোর দিকে দিগন্তরে
নেহারে অস্থির মরীচিকা।

অথবা

অতঃপর শূন্য চক্রবালে
দূরত্যয় মরুকুঞ্জ নিরখিবে দুর্মর খেয়ালে।

কিংবা

নন্দনের প্রতিশ্রুতি মম
ফণিমনসায় ঘেরা উপহাস্য মরুমায়া সম।

এবং

কীর্তির সমাধিস্তূপ স্বত্বশূন্য মুক্ত মরুভূমি
যার 'পরে
অবৈধ প্রবৃত্তি মোর অবাধে বিচরে
অবলুপ্ত ধনরত্ন আশে

বা

মরুবাসী বর্বরের প্রায়
অনভ্যস্ত সুসময়ে লজ্জাবস্ত্র কাড়ি,
কুচকলি নিঙাড়ি নিঙাড়ি,
মিটায়েছিলাম তৃষ্ণা, সুধা ভেবে পর্যুষিত ক্লেদে।

আর

চেওনা চেওনা তবে ক্ষমা

নব বসন্তের প্রান্তে অশোকের উদ্বেল সুষমা
কখনও কি ক্ষমা মাগে বন্ধ্যা ফণিমনসার কাছে ?

দেখা যাবে যে সেই প্রেমিক-প্রৌঢ়ের মরুচেতনার জন্ম হয়েছে প্রতিহত প্রত্যাশার ঊষরতার কোলে। তারপরে ধীরে ধীরে সেই চেতনা নিজেই কবির অভিজ্ঞতার গূঢ় ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে। 'অশোকের উদ্বেল সুষমা' এবং 'বন্ধ্যা ফণিমনসা'-র বৈপরীত্যে তা নিঃসন্দেহে আবেগের নির্দিষ্ট এবং অভীষ্ট আধারে পরিণত। এবং পরিশেষে 'উটপাখি' কবিতায় মরু-চিত্রকল্পের সহায়তায় উটপাখির প্রতীক প্রাণ পেল। এখানেও উটপাখি এবং মরুভূমির দ্বান্দ্বিকতায় কবিতার রূপসিদ্ধি ঘটেছে। উটপাখি-তে দেখা গেল সুধীন্দ্রনাথের কবিতার নায়ক স্মৃতির মনস্তাপ থেকে মুক্তি চেয়েছেন। 'ফাটা ডিমে আর তা দিয়ে কি ফল পাবে'—দীর্ঘ লালিত অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তির ক্ষণানুপ্রেরণালব্ধ অন্তর্দৃষ্টির চকিত মিলনে ধন্য এ-পঙক্তি প্রায় প্রবচনের মর্যাদায় উন্নীত। শুধু তাই নয় খর বিদ্রূপের সঙ্গে গভীর জীবন-মমতার যুগ্ম উৎসেচনে পঙক্তিটির রসবৈচিত্র্য সম্পন্ন হয়েছে। এটাই গোটা কবিতার প্রতীকী বিন্যাসের এবং Thematic Frameworks-এর মূল কথা। এবং এই Thematic Frameworks-এর আলম্বনেই কবিতাটির প্রতীকী বিন্যাসও এক অ-সুধীন্দ্রীয় সজীবতা পেয়েছে, যা অন্যত্র সচরাচর দুর্লভ। 'উটপাখি' কবির নিজেরই আশ্রয়ার্থী বিপন্ন সৌন্দর্য সত্তার প্রতীক। যে 'আমি' বায়ুম্ম, সে বাস্তবের প্রাণবান স্রোতের প্রতীক। যে-মরু পরিহারের প্রেরণা তার কণ্ঠে, সে-মরু বন্ধ্যা অস্তিত্বের স্মারক। কবিতাটির শেষ দুই চরণে দ্বান্দ্বিক সমগ্রতার ভিতর দিয়ে কবিজীবনের অন্তহীনতার ইঙ্গিত ধ্বনিত হয়েছে। প্রসঙ্গত একটা কথা বলবার ঃ কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকের প্রথম দুই চরণে একটি দ্বিতীয় ঝঙ্কার অশ্রুত নেই। 'ফাটা ডিমে আর তা দিয়ে কি ফল পাবে/মনস্তাপেও লাগবে না ওতে জোড়া'—এই দুই চরণের বিদ্রূপের সংবৃত-বেদনা এ কবিতায় প্রাণবন্ত হতে পেরেছে কবিতাটির মূল প্রসঙ্গের জন্য। কিন্তু সেই প্রৌঢ়-প্রেমিক তার অচরিতার্থ প্রেমের স্মৃতির অপরিহার্য নিরর্থকতার কথা অন্য নানা কবিতায় ব্যবহার করতে করতে এই চরণ দুটির জন্য প্রস্তুত হয়েছিল।

যদিও 'উটপাখি'-তে মরু-কল্পনার সান্নিধ্যেই এমন সুসার্থক প্রতীক প্রয়োগ সম্ভব হল, তবুও মরু-প্রসঙ্গকে কবিতায় ব্যবহারের গূঢ়ার্থসঞ্চারী সুযোগ সুধীন্দ্রনাথ কখনো ছাড়েননি। প্রেমের স্মৃতি এবং প্রেমের অচরিতার্থ যন্ত্রণার মিশ্র সুরকে ধরতে গিয়েই সুধীন্দ্রনাথের মরু-কল্পনা 'প্রতিপদ' কবিতাটিতে এই কল্পনায় যে শৈল্পিক কাঠামো রচিত হয়েছে তার কাব্যসুষমা লক্ষণীয়।

'প্রতিপদ' কবিতাটির মূল বক্তব্য প্রথম দুই স্তবকে উপস্থাপিত হবার পর তৃতীয় ও চতুর্থ দুই স্তবকে বক্তব্য পূর্ণতা পেয়েছে। এই তৃতীয় ও চতুর্থ স্তবকে কবির চিত্রকল্পনা, বর্ণ-কল্পনা বা colour scheme, এবং শব্দ-বিন্যাস নিঃসন্দেহে পরস্পর সান্নিধ্যের মাধ্যমে বাচ্যাতিরিক্ত ব্যঞ্জনার রসবস্তুকে অখন্ড করে তুলেছে। প্রেমের তথা জীবনের প্রবঞ্চনাময় তৃপ্তি অপেক্ষা অতৃপ্তির অপ্রবঞ্চনা অনেক বেশি সত্যভাষী। স্তবক দুটির বিপরীত সহযোগিতা লক্ষ্যণীয় :

সুবর্তুল পুষ্করিণী পরিপূর্ণ কানায় কানায়
অচ্ছোদ সবুজ জলে, উচ্চকিত নবদূর্বাদলে
অবরুদ্ধপরিকর। চিত্রার্পিত মুকুরের তলে
দিগন্তের যুগ্মগিরি শোথসান্দ্র পীবরতা পায়
সূচ্যগ্র অণিমা টুটে। মায়াময় সে-ছায়ার কাছে
ভাসে এক মজ্জমান স্নাতকের শৈবালিত দেহ
হরিৎ হেলঞ্চে ঢাকা ; নিরন্তর কাকে যেন যাচে
অনিকেত চক্ষুদ্বয় ; সুতা-কান্তা-জননীর স্নেহ
অসপত্ন আচম্বিতে উৎকণ্ঠিত মুমূর্ষায় তার।—
পুরুজিৎ কুরুক্ষেত্রে উর্বশীর শেষ অভিসার ॥

শত শ্রেয় মরুভূমি—সম্মার্জিত সন্তপ্ত সিমুমে ;
বন্ধ্যা ফণিমনসায় কন্টকিত, বিষাক্ত, ধূসর ;
পরিত্যক্ত মীনরাজ্য, নিঃসলিল তরঙ্গে ঊষর ;
নিরিন্দ্রিয় মহাশূন্য, উদাসীন উদ্বায়ী মসূমে।
অতিকায় কৃকলাস অস্থিসার রুদ্র পরিপাকে ;
প্রপন্ন অজ্ঞাতবাসে পাশবিক পুরাণপুরুষ,
শিখরীর মন্ত্রগুপ্তি পঙ্গু করে মৃগতৃষ্ণিকাকে ;
উন্মুক্ত গগনে জাগে নিরঞ্জন নিত্য, নিরঙ্কুশ।
নির্বাণ সর্বতোভদ্র : প্রতিবেশী নীহারিকা যত
পলায় সংসর্গ ছেড়ে।—অকস্মাৎ ত্রিশঙ্কু স্বগত ॥

উদ্ধৃত স্তবক দুটির প্রথমটিতে সুবর্তুল পুষ্করিণীর অবরুদ্ধ পূর্ণতা, দ্বিতীয়টিতে নিঃসলিল তরঙ্গে ঊষর মরুভূমি। দ্বিতীয়টিতে প্রথমটির স্মৃতিতেই এক শারীরিক প্রতিক্রিয়া প্রায় অনুভূত হয়ে ওঠে—তৃষ্ণার অনুভূতি প্রবলতা প্রায়। যদিও সেই অনুভূতি ঐ জলের থেকে অনেক বেশি

সত্য। প্রথমটিতে সবুজ রঙের ব্যবহার ঘটেছে—সবুজ জলে, নব দূর্বাদলে, শৈবালিত দেহে, হরিৎ হেলঞে। পরবর্তী স্তবকে ব্যবহৃত হয়েছে ধূসর রঙ। প্রথমটিতে হাওয়া নেই, আছে মায়াময় ছায়া। পরবর্তী স্তবকে রয়েছে সন্তপ্ত সিমুম। 'সম্মার্জিত সন্তপ্ত সিমুমে' কেবল মরু-কল্পনার অনুষঙ্গ-বাহী মাত্র নয়, কবির হৃদয়ের গূঢ়ভাষার বিকল্প। উদ্ধৃত স্তবক দুটির প্রথমটিতে শৈবালিত-স্নাতক প্রতীকী অনন্যতার নিদর্শন। শৈবালিত দেহের প্রতীকে স্থূলে বর্তুল পরিপূর্ণতার মাঝে অপমৃত সত্তার কথা বলা হয়েছে। তার দুই চোখে হয়ত যা আর সে কখনো ফিরে পাবে না, তারই ব্যর্থ সন্ধানের অন্তিম ব্যগ্রতা। শেষবর্তী স্তবকে চরম এবং পরম নির্বাপণের পর ভস্মাবশেষ-বিহীন শূন্যতা। সেই চরম নির্বাণের অব্যবহিত পূর্বের দুটি অধ্যায় 'পরিত্যক্ত মীনরাজ্য' ও 'অতিকায় রুকলাস অস্থিসার রুদ্র পরিপাকে'। বিশ্বাসী কুতূহলে পাঠক যদি এর পরে আবিষ্কার করেন যে, উদ্ধৃত প্রথম স্তবকে 'ল' ব্যঞ্জনের সহায়তায় অর্ধস্ফুট জলধ্বনিকে সামান্য ব্যবহার করেই স্বেচ্ছায় নীরব করা হয়েছে তাহলে বেশি দোষ দেওয়া যাবে না। সে নীরবতায় ঐ অপমৃত্যুকেই সাবয়ব করে তোলা কবির লক্ষ্য ছিল।

আমরা আবার অচরিতার্থ প্রেমিকের কথাতেই ফিরে আসছি। রবীন্দ্রনাথের 'পূরবী' কাব্যের 'শেষ বসন্ত'-এ প্রেমিক চরিত্র-কল্পনায় চরিত্রটির বিষণ্ণ আত্মসংযম এবং আত্মসম্ভ্রম তাকে করেছে গভীরভাষী। এরই ফলে 'শেষ বসন্তে' বেদনা-প্রগলভ অত্যুক্তি নেই, আছে বেদনার রসধ্বনি। 'শেষ বসন্ত' কবিতায় 'ঝরাপাতা দ্রুত দ'লে' এবং 'নীড়ে ফেরা পাখি যবে/অস্ফুট কাকলি রবে/দিনান্তেরে ক্ষুব্ধ করি তোলে'—প্রভৃতি ব্যঞ্জনায় নায়কের দলিত বিশুষ্ক হৃদয় এবং প্রেমের আকাশ-হারানোর বেদনা প্রতিফলিত হয়েছে। 'ঝরাপাতা দ্রুত পায়ে দলে'—অসামান্য কবিকল্পনা। (সুধীন্দ্রনাথের নায়কও বিষণ্ণ স্মৃতিধর, কিন্তু আত্মসম্ভ্রমের যন্ত্রণা তারও। মরুকল্পনার অনুষঙ্গে সুধীন্দ্র-নাথের নায়কের নষ্টনীড় স্মৃতি বারে বারে ক্লান্তিতে পক্ষ-বিধূনন করেছে। সেই স্মৃতিই ধীরে ধীরে অর্জন করেছে পরিণত শুকের শুভ্র প্রজ্ঞা।)

এই মরু নাস্তি, বৈনাশিকতা ও শূন্যতার বিকল্প। সর্বহন্তারক যে-দস্যুরা এ নাস্তিকে সম্পূর্ণ করে সে-ই কাল। দস্যু, যবনবাহিনী, বর্বর, তস্করসেনা, বর্বর ডঙ্কা, ব্যাজজীবী, অর্ধপশু অর্ধেকমানব মরুদস্যু সুধীন্দ্র-নাথের কবিতায় অনিবার্য মরু-প্রসঙ্গ হিসেবেই দেখা দিয়েছে। ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতার উপর বর্বরবাহিনীর আত্যয়িক আক্রমণের ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক কাহিনী সকলেরই শ্রুত। তা আসলে কালের সর্বচিহ্নহর প্রহারের কাহিনী। (সুধীন্দ্র-

নাথের নায়কও জানেন যে মৃত্যু প্রকৃত শত্রু নয়, প্রকৃত শত্রু কাল। সে সব-কিছুকে লুপ্ত করে, স্মৃতিকেও। যে-নায়ক বিংশশতাব্দীর দ্বন্দ্বসংশয়ের মধ্যে যুবকত্বে পৌঁছেচে, সে-নায়ক লোকান্তরে বিশ্বাসী নয়; বিশ্বাসী নয় বুদ্ধত্বেও। নিঃশেষে নির্বাপনকেই সে অনিবার্য বলে জানে। সেই অন্ধকার অসংজ্ঞেয়, অনির্ণেয়; তা শুধু প্রকাণ্ড 'না'। কালই সেই নেতির স্রষ্টা। অথচ এ নেতিগর্ভে আত্মসমর্পণ নায়কের অভিপ্রেত ছিল না। তবু, তারই প্রতিমুখে দাঁড়িয়ে নায়কের সম্বিতের পরিধি নির্দিষ্ট হয়েছে। বেড়েছে তার অগ্নিবলয়ের দাহ-যন্ত্রণা। সুধীন্দ্রনাথ অন্যবর্ণের পরকলা প্রয়োগে এই দাহ-চিহ্নের বর্ণান্তর ঘটাতে চান নি। প্রেমে অচরিতার্থ নায়কের ভাব কল্পনার রূপকে আধুনিক মানুষের উদ্বাস্তু নিঃসঙ্গ চেতনার নিরাসক্ত রূপায়ণই শেষপর্যন্ত কবির লক্ষ্য ছিল।)

(এই লক্ষ্য ক্রমশ কবিকল্পনায় স্পষ্টতা লাভ করেছে। অন্ধকার বা অমা সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রথম থেকে ধীরে ধীরে অটল আধিপত্য মেলেছে। সমগ্র কবি-জীবনে তার তাৎপর্যের ক্রমগভীরতা-অর্জন সচেতন পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না:)

ক. তাই মোর প্রাণ
স্মৃতিশূন্য অন্ধকারে খুঁজে মরে নিশ্চিহ্ন নির্বাণ।
(দৈন্য / অর্কেস্ট্রা)

খ. ব্যাপ্ত মোর চতুর্দিকে অনন্ত অমার পটভূমি;
সবই সেথা বিভীষিকা, এমন-কি বিভীষিকা তুমি ।।
(নরক / ক্রন্দসী)

গ. বিগত রশ্মির প্রেতে কণ্টকিত অসম্ভৃত অমা।
(ভগ্না / দশমী)

দেখা যাচ্ছে যা ছিল শুধু 'অনন্ত অমার পটভূমি' তা-ই ধীরে ধীরে হয়ে উঠল 'অসম্ভৃত অমা'! 'অনন্ত অমার পটভূমি' কারণ-সম্ভৃত। অনন্ত সে-অমাদৃষ্টির পিছনে নায়কের ব্যক্তিজীবনের কোনো অধ্যায় নিশ্চয় ছায়া ফেলেছে। কিন্তু 'অসম্ভৃত অমা' একদিকে চিত্রকল্পের অংশ, অন্যদিকে 'অসম্ভৃত' শব্দ-সংযোগে গভীর ও বিস্তৃততর ব্যঞ্জনার স্রষ্টা। 'অসম্ভৃত অমা' মানুষের অন্তর্বর্তী অনপনেয় নৈঃসঙ্গ্যের চেতনাকে মূর্ত করেছে। অসম্ভৃত বলেই তা অনপনেয়। সে-অমা অবচেতনের পাতাল থেকে উঠে আসে। আচ্ছন্ন করে ফেলতে চায় ব্যক্তির সমগ্র সত্তাকে। 'অসম্পাদ্য বিকারে' যে [illegible]াকারত্বের চেতনা, তা এই অমা-কল্পনারই উল্টোপিঠ।(চেতনার এই

নির্দিষ্ট অনুভূতি ছিল বলেই এক ক্রমলব্ধ অনুদ্বেজিত অক্ষোভ সুধীন্দ্রনাথের নায়ককে কালোচিত মর্যাদা দিয়েছে।) এই অনুদ্বেজিত অক্ষোভের সম্বলে 'দশমী'-র কবিতাগুলি রস-প্রকর্ষের পরম পর্যায়।

'দশমী' শব্দের অর্থ পুরুষের কামজ দশাবস্থার শেষ অবস্থা। সাধারণ অর্থে তা মৃত্যুকেই বোঝায় বটে, সুধীন্দ্রনাথের কাব্যের নায়ক এখান থেকেই পেয়েছে নবজন্মের ইঙ্গিত। পাতী অরণ্যে যার পদপাত শোনা যাচ্ছে সে অন্ধকার নির্বাণ নয়, নিজেরই বিশুদ্ধ সম্বিতের জন্য কবির প্রতীক্ষা সেই পদধ্বনির প্রকৃত শ্রোতা। প্রত্যেক কবিকেই কবিজীবনের পরিণত পর্যায়ে তার নিজেরই মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। নিজের লালিতসত্তার অনেক কিছু বর্জনের ও গ্রহণের মাধ্যমে তাঁকে আবার নতুন পথের শক্তি সঞ্চয় করতে হয়। সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় শব্দীয় কাঠামোয় রবীন্দ্রনাথের ছায়া দীর্ঘদিন ধরে বিরাজ করেছে—আর তাঁর সমগ্রার্থ-পরিকল্পনায় বিরাজ করেছে আধুনিক মানুষের বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা। সুধীন্দ্রনাথের কবিতার বহু প্রশংসিত গুণ সুসম যথাযথতা রক্ষিত হয়েছে ঐ শব্দীয় কাঠামো ও সমগ্রার্থ-কল্পনার আপাত বৈপরীত্যের আধারে। নিজ বক্তব্যের নির্দিষ্টতার জন্য সুধীন্দ্রনাথের শব্দ ও রূপকল্পে রবীন্দ্র-স্মৃতি অন্যার্থ বাচকতা লাভ করেছে।

যে অতীত চুপে চুপে আয়ুটুকু কাটায়ে ভুবনে
অকীর্তির অন্তরালে অবশেষে লভিছে বিশ্রাম,
নগণ্য দুষ্কৃতি যার, অবজ্ঞেয়, নশ্বর দুর্নাম
ঐতিহ্যের স্মৃতিস্তম্ভে কোনও কালে নাহি হবে লেখা
গভীর অক্ষরে, তারই নিভৃত পদের ভগ্নরেখা
শুধু মোর হৃদয়ের ক্রমশুষ্ক ফলকে গোপন
হয়ে রবে সদাপূজ্য, হয়ে রবে চির চিরন্তন ॥

এই বাক্‌রীতি রাবীন্দ্রিক, এর সঙ্গে বিদ্রোহের ভঙ্গিমা মিশলে এ মোহিতলালের কাব্যসংস্কার থেকে দূরবর্তী হত না—ক্লাসিক রূপবিভঙ্গের আশ্রয়ে সে-সান্নিধ্য আরো প্রকট হত। শুধু পার্থক্য এসেছে সুধীন্দ্রনাথের বক্তব্যের আধুনিক শতাব্দী-সম্ভব নৈঃসঙ্গ্য-চেতনার কারণে। মোহিতলাল অবশ্যই 'চির চিরন্তন' লিখতেন না, যেমন রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'র পরে ঃ

কে জানিত পাঁচটি বৎসর
কালগ্রাসী বিধাতার অলক্ষিত তুচ্ছ অবসর
প্রহরাপীড়িত আঁখি একবার পালটি লবার।

(বর্ষপঞ্চক / ক্রন্দসী)

এই 'পালটি লবার'-এর মতো শিথিল ক্রিয়া ব্যবহার অসম্ভব বলে পরিগণিত হওয়াই উচিত ছিল।

হেমন্তের উর্ধ্বশ্বাস সাঁঝে
উদ্বাস্তু কালের পায়ে ঝিল্লীর মঞ্জীর যবে বাজে
আচ্ছন্ন মাঠের প্রান্তে, পরিব্যাপ্ত মৃত্যুর ছায়ায়
আগন্তুক তমস্বিনী আপনারে আঁচরে হারায়,
নিস্তৈল দীপের মতো মানুষের নিরাশ্রয় মন
আছাড়ি-বিছাড়ি নেবে,

(ব্যবধান / উত্তর ফাল্গুনী)

এখানে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট চিত্রযোজনা পদ্ধতির অনুসরণ অবশ্যই নজরে পড়ে। কিন্তু সমগ্র বক্তব্যের প্রসঙ্গাঘাতে সুধীন্দ্রনাথ সে চিত্রের প্রতিক্রিয়াকেও নিজস্ব তাৎপর্যে ব্যবহার করেন। নির্বাচিত একক শব্দগুলি অতীতের অনুষঙ্গবাহী—'মঞ্জীর' ও 'তমস্বিনী' তার নিদর্শন। প্রত্যেক বিশেষ শব্দই এক একটি বিশেষ যুগের প্রতিনিধি। এক একটি বিশেষ মানসাবস্থার দান। অসম্পূর্ণ, অসমাপ্ত, অনির্বচনীয় বাংলা সাহিত্যে যে কোনো কবি পূর্বেও ব্যবহার করেছেন, পরেও করবেন—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ব্যবহারের পরে এগুলির প্রয়োগে—মন্ত্রের টানে আকর্ষিত দেবীর মতো রবীন্দ্র মানসীরাই মূর্ত হবেন। সুধীন্দ্রনাথও তাই চেয়েছিলেন। তাঁর নায়ক সেই স্থির সৌন্দর্যের আলোকে আত্মনিবেদন করবে বলে নয়—সেই আলোকের পটভূমিতে নিজের অন্ধকারের গাঢ়ত্বের বৈপরীত্য ফুটবে ভাল বলে। তাই অতীতের অনুষঙ্গবাহী শব্দগুলিকে উদ্ভাবিত বিশেষণে সুধীন্দ্রনাথ ঈপ্সিত তাৎপর্য দিয়েছেন। 'উর্ধ্বশ্বাস' 'উদ্বাস্তু' তার নিদর্শন। আর এ যে শুধুই জোড়াতালির খেয়ালী লীলা নয় তা বোঝা গেল 'নিস্তৈল দীপের' শেষ নির্বাপণের চিত্রে।

তথাপি এই শাব্দিক বিন্যাস সব সময়ে লক্ষ্যভেদী হয়নি। এমন কি মাঝে মাঝে তা কবির প্রতীককেও আচ্ছন্ন করেছে। 'সিনেমায়' কবিতার সেই 'সদ্যশুদ্ধ সর্বলজ্জাভার বয়স্থ বিশাল বপু'—কাহিনীর চরিত্র হয়েই থাকল। এমন কি স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত শব্দের হিসেবী মিশেলে অংশটিতে যে অনড়তা এসেছে তাও কাহিনীরসের সহায়ক রূপেই দেখা দিল। এ যেন সেই পৃথুলাঙ্গীরই স্থূল নির্জীবতার বাণীমূর্তি। কিন্তু যে স্থূল বাস্তবের প্রতিরোধে আমাদের স্বপ্ন হারিয়ে যায় এ তার প্রতীক হল না। বড় জোর রূপকার্থের ব্যঞ্জনা এল। ঠিক এমনই শাশ্বতী কবিতায় দ্বিতীয় স্তবকে :

সেদিনও এমনই ফসলবিলাসী হাওয়া
মেতেছিল তার চিকুরের পাকা ধানে ;

এখানে চিকুর শব্দের সঙ্গে পাকা শব্দের সংযোগে যে স্মৃতি অনিবার্য হয়ে ওঠে তা কবির লক্ষ্য নয়। স্তবকটির প্রথম চরণে 'বাদল শেষের রাতে' এবং ছয়ের পঙক্তিতে পাকাধানে নিঃসন্দেহে একটি উদ্দিষ্ট বর্ণ-পরিকল্পনা কাজ করছে। কিন্তু চিকুর এবং পাকার সহাবস্থান বাঙালির শব্দসংস্কারের পক্ষে দুরতিক্রম্য।

'দশমী' কাব্যগ্রন্থে সুধীন্দ্রনাথ এই সামান্য, সমালোচক-ভোগ্য ত্রুটিরও কোনো অবকাশ রাখেন নি। প্রথম থেকে শেষ কবিতা পর্যন্ত আয়ত এক প্রশান্তি কবিতাগুলির গূঢ় আত্মদর্শনের নিদর্শন—সে আত্মদর্শন একদিকে যেমন অভিজ্ঞতার ফল, অপরদিকে তেমনি মননের দান। শেষ কবিতা 'নষ্টনীড়' 'দশমী' কাব্যগ্রন্থের সমস্ত বক্তব্যের যোগফল। (কাব্যের সেই প্রেমিক নায়ক এখানে বিরহীশুক—অভিজ্ঞতা তাকে প্রজ্ঞা দিয়েছে। জীবনের কৃষ্ণচূড়ার কাছে আশ্রয় যাচঞা তার ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতাই কি সব ? কালের অপ্রতিরোধ্য আক্রমণে জীবন এবং প্রেম দুই পরম নাস্তিতে মিলিয়ে যাবে। সেই শূন্যতার তাড়নায় কৃষ্ণচূড়া রঙ হারায়, শুক ওড়ে।) অবচেতন থেকে উদ্ভূত নৈঃসঙ্গ্যের অন্ধকার তাকে গ্রাস করতে চায়—দ্রাঘিমা দেয় ক্ষমা—দ্রাঘিমার যেখানে ক্ষান্তি সেখানে মেরু তুষার। কিন্তু জ্যোতির জন্য সাধনা তো প্রকৃতির বুকে দুর্মর, তাহলে শুক ব্যর্থ হবে কেন ? অন্ধকার তাকে আচ্ছন্ন করে কেন ?

(এইখানে নিজ কবিজীবনে নব-পর্যায়ের ইঙ্গিত দিয়ে সুধীন্দ্রনাথের কবিজীবন ব্যক্তিগতভাবে শেষ হয়েছে।)

'কবিত্বের অদ্বিতীয় ব্রত'—বুদ্ধদেব বসু

সুধীন্দ্রনাথ বললেই যেমন অনিবার্য মনে পড়ে 'উটপাখি', জীবনানন্দের সঙ্গেই যে ভাবে গ্রথিত হয়ে আছে 'বনলতা সেন' বা 'আট বছর আগের একদিন', বিষ্ণু দে বলতেই যেমন 'ঘোড়সওয়ার' সাধারণ পাঠকের কাছে হয়ে ওঠে উত্তাল—ঠিক সে রকম কোনো একক কবিতাকে বুদ্ধদেব বসুর প্রতিনিধি বলা যায় কিনা—'বন্দীর বন্দনা' বা 'দময়ন্তী' স্মরণে রেখেই বলছি—সন্দেহ। আবার সুধীন্দ্রনাথের মতো বাণী বিন্যাস, অমিয় চক্রবর্তীর মতো নবছন্দ বুদ্ধদেব আয়ত্ত করার জন্য আগ্রহী ছিলেন না। এবং আরো দেখি সুধীন্দ্রনাথের ছন্ম-বিবিক্ততার গুরুভার তাঁকে বিশেষ আকৃষ্ট করেনি, বিষ্ণু দে-র মণীষা-দীপ্ত বিশ্ব-সংস্কৃতি পর্যটনের সঙ্গে তাঁর পরিক্রমার কোনো মিল হল না, জীবনানন্দের আত্মনিমগ্নতা কখনো কখনো তাঁকে ছুঁয়েছে বটে, কিন্তু কোনো পরাবাস্তবের গহনে তিনি ডুব দেন নি। শ্রদ্ধার সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন যদিও অমিয় চক্রবর্তীর উত্তরাধিকৃত ও অর্জিত আস্তিক্য, কিন্তু তিনি তাতে দীক্ষা নেননি। এক বিনম্র আত্মস্থতা তাঁর চরিত্রের এবং কবিত্বের অভিজ্ঞান। তাঁর ব্যক্তিত্বেরও।

তাঁর শৈশব এবং কৈশোর যৌবনের যে স্মৃতিকথা তিনি লিখে রেখে গেলেন,[১] তা এখন তাঁর কবিতার কারণেও আমাদের কাছে মূল্যবান। যে বিনম্র আত্মস্থ ব্যক্তিত্বের আভা তাঁর সব রকমের লেখায় ছড়িয়ে রয়েছে, সেই ব্যক্তিত্বের 'হয়ে ওঠা'-র ইতিহাস এখন আমাদের কাছে দুঃসন্ধেয় নয়। একটি বা দুটি উজ্জ্বল এবং অনুজ্জ্বল মফস্বল শহর, সেখানকার পরিচিত পরিজন-মণ্ডলীর কবোষ্ণ পরিবেশ, মাতামহীর দ্বিগুণিত স্নেহ ইত্যাদির মাঝখানেই এই শিশু আস্তে আস্তে উচ্চারণ করতে বা সাড়া দিতে শিখেছিল। সে যখন সবে-যুবক, তখনই বাংলা কবিতার আকাশে নতুন বিহঙ্গ-কুলের পাখা ঝাপটানি শোনা যাচ্ছে। নজরুল লিখছেন 'নিশি ভোর হল জাগিয়া পরাণ পিয়া' তাঁরই চোখের সামনে হারমোনিয়াম বাজাতে বাজাতে। 'প্রগতি'-র জন্য তিনি লিখছেন কিছু সনেট, কিছু 'তানকা'। তিনি বলছেন, 'লিখে সুখ পাই, পরে সেগুলো বিশ্রী লাগলেও দমে যাই না, কেননা আমার অনবরতই লেখা আসছে'। নিজেরই প্রতিষ্ঠিত এক সাহিত্য-রাজ্যের কেন্দ্রবর্তী ছিলেন তিনি। অনুচ্চ, অনুগ্র অথচ অবিচল বুদ্ধদেব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈদগ্ধ্য-মন্থর-

১ আমার যৌবন। বুদ্ধদেব বসু।

পরিবেশে শিক্ষিত হলেন আর দীক্ষিত হলেন বোধহয় আদিত্যর দোকানে ; টুনু অমল পরিমলের সঙ্গে মুক্ত মেলায়—দূরের ক্লাশঘরে কবিকঙ্কণ পড়ানো হচ্ছে তখন। লিখে সুখ পাওয়া মানেই তো নিজেকে আবিষ্কার করা। কিন্তু 'লিখে সুখ পাই' এই সহজ সরল কথাটি দেখতে দেখতে কত জটিল হয়ে গেল। সুখ হয়ে গেল বেদনার অন্যনাম। বেদনা সুখেরই মত বরণীয়। 'ভাল—কিন্তু বল দেখি, হতে হবে আর কতকাল। একাধারে দ্রাক্ষাপুঞ্জ বকযন্ত্র শুঁড়ি ও মাতাল। ('নেশা' / যে আঁধার আলোর অধিক)—এ আর যে লিখে সুখ পায় তার কথা নয়, লেখা যার ভবিতব্য, সে ভবিতব্যের হাত থেকে যার ছাড়ান নেই, এ তার কথা।

এই ভবিতব্যই তাঁকে নিয়ে এল কলকাতায়, 'যেখানে বহু ভিন্ন ভিন্ন স্রোতে বিকীর্ণ হচ্ছে মানুষের উদ্যম, রাস্তার ভিড়ে অনামী ভাবে মিশে যাওয়া যায়, জীবনের স্রোত প্রখর, এবং যেখানে সাহিত্যিকও তার মনোমত সংস্রব বেছে নিতে পারে।'[১] আমরা স্মরণ করতে পারি কলকাতার উদ্দেশ্যে লেখা তাঁর দীর্ঘ কবিতা। মিলহীন অথচ নিয়মিত স্তবকবন্ধে লিখিত এই কবিতাটি আধুনিক কবির কলকাতা-বিষয়ক সর্বোত্তম কবিতা, বোধ হয় একমাত্র কবিতাও বটে। বুদ্ধদেব বসুর কলকাতা-প্রাণতার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া যাবে অবশ্য নভেল-গুলিতে, বিশেষ এ শাখায় তাঁর সেরা ফল 'তিথিডোর'-এ। তাই, যে জোনাকি 'দময়ন্তী' কাব্যে, কলকাতায় অপ্রস্তুত বোধ করেছিল, সে জোনাকি বুদ্ধদেবের নোয়াখালি-ঢাকার বিদায়ী দিনগুলির স্মৃতি, কচিৎ কখনো রাত্রে পথের ভুলে দেখা দেবে, কিন্তু স্থায়ী হবে না। এই কলকাতা তাঁকে দিয়েছিল জীবিকা, সেই সূত্রে ক্লিষ্ট ও তাপিত হবার মতো নানা ঘটনা, কিন্তু সেই সূত্রেই তাঁর চলিষ্ণুতাকে রাখল অব্যাহত। তাই তিনি ক্লিষ্ট হলেও ক্লান্ত হন নি। খাঁটি পূর্ববঙ্গীয় দৃঢ়তায় নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন সাহিত্যের বিভিন্ন উদ্যোগে। তাঁর জীবনস্মৃতির সাক্ষ্যে বলতে পারি, এই উদ্যম আর জিজীবিষা তখন তাঁর কাছে ছিল অচ্ছেদ্য। কলকাতা তাঁকে দাক্ষিণ্য জানিয়ে অবমাননা করে নি, তাঁকে জিতে নিতে হয়েছে কলকাতাকে, এবং কবিতাকেও।

এবং, এই কলকাতা তাঁকে দিয়েছিল প্রেম। রাণু সোম-বুদ্ধদেব-কথার মধ্যপর্বেই কবিতায় বুদ্ধদেব রূপান্তর পেলেন। সে রূপান্তর ঘটেছে ঐ প্রেমেরই আলোকে। 'বন্দীর বন্দনা' ও 'কঙ্কাবতী' ছিল প্রেমের কবিতা ; আর এই অভিজ্ঞতার অভিঘাতে অতঃপর তাঁর কবিতা হল প্রেমিকের কবিতা। 'বন্দীর বন্দনা'য় ছিল প্রেমের ঘোষণা, 'কঙ্কাবতী' তে সম্ভাষণ—প্রত্যক্ষের

১ তদেব।

আলোয় উচ্চারিত হল অতঃপর স্বগত সংলাপ। 'দময়ন্তী' যখন লেখা হল তখন তিনি পৌঁছে গেছেন তাঁর রোহভূমিতে। জীবনানন্দের হৈমন্তী প্রকৃতি বুদ্ধদেবের নয়, বিষ্ণু দে-র যেমন দেশে কালে বিস্তৃত মানুষের সর্বৈব সম্পদ বিপদকে নিয়ে কবিতা, তাও বুদ্ধদেবের নয়। তাঁর সারা জীবনের কবিতার বিষয় কবিতা এবং প্রেম। কিন্তু 'কঙ্কাবতী'-র পরে, যে মানসিক অভিজ্ঞতার উল্লেখ এখনি করা হল, তার টানে আপাতত, শুধু আপাতত, প্রেমই হল মুখ্য।

নতুন সুর এসেছে জীবনে
রক্ত জ্বলছে আমার দুহাতে, লাল আগুনের মতো
কেন না তুমি তাদের স্পর্শ করেছ।

এতে কঙ্কাবতীর সেই জলে স্থলে মত্ত তোলপাড় নেই, যথাসম্ভব মেদ বর্জন করে প্রতিটি পঙ্‌ক্তি গতিময়। বলবার চালই পাল্টে গেল। ছন্দের হিল্লোল অপেক্ষা উপলব্ধির নিবিষ্ট উচ্চারণ আরো বেশি প্রত্যয়ী হয়ে উঠেছে। 'কঙ্কাবতী'-র 'শেষের রাত্রি' কবিতায় যে জগৎ অনুভূত হয়, সে জগৎ প্রত্যক্ষের জগৎ নয়। সে এক যুবকের রোমান্টিক স্বপ্নের জগৎ। 'আদিম রাতের বেণীতে জড়ানো মরণের মতো এ আঁকাবাঁকা', কখনো স্মরণ করায় গত শতাব্দীর রোমান্টিক কবিদের বর্ণনা ভঙ্গিমা, কখনো বা প্রির‍্যাফেলাইট চিত্ররীতির স্মারক। সন্দেহ থাকে না সে চিত্ররীতির প্রেরণায়, যখন পড়ি—'রাতের আঁধারে সাপের মতন আঁকাবাঁকা কত কুটিল শাখা'। স্পর্শ এবং অনুভবগম্য এক অন্ধকারকে লক্ষ করে এই কবিতার স্তবকে স্তবকে সংগৃহীত হয়েছে, কিংবা বলা ভাল, আবির্ভূত হয়েছে নানা মন্ময়তাধর্মী উপমান। ফলে চিত্রকল্পগুলি একই কল্পনাকে ঘিরে নতুন নতুন ভাবানুষঙ্গের সৃষ্টি করেছে :

ক. তোমারি চুলের মতো ঘন কালো অন্ধকার
খ. আমারি প্রেমের মতন গহন অন্ধকার
গ. তোমারি চুলের বন্যার মতো অন্ধকার
ঘ. কোটি-কোটি মৃত সূর্যের মতো অন্ধকার

সমস্ত বক্তব্যটি এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেও যে, কবিতাটির 'মুভমেন্টে' কোনো ন্যূনতা ঘটায় নি, এই চিত্রকল্প-পুঞ্জের ক্রমবর্ধমান অর্থময় পারম্পর্য তার কারণ। কবিতাটির প্রতি স্তবকে দুটি অংশ। প্রথমাংশটি যতদূর সম্ভব কল্পনার চূড়ান্ত সীমাকে স্পর্শ করতে চায়, বুঝিবা ছাড়িয়ে যেতেও চায়। প্রথমাংশে কখনো বা জীবনের ধূসরতা সম্বন্ধে সচেতন কবি চুল আর মরণকে একাকার করে ফেলেন। 'বন্দীর বন্দনা'-য় কবি যে কটু বাস্তবতার

মাঝখানে নিরাময় খুঁজেছিলেন প্রেমে, 'কঙ্কাবতী'-র প্রেমের কবিতাতেও তারই অনুবর্তন। শুধু প্রভেদটা এই, 'বন্দীর বন্দনা'-য় কুদর্য বাস্তব সম্বন্ধে কবির সদ্যোজাত চেতনা আরো প্রখর ছিল। প্রেম সেখানে ঐ কদর্য বাস্তবের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহের পতাকা। 'কঙ্কাবতী'-তে বিদ্রোহ নেই। ততদিনে তিনি বুঝে গেছেন যে, প্রেমেই তিনি আশ্রিত। 'শেষের রাত্রি' কবিতার প্রতিটি স্তবকের বন্ধনী-যুক্ত দ্বিতীয়াংশে কঙ্কা-সম্ভাষণকে কঙ্কার প্রতি আহবানে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এই দ্বিতীয়াংশে বারে বারে কঙ্কাকে আহবান করা হয়েছে সীমানাহীন সময়ের মাঝখানে। আমরা লক্ষ না করে পারি না যে, এ-কবিতায় পুনরাবৃত্ত হয়েছে সময়কে অতিক্রমণের সংকল্প। যেখান থেকেই একথা আসুক, এ সংকল্পের ভারতীয় দেশকালগত তাৎপর্যটি ভুল করার নয়। যখন কবিতাটি কবির কাছে এসেছে তখন মন্দা-মন্থর সময়স্রোত, বন্ধ্য চতুষ্পার্শ্ব ছিল এক শ্বাসরোধী দুর্বহ অনড়তার উপমেয়। সময়ের হাতেই ক্ষয়—এই বোধ তখন তীব্রতা পেয়েছে নানাভাবে। কাজেই 'সময়কে ছাড়িয়ে যেতে হবে' তখনই প্রাসঙ্গিক, যখন সময়ের হাত ছাড়ানো বড়ো কঠিন। 'শেষের রাত্রি' কবিতার বন্ধনীযুক্ত স্তবকাংশগুলিতে বারে বারে উচ্চারিত হয়েছে ঃ

ক. এসো, চ'লে এসো ; সেখানে সময় সীমানাহীন
হঠাৎ-ব্যথায় নয় দ্বিখণ্ড রাত্রি দিন ;
সেখানে মোদের প্রেমের সময় সময়হীন,
কঙ্কা, শঙ্কা কোরো না।

খ. ঝড় তুলে দাও, জাগাও হাওয়ার ভরা জোয়ার,
পৃথিবী ছাড়ায়ে, সময় মাড়ায়ে যাবো এবার,

গ. কোটি-কোটি মৃত সূর্যের মত্তো অন্ধকার
তোমার আমার সময়-ছিন্ন বিরহ-ভার ;

ঘ. সময়-ছিন্ন বিরহে কাঁপে না রাত্রি দিন।

প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর বিশ্বব্যাপী মন্দা ও ক্ষয়ংকর মন্দ মন্থর কালস্রোতে কবি বুদ্ধদেব প্রেমকেই কালের প্রতিযোগী, প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ধরেছেন। ভাবতে ইচ্ছা করে, অমিত রায়ের অতি রোমান্টিকতা আর একটু কালের দিক থেকে অগ্রসর হলে সে কি সময়ের সঙ্গে এমন প্রতিদ্বন্দ্বে মেতে উঠত ?

অন্যদিকে 'সাপ', 'কুটিল শাখা', 'আঁকা বাকা', 'বেণী', 'বিদ্যুৎ' প্রভৃতি শব্দ বারে বারে প্রশ্রয় পেয়েছে এক রোমান্টিক মৃত্যু-কল্পনার কাছে—যেখানে প্রেমজ দেহমিলন ও মৃত্যু একার্থক। অথচ কী আশ্চর্য, সেই পুনরুক্তিময়, উপভোগ্য

কিন্তু চিত্রল পল্লবতা কেমন সংবৃত, সংযত, সংহত হয়ে গেল রাণুসোম-বুদ্ধদেব পর্যায়ে পর্যাপ্ত হয়ে। তিনি হয়তো তখন আর বলবেন না, 'ঝড় তুলে দাও জাগাও হাওয়ার ভরা জোয়ার', তার বদলে বললেন :

জোয়ার! জোয়ার!
উদ্দীপ্ত, উৎসুক বসন্তের মতো,
বসন্তের গাছের মধ্যে সবুজ সতেজ প্রাণরসের উৎসাহের মতো
জোয়ার! জোয়ার!

এই উৎসুক বসন্তের দান 'নতুন পাতা'। কিন্তু বুদ্ধদেব যে, তখনও কাটাতে চাইছেন না অতিকথনের জের, 'নতুন পাতা'-র নানা পুঞ্জিত মুঞ্জরণের মধ্যে তার নিদর্শন থেকে গেল। আমরা স্মরণ করতে পারি 'নিজের কবিতার প্রতি' কবিতাটিকে। তবে 'কঙ্কাবতী'-তেও যেমন 'সেরিনাড' বা 'কবিতা' বা 'শেষের রাত্রি'-র পাশে পাশে 'আমন্ত্রণ রমাকে', 'কোনো মেয়ের প্রতি' ইত্যাদি কবিতার প্রশান্ত বিনম্র সুর-স্বর এক বিপরীত (সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সঙ্গে দ্বিমত হয়েই বলছি)[৩] অথচ আরো গূঢ় এবং গাঢ় ভাব-পরিবেশ ফুটিয়ে তুলেছে, তেমনি 'নতুন পাতা'-তেও উচ্চকিত করে তোলা কবিতাগুলির চেয়ে অনেক বেশি অন্তরঙ্গ হতে পারল 'শেষ অঙ্গীকার'-এর মতো মিত ঋজু ভাষণ। এ সব কবিতাতেই তাঁর ব্যক্তিসত্তা নানা অর্জিত এবং আরোপিত বহিরাবরণ থেকে মুক্ত হতে পেরেছে। তাঁর আত্মনিষ্ক্রমণের পালা এভাবেই প্রতিষ্ঠা পেল 'দময়ন্তী'-অধ্যায়ে।

'দময়ন্তী'-তে বুদ্ধদেব সব থেকে চঞ্চল। বলবার কথা নিয়ে চঞ্চল, বলার ভঙ্গি নিয়ে চঞ্চল। যাকে আধুনিক বাগ্‌বিন্যাসে 'বাস্তবতা' বলা হয়, সেই বাস্তবতা নিয়ে চঞ্চল। জীবনের প্রসার ঘটেছে, দেহে মনে প্রত্যক্ষের জল হাওয়ার ছাপ পড়েছে। প্রাণপণে তিনি বলেও ফেললেন :

বুদ্ধিজীবী রুদ্ধঘরে সঙ্গীহীন
আত্মরতির সম্মোহনে কাটায় দিন।
পাষাণ-কালো আকাশে আলো কখন কাঁপে ?

'আশার লাল মশাল'-এর মতো ক্লিশে-তেও তাঁর আপত্তি হল না। তথাপি আমরা আনন্দিত হই সুধীন্দ্রনাথ-প্রশংসিত কবির সাবলীলতার আরেক মাত্রায়।[৪] 'দময়ন্তী'-তে তিনি যেন কিছুটা চেষ্টাকৃত আধুনিকতার পোশাক পরতে

৩. তিনজন আধুনিক কবি, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, পূর্বাশা—১৩৫১
৪. কুলায় ও কালপুরুষ, উক্তি ও উপলব্ধি, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

চাইছেন, তিনি যেন ব্যস্ত যে-ব্যাপকতা তাঁর অধিষ্ঠান-ভূমি নয়, সেই ব্যাপকতার সন্ধানে, যে-সামাজিক ব্যঙ্গ বোধ হয় তাঁকে মানায় না তাকেই তিনি কখনো কখনো আশ্রয় করতে চাইছেন, এ সন্দেহ হলেও—আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করলাম 'দময়ন্তী'-তে বুদ্ধদেবের পরিবর্তন পরিণামী হয়ে উঠতে চাইছে। 'দময়ন্তী'-তে বড়ো কবিতার পাশাপাশি আশ্চর্য সব ছোট কবিতা আছে। বড়ো কবিতার প্রতি তাঁর বরাবরের পক্ষপাত 'দময়ন্তী'-তে যেন খণ্ডিত। 'ইলিশ', 'কুকুর', 'ব্যাং', 'দুপুর বেলা বিদায়' ইত্যাদি কবিতায় বুদ্ধদেব উচ্ছ্বাসের পশ্চাদ্ধাবন সহসা সংযত করলেন। সাবলীলতাকে বর্জন করলেন না, সচেতনতাকে এবং নৈর্ব্যক্তিকতাকে অগ্রাধিকার দিলেন। অধুনা বিবর্জিত 'দময়ন্তী'-র সেকালে-বিখ্যাত ক্রোড়পত্রটি—যা পড়ে আমরা কেউ কেউ আধুনিক বাংলা কবিতার রীতি প্রকরণ শিখে নিয়েছিলাম—সেই ক্রোড়পত্রটি যেন এই সচেতনতা ও নৈর্ব্যক্তিকতাকে লক্ষ করেই রচিত। মনে রাখি, ১৯৩৫ থেকে ১৯৪২ 'দময়ন্তী'-র কবিতাগুলির রচনাকাল। পৃথিবী তখন বেদনায় মোচড় খাচ্ছে, আধুনিক অস্তিত্বের জটিলতা তখন আর বুদ্ধদেবের মতো আত্মলীনের কাছেও অপাঙক্তেয় হয়ে থাকল না। 'বাঙালি বুদ্ধিজীবী ১৯৪০', 'কোনো কবি-বন্ধুর প্রতি, 'চলচ্চিত্র', 'ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা'—এই সব কবিতা তিনি লিখলেন।

এবং, তিনি প্রখর আত্মসচেতনতার বশেই কিছু পরে বুঝেছিলেন—এগুলি তাঁর হাতের কবিতা, ভালো কবিতাও বটে, কিন্তু কেবলমাত্র ভালো। তিনি যে আকাঙ্ক্ষায় জ্বলছেন, বহন করছেন যে বিদ্যুতের চাপ, এখনি উল্লেখিত কবিতাগুলি তার কেউ নয়। শ্রীশান্তনু দাস ও রুদ্রেন্দু সরকার সম্পাদিত 'স্বনির্বাচিত' কবিতা-সংকলনে বুদ্ধদেব 'ইলিশ'-কে প্রতিনিধি মনোনয়ন করেছিলেন। পদ্মা থেকে উঠে আসা উজ্জ্বল জলের শস্যের সঙ্গে নিজেরই অভিজ্ঞতার গভীর থেকে তুলে আনা এই উজ্জ্বল ঝকঝকে কবিতাটি ইলিশের মতো অমেদ, অফেন, সুচারু এবং স্বাদু। প্রথম দুটি স্তবকের প্রাকৃতিক পরিবেশ, আর শেষ দুই চরণের বিবর্ণ সঙ্কীর্ণ কলকাতার বৈপরীত্য—কবিতাটির রসবৈচিত্র্য সম্পাদিত করে। অনুমান করা যায়, কেন বুদ্ধদেবের পরবর্তী বিচারের রায় 'ইলিশ'-এর পক্ষে গেল। তবু, একথা সত্য যে, 'দময়ন্তী'-তে বুদ্ধদেব তাঁর নিজহৃদয়ের গভীর অরণ্য থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে প্রয়াসী। এ চেষ্টা প্রত্যেক কবিকে তাঁর জীবনে কোনো না কোনো সময়ে করতে হয়। 'দময়ন্তী'-তে কবির এই প্রয়াস পরিণতি পেল 'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর'-এ, 'যে আঁধার আলোর অধিক'-এ। এ প্রয়াসের ফল সকলের পক্ষে

সমান হয় না, এক রকমের হয় না—হওয়া বাঞ্ছনীয়ও নয়। বিষ্ণু দে যেখানে বারে বারে 'ঘোড়সওয়ার'-এর পর থেকে বিস্তৃত এবং চলিষ্ণু জীবনের সঙ্গী এবং সহচর হতে চাইলেন, জীবনানন্দ যেমন 'বেলা অবেলা কালবেলা'-তে এক সন্ধিলগ্নের ইশারা দিলেন, বুদ্ধদেবও 'দময়ন্তী'-তে তেমন এক দিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিলেন। কিন্তু তাঁর বেলায় ব্যাপারটা হ'ল বিশ্বারণ্য থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে নিজ হৃদয়ে প্রত্যাবর্তন।

প্রত্যাবর্তন—তবে বুদ্ধদেবের মতো কবির কাছে তা কিছুতে পুনরাবর্তন নয়। নয় পুনরাগমন। কেননা ইতোমধ্যে যার কাছে ফিরে আসা—সেই হৃদয়ের অনেক চঞ্চলতার অবসান ঘটেছে। সে হয়েছে প্রাজ্ঞ এবং সুস্থির। প্রথম যৌবনের সে কলতান এখন তার কাছে মনে হয় 'অস্থির চ্যাঁচামেচি'। আর, যে ফিরে আসছে সেই কবিসত্তাও কি থেকেছে অপরিবর্তিত? সেও কি বহির্বিশ্বের জল বাতাসে একেবারে থেকে গেল অস্পৃষ্ট? তা হতে পারে না। বুদ্ধদেবের মতো সচেতন কবির পক্ষে জাগতিকতার দ্বারা অবিদ্ধ থাকা আরো অসম্ভব। কিন্তু সে বিদ্ধতার বেদনা স্বতই তাঁর ক্ষেত্রে অন্য আকার পরিগ্রহ করে। (বাড়িতে চুরি হয়েছে, সুদূরে সমুদ্রপারে সে সংবাদ শুনে তিনি স্বাভাবিকভাবেই চঞ্চল হয়ে ওঠেন কী কী চুরি গেছে জানার জন্য। চিঠিতে তিনি বইপত্র, 'কবিতা' ইত্যাদি যে সব বস্তুর জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেন, সে তালিকার সব শেষে যেন চক্ষুলজ্জার খাতিরেই তিনি জানতে চান অলংকারাদি টাকা পয়সা কিছু গেছে কি না।[৫] 'অশ্লীলতা'-র অভিযোগে যখন তাঁকে কোর্ট-ঘর করতে হচ্ছে, তখনই তিনি বাদীবিবাদী খাড়া করে মনে মনে সাজাচ্ছেন এক অপরূপ রচনা—'কবিতার শত্রু ও মিত্র')।[৬] আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতোই তাঁকেও সহ্য করতে হ'ল আকাঙ্ক্ষার তাপ, ব্যর্থতা ও সাফল্যের দুহাতের টানাটানি, জীবিকার সঙ্গে জীবনের বিরোধ ও বোঝাপড়া।[৭] সুতরাং এ বিবর্ধমান ব্যক্তি সমস্ত কার্যাবলীর মাঝে মাঝেই ফিরে এসেছে নিজ হৃদয়ের কাছে। কিন্তু সেখানে কে আছে? প্রাক্-'দময়ন্তী' বুদ্ধদেবের কাছে এ প্রত্যাবর্তন বারে বারে ত্বরান্বিত হয়েছে প্রেমের কারণে। এখন সে প্রত্যাবর্তনের মূল আকর্ষণ কবিতা। আপন কবি-জীবনের প্রথমার্ধে তিনি প্রেমকে যে-স্থান দিয়েছিলেন, 'দময়ন্তী'-র পরে তিনি কবিতাকে দিলেন সেই

৫ চিঠি (২৫) নরেশ গুহকে. 'কলকাতা', বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা—১৯৬৮

৬. কবিতার শত্রু ও মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, এম. সি. সরকার

৭. চিঠি (৮), নরেশ গুহকে, 'কলকাতা', বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা—১৯৬৮

স্থান। কবিতাকে তিনি 'দেবী' অভিধা দিয়েছেন এমন কি ব্যক্তিগত পত্রেও।[৮] তাকেই বলেছেন 'সর্বেশ্বরী' ('সর্বেশ্বরী' / যে আঁধার আলোর অধিক)। তারই উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'যা তোমার সেবা নয়, কিছুতেই আমি তা পারি না।' আমরা শুনেছি রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি গানের বিষয় গান। সে হিসাবে সেগুলি তা হলে গানের গান। বুদ্ধদেবের অনেকগুলি কবিতার বিষয় কবিতা, সে হিসাবে সেগুলি কবিতার কবিতা। কিন্তু তাই বলে কবিতা আর প্রেম দুটি ভিন্ন অনুভূতি থেকে গেল না। দুটি মিলে মিশে স্মৃতির সহযোগিতায়, অপেক্ষার ঐকান্তিকতায়, 'সহজেরে অসহ্য আত্মীয় জেনে' 'মায়াবন বিহারিণী নিমিত্ত চেতন হরিণীরে' খুঁজে ফেরা ; কবির সেই অপেক্ষা প্রেমিকের অপেক্ষার কোনো দিক থেকে কম যন্ত্রণাদায়ক নয় ঃ

হয়তো বা আমাকেও তবে
অন্তরের ক্ষমাহীন তিলোত্তমা, রূপের বাস্তবে
ধরা দেবে একদিন—শুধু যদি অপেক্ষার ধৈর্য না ফুরায় !
('কর্কটক্রান্তি', যে আঁধার আলোর অধিক)

কেন কবিতাকে এমনভাবে অস্তিত্বের সর্বস্ব নিবেদন ? কী আছে তার ইন্দ্রাণীর ভাণ্ডারে, যা নেই আমাদের রজত কীর্তির মিনারে, জীবিকার সাফল্যে বা জ্ঞানের গরিমায় ? কেন তারই জন্য বেছে নেওয়া, নৈরাশ্য, বিফলতা, আদিবাসী সিনবাদের বোঝা ঘাড়ে তুলে 'ক-টি মাত্র মিল খুঁজে সারাদিন গাধার খাটুনি' ? কী দিতে পারে সে। সম্ভবত তা-ই দিতে পারে, যা দিওতিমা দিয়েছিল হোয়েল্‌ডারলিনকে—সুষমা, সৌন্দর্য, সামঞ্জস্য। কেননা, বুদ্ধদেবও বলেন 'একান্তভাবে শিল্পকলার কাছে যা প্রাপনীয়' দুর্লভ সে-রত্নটি হল 'সামঞ্জস্য'। এবং 'শৃঙ্খলা—তা সংসারজীবনে কোথাও যদি নাও থাকে, তবু আছে ছন্দোবন্ধ কোনো চরণে, কোনো সুগঠিত গদ্যবাক্যে সুর অথবা রেখার কোনো বিন্যাসে—আছে এবং থাকতেই হবে।'[৯] এ 'সামঞ্জস্য' বা 'শৃঙ্খলা' ব্যক্তির চতুষ্পার্শ্বস্থ অসম্পূর্ণ বাস্তবের ক্ষতিপূরণ—কবিকেই সমস্ত আত্মক্ষতি সহ্য করে তা রচনা করতে হয়। সে বড়ো মহার্ঘ, তার সাধনাও দুষ্কর। যে আকূতি নিয়ে একদা হোয়েল্‌ডারলিন বলে উঠেছিলেন ঃ

---

৮. বিজয়া মুখোপাধ্যায়, 'বুদ্ধদেব বসুর একটি চিঠি ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা', 'দেশ' ২০শে মার্চ ১৯৭৩

৯. বুদ্ধদেব বসু, কবিতার শত্রু ও মিত্র

একটি নিদাঘ শুধু দান করো, হে দুর্ধর্ষ দেবতা, আমাকে,
একটি হেমন্ত শুধু সংগীতের সোনালি সময় !

('অদৃষ্টের প্রতি', বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ)

—প্রায় তারই কাছাকাছি তীব্র আকাঙ্ক্ষায় বুদ্ধদেবও উচ্চারণ করেন ঃ

এখন, মধ্যপথে, এখনও কি আসেনি সময় ?
পারি না কি তোমাকে ছাড়িয়ে যেতে, যেখানে মলয়
ম'রে যায় বরফের ষড়যন্ত্রে—সেই গর্ভে সারাৎসার ঢেলে

ক্ষীণ, ছোটো, প্রচ্ছন্ন, দুর্বল হ'য়ে, যদি কোনো দূরতর মেঘে
কাটিয়ে কঠিন রাত্রি, একদিন বীজের আবেগে
ফ'লে উঠি নিটোল উজ্জ্বল পূর্ণ একটি আপেলে।

('কবি' ঃ তার ক্ষমতার প্রতি)

কিন্তু তাঁর উপলব্ধি এবং উচ্চারণের নিজস্বতায় এ কখনো হ'ল না হোয়েল্ডারলিনের প্রতিধ্বনি। হোয়েল্ডারলিন যেখানে অদৃষ্ট-সম্ভাষী, বুদ্ধদেব সেক্ষেত্রে নিজের ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন—তারই দেওয়া ক্ষমতায় তিনি সব সংক্ষিপ্ত সাফল্য ডিঙিয়ে যেতে চান দুরূহের দিকে। এই-ই বুদ্ধদেবের উপলব্ধ কবি-ভবিতব্য। এবং আমার মনে হয় তাঁর প্রসঙ্গে এটা খুব দরকারী কথা যে, এ পথে চলতে চলতে তিনি একটা বিশিষ্ট আর অনন্য এ্যাটিট্যুড আর টোনের অধিকারী হয়েছেন। কবিকে অপ্রলুব্ধ থাকতে হবে। সে শুধু—না, এমনকি সমধর্মীও নয়—নিজেই তার লক্ষ্য ঃ

শুধু, কোনো অচিকিৎস্য ক্ষরণের ব্যাধির অধীন—
যতক্ষণ পৃথিবী চলায় মত্ত—সে গেছে মোমের মতো জ্ব'লে,
আপনারে আলো দিয়ে, নামহীন প্রাচীন অনলে।

('কেন ?', যে-আঁধার আলোর অধিক)

শুধু 'আপনাকে'। তৃপ্ত, নিরাপদ, সমাদৃত কুকুরের মতো ঈর্ষুক চোখে যে কোনো আরামদায়ক সাফল্য তাকিয়ে থাকে আঁধারের স্বাধীন সন্তান কবির দিকে। কী থেকে এই স্বাধীনতা ?

এইখানে তাঁর সীমা। তিনি উপযুক্ত বহিরাশ্রয় দাঁড় করাতে পারেন নি, যাতে তাঁর এই স্বাধীনতা-সংকল্প সুদৃঢ় হয়ে উঠতে পারে, হয়ে উঠতে পারে স্বতঃপ্রমাণিত। এবং তিনি গাঢ় আত্মসচেতনতা ও নিজ- ভূমিকা-জ্ঞান থেকে তখন অগ্রসর হয়েছেন জাতীয় 'মিথ'-এর ভাষ্যে আলোকে ঐ সঙ্কটের সার্বিক চরিত্র নির্মাণে। এখানেই তাঁর অর্জুন-কল্পনার প্রয়োজন

হ'ল। কিন্তু তাঁর অর্জুন বিষ্ণু দে-র অর্জুনের মতো শ্রেণী-প্রতিনিধি নয়,[১০] একান্ত ভাবেই ব্যক্তি প্রতিনিধি। স্মৃতি এখানে ব্যক্তির নিভৃত স্মৃতি। স্মৃতি চারণ করতে করতে তাঁর পক্ষে অর্জুন-কল্পনায় উত্তরণ স্বাভাবিক। কীর্তিমান মধ্যবিত্তের অনিবার্য ঐতিহাসিক পতনের নাটকীয়তা প্রত্যক্ষ করে বিষ্ণু দে-র অর্জুন কল্পনা।[১১] বুদ্ধদেব বসুর অর্জুন বিকল্পে শিল্পীই। 'বহুমুখী প্রতিভা', 'শিল্পীর উত্তর' প্রভৃতি কবিতা স্মরণীয়। শেষ অন্ধকারে নিমজ্জিত হবার আগে স্মৃতিই চিনিয়ে দেয় সত্যাসত্য, শেষ সমালোচিকা সে-ই। বুদ্ধদেবের অর্জুন তাঁর কবিতায় এই কাল নিগৃহীত সত্তার স্মৃতিধর প্রতীক।

১০. 'তৃতীয় পাণ্ডবের প্রবেশ ও প্রস্থান'-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে

১১. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, কোমলে গান্ধারে বিষ্ণু দে গ্রন্থে 'বিষ্ণু দে ও পুরাণ'।

আধুনিক কবিতার আততি—সমর সেন

এক

দীর্ঘকাল তিনি আর লেখেন না। কবিজীবনও ছিল তাঁর নাতিদীর্ঘ। গদ্য প্রায় লেখেনই নি। অভিমত ব্যক্ত করেন নি সাহিত্য বিষয়ে। সমাজ বা সভ্যতা সম্বন্ধে রচেন নি কোনো গুরুতর পোলেমিক। কবিতা—একমাত্র কবিতাই ছিল তাঁর মাধ্যম। সে-মাধ্যমেই ঘটেছিল তাঁর স্বল্পকালীন অব্যর্থ আত্মনিয়োগ। তাঁর নিজ কবিত্বের স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাস তাঁর প্রবল আত্মসচেতনতার স্মারক। অপরার্থে সেই আত্মসচেতনতাই ছিল তাঁর সভ্যতা-সচেতনতা। অথচ যখন দেখি তিনি গদ্যকে ফুসলে নিয়ে যেতে চান নি কবিতার এলাকায়, কিংবা কবিতাকে সঁপে দিলেন না গদ্যের পরুষ হাতে—তখন তাঁর শিল্প-মনস্কতাতেও আমাদের সন্দেহ থাকে না।

সমর সেন যখন বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর স্বাক্ষরটি সবে মুদ্রিত করে দিচ্ছেন, সেই সময়টির চারিত্র অবিস্মরণীয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ভেসে গেল অনেকগুলো দিন, প্রায় দুটো দশক ;—আরো শিথিল হয়ে গেল যখন নানা দিকের বন্ধনগ্রন্থি, যখন নানা স্রোতে-প্রতিস্রোতে মিলিয়ে গেল দিক্‌বোধ ; স্যাঁতসেতে, নিস্তেজ যখন সময়—গতি যখন হারিয়ে ফেলেছে অভিমুখীনতা, হয়ে উঠেছে আবর্ত ফেনিল—সমর সেন সেই সময়ের কবি। সেই সময়ের চিহ্ন তাঁর কবিতায় ছায়া ফেলেছে বলে একথা বলছি না। সময়ের ছায়াকে কবিতায ভাসিয়ে তোলা কবির কাজ বটে, কিন্তু সেটাই তাঁর চূড়ান্ত কাজ নয়। সেই স্বভাবত অপসৃয়মান ছাযাকে, আপন প্রতিভার রেখায় রঙে মূর্ত করা, কালজ উপাদানের সাহায্যেই গড়ে তোলা এক কালোত্তরকে—এটাই বড়ো কবির কাজ। সমর সেন সেই অর্থে ছিলেন বড়ো কবির লক্ষণযুক্ত। তাঁর কবিতার চরিত্রপাত্রেরা কুশীলবেরা ছিল তিরিশেরই প্রতিনিধি। ভূমিকায় গৌণ, কিন্তু ব্যঞ্জনায় গূঢ়। আজও বিস্ময় অনুভব করি সময়ের সেই বিচিত্র তৎকালীন প্রতিফলনে। সেদিন জীবনানন্দ এবং সমর সেন দুই কোটির দুই কবি ব্যক্তিত্ব। বুদ্ধদেব এবং বিষ্ণু দে দুই পৃথক কবিকৃতার্থতার অভিমুখী। অমিয় চক্রবর্তী ও সুধীন্দ্রনাথ দুই প্রান্তের প্রতিনিধি। সেই হৈমন্তিক ম্লানতা এবং নাগরিক ধূসরতা, সেই প্রবল আত্মাদর আর বিশ্বগ্রাহী নৈর্ব্যক্তিকতা, দূর নীলিমার ধ্যান ও সৌন্দর্য-স্বপ্নে বস্তু বিশ্বের দৌরাত্ম্য সম্বন্ধীয় বোধ—সবই ছিল জীবনের

সত্য, এক সামাজিক বাস্তবতার অঙ্গ। সহাবস্থিত এই ভাবনাবৈগুণ্যে কোনো অসঙ্গতি নেই কিন্তু। সময়ের অনুপাতে এরা এক ঋতুরই ফুল—এদের পাপড়ি-বিন্যাসে, ঘ্রাণে, রঙে একই সময়ের রোদ জল বাতাসের নিজ নিজ পরিগ্রহণ। জীবনানন্দীয় ধূসরতা ও সমর সেনের ধূসরতার রঙ ও ভাষায় তাই এত অমিল। জীবনানন্দের 'বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে' অথবা 'পেঁচার ধূসর পাখা উড়ে যায় নক্ষত্রের পানে' কিংবা 'বিলুপ্ত ধূসর কোন পৃথিবীর শেফালিকা আহা' অথবা 'ধূসর পেঁচার মতো ডানা মেলে অঘ্রাণের অন্ধকারে'—এবং 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-র অনেক ধূসরতাবাচক হৈমন্তিক অনুষঙ্গে পাওয়া যাবে এক নিরুত্তাপ ম্লান আলো। অন্যদিকে সমর সেনের ঃ

ক. রাত্রে, ধূসর সমুদ্র থেকে হাহাকার আসে,
খ. হে শহর, হে ধূসর শহর
গ. অন্ধকার ধূসর, সাপের মত মসৃণ,
ঘ. দিগন্তে ধূসর মাঠে গতপত্র বট
মাথা নাড়ে প্রবীণ ক্লান্তিতে।······
ঙ. ভুলে যাওয়া হাওয়া এল ধূসর পথ বেয়ে ঃ

—এই সব আরো সাতপাঁচ নানা ধূসরতায় গোধূলির ম্লান আলোর চেয়ে বেশি ফুটে উঠেছে এক রূঢ় শীতলতা। মধ্যবিত্ত অস্তিত্ব সেদিন দাঁড়িয়েছিল এক অভবিষ্য অন্ধকারের শিয়রে—তার সকল নিরুদ্দেশ ক্লান্তি সমর সেনের ধূসরতায় ছায়াদেহ ধরেছিল। আরো একটা কথা এ প্রসঙ্গেই মনে না হয়ে পারে না। জীবনানন্দের ধূসরতাবোধের অনুষঙ্গে এক নক্ষত্রের গূঢ় উপস্থিতি অবিস্মরণীয়। সমর সেনের ধূসরতায় কোনো সান্ত্বনা নেই। এ এক নাগরিক ধূসরতা বলেই এ কখনো ইঙ্গিত দেয় না নৈসর্গিকতার—বরঞ্চ এর উপমান যতসব ধূলিভার বিবর্ণ মলিনতা।

এবং আরো লক্ষণীয়, জীবনানন্দের কবিতায় আমরা যেমন বারে বারে মুখোমুখি হয়ে যাই নির্জনতার—সমর সেনের কবিতায় তেমনি 'স্তব্ধতার'। নির্জনতা জীবনানন্দের দ্বারা উপাসিত—সমর সেন স্তব্ধতার দ্বারা আক্রান্ত। এবং, তিনের দশকে—যখন গান্ধীজীর আন্দোলন অকস্মাৎ সংবৃত, যখন অন্যতর শ্রেণীর বৈপ্লবিক পদক্ষেপ কিংবদন্তির মতোই দূরশ্রুত, যখন মধ্যবিত্তের প্রত্যাশা ও প্রত্যয় বিশ্বব্যাপী মন্দার চোরাবালিতে নিমজ্জমান—সে সময় 'স্তব্ধতা' অবশ্যই কোনো কিছুর উপক্রমণিকা নয়—অনেক কিছুর উপসংহার। জীবনানন্দের 'নির্জনতা-বোধ' ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে উদ্ভূত, —তার ব্যক্তিগত ভবিতব্যের অভিজ্ঞান। পক্ষান্তরে সমর সেনের 'স্তব্ধতা-বোধ'

তাঁর ইতিহাস-অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তির আত্মসম্বিতের মিলন-ফল। জীবনানন্দ যখন বলেন, 'অরব অন্ধকার' বা 'উটের গ্রীবার মতো নিস্তব্ধতা' তখন সে-স্তব্ধতা হয়ে ওঠে মানুষের বাহিত শূন্যতারই বিকল্প। সে শূন্যতার স্বরূপ মানুষের অর্ধগোচর—উপমায় এবং শব্দে সে পরাবাস্তবকে ধরার প্রয়াস। স্তব্ধতা শ্রাব্য বলে তাকে ভাষায় মূর্ত করতে প্রয়োজন হয় চিত্রকলাসম্মত কৌশলের। তিরিশের কবিদের মধ্যে সমর সেন তাঁর নিজস্ব স্তব্ধতাজ্ঞানকে রূপান্তরিত করার সময়ও ইম্প্রেশনিস্টিক চিত্রকলার আবহাওয়াকে আত্মস্থ করেছেন ঃ

ক. হলুদ রঙের চাঁদ রক্তে ম্লান হল,
তাই আজ পৃথিবীতে স্তব্ধতা এল,
বৃষ্টির আগে শব্দহীন গাছে যে কোমল, সবুজ স্তব্ধতা আসে।

খ. দূরে পশ্চিমে
বিপুল আসন্ন মেঘে অন্ধকার স্তব্ধ নদী।

গ. আসন্ন হেমন্তে
মৃত্যু সহসা ঝুঁকে পড়ে চারিধারে ;
নিঃসঙ্গ বট
যেন পূর্বপুরুষের স্তব্ধ প্রেত

পাহাড়ের পাথরে আমার নাম লিখ ;
উদভ্রান্ত প্রাণ খোঁজে তিব্বতী স্তব্ধতা।

ঘ. তাই বসন্তের কার্জন পার্কে
বর্ষার সিক্ত পশুর মতো স্তব্ধ বসে
বক্রদেহ নায়কের দল
বিগলিত বিষণ্ণতায় ক্ষুরধার স্বপ্ন দেখে ;

ঙ. দুনিয়াদারীর দুর্দিন, বাজার অন্ধকার
পথে জমকালো স্তব্ধতা।

—এ স্তব্ধতা-বোধ বাংলা কবিতায় স্বভাবতই নতুন। হঠাৎ থেমে যাওয়া স্রোতের সামনে দাঁড়িয়ে অকস্মাৎ যে-বিমূঢ়তা জাগে, হঠাৎ ভূমিকা-ভুলে-যাওয়া চরিত্রের নীরবতায় ফুটে ওঠে যে-ছিন্ন-ছদ্মবেশ মানুষটি—সমর সেনের স্তব্ধতা বোধ তার সঙ্গে তুলনীয়। উদ্ধৃত অংশে 'স্তব্ধ প্রেত' এবং 'তিব্বতী স্তব্ধতা' —এ দুয়ের প্রথমটি সমকালীন বন্ধ্যা অকৃতার্থতার বর্ণনাত্মক চিত্রকল্প এবং

দ্বিতীয়টি রূপান্তরণী চিত্রকল্প। 'বর্ষায় সিক্ত পশুর মতো স্তব্ধ বসে'— স্তব্ধতার চরিত্রটিকে মূর্ত করে মুহূর্তে। প্রকৃত কবির কাছে কোনো অনুভূতিই অমিশ্র নয়। সমর সেনের স্তব্ধতার অনুভূতিও তাই মাঝে মাঝে নিয়ে যেতে চায় এক উদ্যোগের সমাসন্নতায়—'বিপুল আসন্ন মেঘে অন্ধকার স্তব্ধ নদী' সেই জাতীয় স্তব্ধতার ধারক। আর 'জমকালো স্তব্ধতা'— বহিরঙ্গ-সর্বস্ব পণ্যভারমন্থর অন্তঃসারশূন্য নাগরিক সাম্প্রতিকতার এমন ছবি খুব কমই দেখা যায়।

এবং যে-সামাজিক এবং ঐতিহাসিক বন্ধ্যা অবস্থা সমর সেনের ধৃত অনুভূত ও চিত্রিত স্তব্ধতার জননী, সেই স্তব্ধতার অনুষঙ্গে গঠিত হয়েছে দুটি কাব্যপ্রসঙ্গ—তা কখনো চিত্রকল্প, কখনো প্রতীক। একটি 'পাহাড়', অপরটি 'কুয়াসা'। ঐ স্তব্ধতা এবং এই 'পাহাড়' পরস্পরের মতোই অনড় / 'পাহাড়ের ধূসর স্তব্ধতায় শান্ত আমি', 'গম্ভীর পাহাড় থেকে দুরন্ত ঝড় এল', 'বসন্তের বজ্রধ্বনি অদৃশ্য পাহাড়ে', 'কী যেন কাঁপে পাহাড়ের স্তব্ধ গভীরতায়' 'আর পাহাড়ের ধূসর অন্ধকারে/দুরন্ত অন্ধকার ডানা ঝাড়ে', 'পাহাড়ের মতো মেঘবর্ণ প্রাসাদ'—স্তব্ধতা এবং ভারি অনড় একটি পরিস্থিতি পরস্পরকে জড়িয়ে বারে বারে হয়ে উঠেছে পাহাড় বা পাথর, যথা—'পাটের কলের উপরে আকাশ তখন পাথরের মতো কঠিন', কিংবা, 'অন্ধকারের মতো ভারি তোমার দুঃস্বপ্ন। তোমার দুঃস্বপ্ন অন্ধকারের মতো ভারি', অথবা 'আর দিগন্তে জমে ইস্পাতের মতো ধূসর আকাশ' বা অবিস্মরণীয় সেই চিত্রকল্পটি—'সে আকাশে ঘন মেঘ জমে আছে/শীতের অজগরের মতো'।

আমার কেবলই মনে হয় এই সব পাহাড়, পাথর, ইস্পাত, শীতের অজগর, একথাই জানাতে চায় যে, কবি তখন এক দুর্ভেদ্য দুরতিক্রম্য অচলতাকে অনুভব করেছেন সমাজে, ইতিহাসে। সেই অচলতাই আবার তাঁর কাছে এনেছে একটা চ্যালেঞ্জ—সম্মুখের খাদ যেমন বাধা ও আহ্বান দুইই। এই চতুর্দিগ্‌বর্তী স্থিত, মূঢ়, জড়তার মধ্যে কবির মানসিক আর্তি ঐসব চিত্রকল্পে, প্রতীকে, কাব্যপ্রসঙ্গে, খুঁজে পেয়েছে আশ্চর্য আধার। এই স্তব্ধতা হতে পারে না আশ্রয় অথবা নীড়। সেই আর্তি থেকেই উচ্চারিত হয়ঃ

আমার মনে শান্তি নেই।
যদি ঝড় নেমে আসে,
শব্দের তীব্র আঘাতে আকাশ চূর্ণ ক'রে
অন্ধকারে ঝড় নেমে আসে,

ঝড় নেমে আসে বিশাল, গভীর অন্ধকারে ;
তাহলে হয়তো, হয়তো আমার মনে শান্তি আসবে।

—কাব্যরসিক লক্ষ না করে পারেন না যে, এ অংশটি গণকবিতার সমবেত উচ্চারণের যোগ্য নয়—এও এক ব্যক্তিগত উচ্চারণ। 'ঝড় নেমে আসে' বাক্যাংশটির বিস্তৃত ব্যাখ্যা, 'হয়তো' শব্দের দ্বিরুক্তি, এখানে এক ব্যক্তিগত উদ্বেগ, প্রতীক্ষা ও সংশয়ের চেহারাকেই ফুটিয়ে তোলে। এই আর্তিতেই সমর সেন বিশিষ্ট—এই আর্তিই তাঁর অভিজ্ঞান।

দুই

সমর সেনও সেদিন অনুভব করেছিলেন ইংরেজের উপনিবেশে আমাদের অস্তিত্বের আবহমান ধারা কেমন বিপন্ন হয়ে গেল, কেমন নব্যবাবু-বিলাসে জীবনের গম্ভীর ট্র্যাজেডি রূপান্তরিত হল প্রহসনে :

ভাঙা পাথর, মাইলের পর মাইল ;
জরাগ্রস্ত মসজিদ, মন্দির, মোগলাই দুর্গ,
দিনে প্রাচীন বিষণ্ণ গর্বে কঠিন,
অন্ধকারে অবাস্তব ;
তখন নবীন শৃগাল বারে বারে ডাকে
ভুঁইফোড়ের জয়গর্বে,
কোটরে প্রাচীন পশু শিথিল, শীতে স্তব্ধ। (শবযাত্রা)

অবক্ষয়ের এমন নির্ভুল প্রতিচ্ছবিটি ক্লিশে-বিবর্ণতা থেকে রক্ষা পেয়েছে কবির নিবিড় ইতিহাসজ্ঞানের কারণেই। দিনের "বিষণ্ণ গর্ব" এবং অন্ধকারে অলীকত্ব এক অন্তর্গূঢ় কল্পনার ফল। এখানেও শীতে গতিহারা এক অস্তিত্বের উল্লেখ সময়ের নিজস্ব মন্থরতাকে ব্যঞ্জিত করে নিয়েছে। এই অবসন্ন সময়ে, যান্ত্রিক কোলাহলের মরুভূমিতে, পরস্পরের ভিড়ে ব্যক্তিকে হারিয়ে ফেলা দিনগুলোর বন্ধ্যা পুনরাবৃত্তি কবির কাছে এইভাবে প্রতিভাত হয় :

কঙ্কালগাছ হাতছানি দেয়,
প্রখর রৌদ্রে
মরুভূমি আমাদের ঘেরে ;
রাত্রি স্তব্ধতা আনে না,
গুমোট শহর অতীত পাপের পুনরাবৃত্তি রচে।

সদরে এসে কী বা ফল ?
অন্ধকারে অন্ধলোকের চলাচল,
বধির জনের সঙ্গে কথা বলা ! (শবযাত্রা)

নাগরিক বিচ্ছিন্নতার, সংযোগসূত্র হারিয়ে ফেলার, অহর্নিশ উদ্দেশ্যহীনতার মূর্তিটি এক-একটি গদ্যাত্মক বাক্যে রূপ ধরেছে। সেই অদ্ভুত বিশূন্য সময় —যখন প্রত্যেকটি প্রভাত ছিল আরেকটি অর্থহীনতার, আরেকটি বিড়ম্বনার পুনরাবৃত্তি, তখন স্বভাবতই সকালের রঙে রুক্ষতা ঃ

ক. কত সবুজ সকাল তিক্ত রাত্রির মতো,

খ. সেই উজ্জ্বল স্তব্ধতায়
ধোঁয়ার বঙ্কিম নিশ্বাস ঘুরে ফিরে ঘরে আসে
শীতের দুঃস্বপ্নের মতো

গ. কলতলার ক্লান্ত কোলাহলে
সকালে ঘুম ভাঙে
আর সমস্তক্ষণ রক্তে জ্বলে
বণিক সভ্যতার শূন্য মরুভূমি।

ঘ. রাত্রির দূষিত রক্তে বিকলাঙ্গ দিনের প্রসবে
আমাদের তন্দ্রা ভাঙে ঃ

বারে বারে ভেসে এসেছে 'এক পীড়িত আকাশের আভাস'। চাঁদের আলোয় লেগেছে 'হলুদ রঙের' বিশেষণ, 'হলুদ ঘোলাটে চোখে মোটর এগোয়', 'শূন্য মাঠে কোটরহীন চোখের মতো গ্যাসের আলো ঝোলে'। এ সবই প্রমাণ করে যে সেই দুঃসহ মন্থরতায়, কর্কশ পুনরাবৃত্ত কোলাহলের, নাগরিক জীবনের সর্বৈব বিবর্ণতায় প্রকৃত আগ্রহ ছিল এক স্নিগ্ধতার জন্য, এক হৃদয়াভিরাম স্তব্ধতার জন্য—ক্লান্তির নগরে যা দুষ্প্রাপ্য। আলোর রুক্ষতা বা ছলনার চেয়ে বুঝি ঢের ভালো ছিল অন্ধকার—অর্থহীন কলরব অপেক্ষা ঢের ভালো বুঝি সব শব্দকে স্তব্ধতায় ডুবিয়ে দেওয়া।

তথাপি তিনি তো ঠিকই জেনেছিলেন—আলোকাপ্লুত প্রান্তরেই মুক্তি। এই কবির লিখিত আমার প্রিয় কবিতাগুলির অন্যতম 'চার অধ্যায়' এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে ইচ্ছে হয়। প্রাকৃত ভাষায় 'চার অধ্যায়' একটি ব্যর্থপ্রেমের কবিতা। চারটি অংশে কবিতাটি বিভক্ত। একটি কাব্যোপেত অথচ ক্ষীণ কাহিনীধারা এই চারটি অংশে কখনো প্রচ্ছন্ন, কখনো ব্যক্ত। তিনটি ছোট ছোট স্তবকে গঠিত প্রথম অধ্যায়টি পৃথক কবিতা হিসাবেই অসামান্য। তবু আসলে এটা গোটা কবিতাটির মোক্ষম মুখপাত। এই প্রথমাংশটির স্মৃতি

তরবারির মতো উজ্জ্বল চতুর্থ অধ্যায়ের শেষতম দুই চরণের ঘায়ে ছিন্নভিন্ন হবে। সমস্ত প্রথম অধ্যায়টি কতকগুলি আশ্চর্য পুনরুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছে এক ক্লান্তির, ব্যর্থতার, শূন্যতার, ভবিষ্যহারা উদ্বেগের চরিত্র। 'আমার চোখে ঘুম নেই' উচ্চারিত হয়েছে তিনবার; 'স্পন্দমান দিনগুলি আমার দুঃস্বপ্ন'—দুবার; 'দিন নেই, রাত নেই, বারে বারে চমকে উঠি' সামান্য রদবদলে—দুবার। পনের পঙ্‌ক্তিতে এই উক্তিগুলিই ধ্বনিত হল কয়েকবার। কিন্তু সুকৌশলী পুনরুক্তি গাঢ় করে তুলেছে এই অনুভূতি :

রাত নেই, দিন নেই, বারে বারে চমকে উঠি,
আমার মনে শান্তি নেই, আমার চোখে ঘুম নেই,
স্পন্দমান দিনগুলি আমার দুঃস্বপ্ন।

বাইরের দিক থেকে সরল, কিন্তু অন্তর্জটিল এই কবিতার প্রথম তিনটি অধ্যায়ে অন্ধকারের প্রাধান্য—সে-দুর্মর অন্ধকার কখনো স্থিরীভূত হয়েছে, ('কঠিন অন্ধকারে অবরুদ্ধ বাতাস/দেওয়ালের উপর বিষণ্ণ ছায়া,) কখনো যন্ত্রণায় স্পন্দিত হয়েছে, ('ফাঁকা মাঠের নিঃশব্দ, গভীর রাত্রি/আর নীড়হারা পাখির শব্দ নিঃসঙ্গ আকাশে।) আর তা সব থেকে তীব্র এক সূচ্যগ্র তীক্ষ্ণতা পেয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে :

আর হাওয়ায়
নামহীন ফুলের অদ্ভুত চাপা গন্ধ
মুহূর্তগুলির নিঃশব্দ কান্নার মতো;
আর বসন্তের কোনো রাত্রে
পদ্মদীঘির জলে যখন ছায়া গভীর হবে,
তখন বাসনায় ক্লান্ত দেহ,
কার নিঃসঙ্গ, অদৃশ্য মূর্তি চকিতে আসবে
নিমীলিত চোখের অন্ধকারে—
আর সে রাত্রে পৃথিবীর সমস্ত ঘুমে দুঃস্বপ্ন।

'অদ্ভুত চাপা গন্ধ' আর 'নিঃশব্দ কান্না'-র নিভৃত অন্বয় উপভোগ্য। সবটা মিলিয়ে, শুধু দুর্মর নয়, এক দুর্বহ অন্ধকারের অনুভূতি সঞ্চারিত হয় ধীরে ধীরে। সংযোজক অব্যয় হিসাবে 'আর' শব্দের প্রতি পক্ষপাতটিও এই প্রসঙ্গে নজরে পড়ে। 'আর' 'এবং'-এর বিকল্প হতে পারে না তা নয়—কিন্তু এখানে বোধহয় 'আর তার সঙ্গে' বা 'তদুপরি' বলতে যা বোঝায়, সে অর্থও আভাসিত। ভারাক্রান্ত মন্থরতার ভাব সঞ্চারে এই অর্থ অপ্রয়োজনীয়

নয়। চতুর্থ অধ্যায়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল অন্ধকারের প্রাধান্য। গল্পের নায়ক ব্যর্থ প্রেমের গ্লানি থেকে, এবং বিকল্প রচনার মূঢ়তা থেকে মুক্তি পেল। প্রথমেই দেখা গেল কেটে গেছে রাত্রির দুঃস্বপ্ন ঃ

তারপরে আমি গেলাম অনেক দূরে,
অনেক দূরের সেই দেশে,
যেখানে রাত্রে স্বপ্ন আসে
সবুজ পাতায় ম্লান পাখির মতো ;

শেষ দুই চরণের ইঙ্গিতবাহী চিত্রকল্পে আর দুঃস্বপ্নের কলুষ নেই। স্বপ্ন এখানে স্বাভাবিকতা। শুধু অনুধাবনীয় 'ম্লান' এই বিশেষণটি। 'ম্লান পাখি' নায়কের জীবনের ছবি। সবুজ পাতায় হয়তো তার পুনরুজ্জীবনের আশ্বাস। তারপরেই চতুর্থ অধ্যায়টিতে নেমে এসেছে দুরন্ত আলোর বন্যা। 'স্যাকারিনের মতো মিষ্টি / একটি মেয়ের প্রেম'—এই অংশে স্যাকারিন শব্দটির ধ্বনি-সংকেত একদিকে যেমন কঠিন ধিক্‌কার, অপরদিকে তা মধ্যবিত্ত বিলাসের আপাত-রম্যতাকে কটাক্ষ করে, কিন্তু সুপ্রযুক্ত শব্দসংকেতটি সেখানেই থেমে থাকে নি। অনুষঙ্গের দিক থেকে 'স্যাকারিন, সুদূর অন্বয়ে আলোককে আভাসিত করে—সেই আলোক এখানে মোহভঙ্গের সূচক। এর পরে যে জীবনের কথা বলা হয়েছে, তা বাস্তব দুঃখের সুস্থ জীবন। 'মুহূর্তগুলির নিঃশব্দ কান্নার' বদলে এবারে পাওয়া গেল ঃ

কিন্তু সাইকেলে-ফেরা কেরানীর ক্লান্তিতে
দিনের পর দিন
ঘড়ির কাঁটায় মন্থর মুহূর্তগুলি মরে ,

অব্যবহিত পরেই উচ্চারিত হয়েছে সবুজ বসন্তের প্রার্থনা—যে বসন্ত উন্দাম। তারপরেই চকিত করে তোলে এই প্রত্যয়ী স্পষ্টতা—'উজ্জ্বল, ক্ষুধিত জাগুয়ার যেন/এপ্রিলের বসন্ত আজ'। ক্ষুধিত জাগুয়ার—যার বিশেষণ 'উজ্জ্বল', এবং 'এপ্রিলের বসন্ত' অবশ্যই উজ্জ্বলতা তারও অনুমেয়, দুয়েরই সাধারণ শক্তি 'অনিবার্যতা'। 'ক্ষুধিত জাগুয়ার' বলিষ্ঠ স্বাভাবিক জীবনের প্রতীক। 'জাগুয়ার' বিশিষ্ট হয়েছে শব্দার্থে ততটা নয়, যতটা শব্দধ্বনিতে। উদ্যত আগুয়ান ভঙ্গির দ্যোতক এই শব্দটি। আর 'জাগুয়ার' এল বলেই বসন্তের বিশেষণ 'ফাল্গুনের' বা 'চৈত্রের' না হয়ে, হল 'এপ্রিলের'। ফাল্গুন বা চৈত্র রবীন্দ্রলালিত বাংলা কাব্যে যে-অনুষঙ্গ আকর্ষণ করে, তার সঙ্গে জাগুয়ারের আক্রমণোদ্যত ভঙ্গি মেলেনা।

এই কবিতার নাট্যসম্ভব মর্মোক্তি অন্যতর তাৎপর্য পেয়েছে 'তুমি' এবং 'ও' এই এখানে একার্থক সর্বনাম দুটির জন্য। প্রথম অধ্যায়েই যখন দ্বিতীয় স্তবকে উচ্চারিত হয়, 'আর তোমার পাশে/রাত্রি-জাগরণ-ক্লান্ত আমার দীর্ঘশ্বাস'—তখন আমরাও আসলে এক দোদুল্যমান ছায়ামূর্তির দেখা পেয়ে যাই। তৃতীয় অধ্যায়ে যখন 'অন্ধকারে ওর দাঁত হাসিতে ঝকঝক করে উঠল'—তখনই তাকে চেনা গেল আরো নিবিড় করে। চতুর্থ অধ্যায়ে এই 'তুমি' তামসী রাত্রির শেষে রৌদ্রময় পরিণতিতে অবলুপ্ত হয়েছে স্বাভাবিক ভাবে।

তিন

বিষ্ণু দে র সুগভীর এবং অব্যর্থ রসদৃষ্টিতে সমর সেনের গদ্যকবিতার রূপ ও তাৎপর্য ঠিকভাবেই ধরা পড়ে, 'তিনি তো গদ্য কবিতায় লরেন্স-মার্গী নন, তিনি পাউন্ড-পন্থী'।' একথা অবশ্য স্বীকার্য লরেন্স-পন্থার সঙ্গে তাঁর বিরোধ নেই। লরেন্স যেমন হুইটম্যানের কাছ থেকে, সমর সেনও তেমনি লরেন্সের কাছ থেকে জেনেছিলেন কেমন করে দীর্ঘ মুক্ত কথ্যরীতি-নির্ভর বাক্‌স্পন্দকে ব্যবহার করা যায়, অথচ তারই মধ্যে অনুপস্থিত গীতলতায় তাকে সমৃদ্ধ করতে হয়। কিন্তু শ্রীযুক্ত দে যা বলেন সেটাই যথার্থ, সমর সেন লরেন্স-পন্থী নন, কেননা তিনি কখনোই অভিজ্ঞতার বিষয়ে বাণী বিতরণ করেন নি—তিনি অভিজ্ঞতাকে অভিব্যক্তি দিয়ে থাকেন। এখানেই তিনি পাউন্ডীয়। আর, সমর সেনের ছন্দের যে স্ট্রফিক ইউনিট সংক্রান্ত জ্ঞানের প্রশংসা করেন বিষ্ণু দে, সেই জ্ঞানেরও অভিগমন শেষকালে সঙ্গীতেরই দিকে। সেখানে কথা বা বাক্যেরা সীমান্তে পৌঁছেই মৃত নয়, ফুরিয়ে যাবার পরেও তাদের নতুন যাত্রা শুরু হয়—নতুন অর্থদ্যুতিও ঠিকরোয় অব্যাহত। এখানেও সমর সেনের গদ্যকবিতা গদ্যপন্থী নয়, কবিতাপন্থী। এই অর্থেও তিনি পাউন্ডীয়। তাই আমি যখন পড়িঃ

আজ দুঃস্বপ্নে দেখি,
বৃদ্ধ শিশু আর বুদ্ধিহীন বৃদ্ধের দল
স্খলিত দাঁতের ফাঁকে কাঁদে আর হাসে
ট্রামে আর বাসে ;
দূরে পশ্চিমে
বিপুল আসন্ন মেঘে স্তব্ধ নদী।

তখন আমারও পড়তে ইচ্ছে হয় 'বিপুল আসন্ন মেঘে স্তব্ধ মহানদী'।

কিন্তু 'মহা' শব্দটি পরিহৃত হয়েছে বলেই আমি আচমকা পৌঁছে যাই এক শূন্যতার মুখোমুখি। অনুক্ত কথাটির জন্য—অনুচ্চার্য স্তব্ধতায় ভরাট হয়ে যায় চরণান্তিক দুই মুহূর্ত। 'আজ দুঃস্বপ্নে দেখি' থেকে 'ট্রামে আর বাসে' পর্যন্ত কথায় যে-কথ্যসুর, তা হঠাৎ উন্নীত উচ্ছ্রিত আবেগের রাজ্যে পৌঁছয় এই শেষ বাক্যে।

'সমর সেনের কবিতা'-য় (সিগনেট প্রেস) যা 'ক্লান্তি' নামে সংকলিত, এবং বিষ্ণু দে-সম্পাদিত 'একালের কবিতা'য় যা 'জাতীয় সংকট' নামে—তা এই কবির প্রতিনিধিত্বসূচক আর একটি কবিতা। নাতিদীর্ঘ কবিজীবনটির মধ্যেও সমর সেন যে চলিষ্ণু ছিলেন, ছিলেন বিবর্তিত—তাতে কোনো ভুল নেই। 'জাতীয় সংকট' কবিতাটিতে সেই বিবর্তনের সাক্ষ্য মেলে। এখানে আর সেই পাউন্ডীয় প্রকরণ নেই, নেই রবীন্দ্রলালিত কাব্য-প্রতিবেশের লক্ষণীয় কোনো রেশ। এখানে তাঁর গদ্যকবিতায় তৃতীয় স্বর কতকটা গদ্যমেজাজী, অনেকটাই গদ্যপন্থী। ঐটুকু সময়ের মধ্যে জীবন যতটা ঘুরেছে, এই ঔপনিবেশিক ভূখন্ডেও যত প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে আন্তর্জাতিক আকাশের ঝাপট, জীবনের শিরা ও ধমনী এক রূপান্তরের প্রাক্‌মুহূর্তে যত স্পষ্ট—এই কবির কাব্যেও তত সময়ের ঢেউগুলি চিত্রিত হয়েছে নতুন রেখান্যাসে।

হয়তো হাওয়া বন্ধ ; এ প্রান্তরের দিগ্বিদিকে
স্তূপীকৃত স্তম্ভিত বালুর উত্তাপে
আবহাওয়া লাল হয়, মধ্যদিনে সূর্য, মনে হয়
এক অতিকায় তৃষ্ণার্ত মহিষের চোখ
শূন্য থেকে একমনে জলাশয় খোঁজে,

দুঃসহ গ্রীষ্মাবর্তের চিত্রকল্প হিসাবে এ অসামান্য ; আর তৎকালীন বাস্তব পরিস্থিতির নৈসর্গিক রূপক নির্মাণে এর সাফল্য তর্কাতীত। শেষ চরণটির চতুর্দশমাত্রিক পরিমিতি অলক্ষ্যে গৌণ হয়ে যায় তার আগের চরণ থেকে বিস্তারিত বাক্যের অংশ হিসাবেই। সমর সেনের সতর্ক শ্রুতি 'বিপুল আসন্ন মেঘে স্তব্ধ নদী'—এই পঙক্তিকে আকারতঃ গদ্যকবিতার চরণ হিসাবে রেখেও ধরতে পারে সমাসন্ন নীরবের সঙ্গীতকে। আবার 'শূন্য থেকে একমনে জলাশয় খোঁজে' আকারতঃ চতুর্দশমাত্রিক হলেও তা মেজাজে ও উচ্চারণে গদ্যময়। এবং, এই আঙ্গিকগত অগ্রসৃতির মূলে ছিল কবির বাস্তব অবধানতা। পরিবর্তমান বস্তুজগতের রূপ ও স্বরূপের ছায়া পড়ে কবি চৈতন্যে। কবির সেই চঞ্চল যন্ত্রণাময় আত্মচৈতন্যের প্রকাশের আকুতিই আসলে নতুন রূপান্বয়ের জননী। সমর সেনের কবিকৃতিতে একটা শান্ত ধীর পরিবর্তন আরো সুসংহত

পরিণতিতে সম্পন্ন হবে-হবে করেই থেমে গেল—এটাই দুঃখের; নইলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো তিনিও মধ্যবিত্তের ব্যক্তিগত ভবিতব্যবোধ থেকে দৃঢ় অথচ নিজ নির্দিষ্ট পদক্ষেপে এগিয়ে এসেছিলেন ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দিকে। প্রথম অধ্যায়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো তিনিও বুঝেছিলেন, যাকে আমরা অদৃষ্ট বলি তা আমাদেরই জীবনাচরণের উদাসীন অবাধ্য সন্তান। আলোচ্য কবিতার প্রথম তিনটি চরণেই উপবাসী মানুষের চড়ুকের যন্ত্রণার প্রতীকটি কবির বৈপ্লবিক জীবনভাষ্যের ইঙ্গিতবহ। 'ব্যর্থ নিঃশ্বাসে হাওয়ারা হঠাৎ দল বেঁধে চলে / ছিন্নপত্রে, বালুতে, পাথরে, অনর্থক হিজিবিজি কেটে। / এ প্রান্তর আমাদের উত্তরাধিকার।' —চিত্রকল্পটি চরিত্র পায় গদ্যচ্ছন্দের কুশলী প্রয়োগে। 'ব্যর্থ নিঃশ্বাসে'-র অলক্ষ্য বিরতির পরেই 'হাওয়ারা হঠাৎ' সংহত হয়—'দল বেঁধে চলে' একসঙ্গে। পরের চরণে বাক্যস্রোত 'অনর্থক'-এ একবার ঠেক খেয়ে 'হিজিবিজি কেটে'-তে অনাহত বেরিয়ে যায়। ফুটে-ওঠে নিসর্গেরই ফ্রেমে আকালের দেশের মানুষের নিরুপায়, নির্লক্ষ্য পদযাত্রার ছবি। 'এ প্রান্তর আমাদের উত্তরাধিকার'—সে উত্তরাধিকারে গদ্যময় তট কাব্যস্রোতে প্লাবিত। এই ভুয়োদর্শী কবির কোনো কোনো ভাবনায় বুঝিবা কালের সীমা ভেঙে যায়। সেদিনের ছবিতে এদিনের ছায়া। এ ছবিতে চিরমুদ্রিত হয়ে রয়েছে সেদিনের ইতিহাস, কিন্তু তার সঙ্গে এই কয়েক বছর আগের অভিজ্ঞতাও মেলে নাকি ?

> পথে আজ লোক নেই, জবাবী হামলা হল শুরু।
> কারাগার অবারিত দ্বার, গ্রামে গ্রামে বিপর্যয় ;
> রাস্তায় নিরস্ত্র লোক হৃৎপিণ্ডে আহত, সন্ধ্যা রক্তক্ষরা।
> মাঝে মাঝে বিচলিত অন্ধকারে প্রহরীর ডাক
> রাত্রির স্তব্ধতা ভাঙে।
> দিগন্তে নিভেছে চাঁদ, অন্ধকার ভেঙেছে বাঁধ,
> স্তরে স্তরে সমুদ্যত বজ্রপেশী মেঘ,
> বর্বর ঝঞ্ঝাবাহিনী !

এ ছবিও কেনই বা সেদিনের নয় ঃ

> রাস্তায় রক্তের দাগে
> মৃতেরা স্মরণ মাগে।
> শীতের সন্ধ্যায় কুয়াশায়
> ট্যাকসই সংসার ধীরে ধীরে লুপ্তপ্রায়,
> শবলোভী শকুনেরা স্তব্ধতায় উড়ে যায়।

বাজারে দারুণ ভীড় ; দুর্ভিক্ষের করাল ছাপ
অনেকের মুখে।

এই ভাবেই কবিরা ভবিষ্যদ্রষ্টা হয়ে থাকেন—একথা বলার জন্য আমি ব্যস্ত নই। বরঞ্চ বলা যায়, এই ভাবেই ফুটে ওঠে কবির অন্তর্দৃষ্টি। ছড়িয়ে আছে মৃদু অন্তর্মিল কবিতাটিতে এখানে ওখানে। দিগন্তশায়ী মেঘের মতো তাদের গুরুগুরু ধ্বনি এক অদৃশ্য সংকেত জানায়। 'বজ্রপেশী মেঘ' ভাস্কর্য-প্রতিম প্রকাশভঙ্গিমা—'বর্বর ঝঞ্ঝাবাহিনী' কালের পূর্বগামিনী ছায়া। মনোযোগী পাঠক লক্ষ না করে পারেন না, সিগনেট সংস্করণ 'সমর সেনের কবিতা'-র সঙ্গে, বিষ্ণু দে-সম্পাদিত 'একালের কবিতা'-র একস্থলে একটা গুরুতর পাঠান্তর রয়েছে। যা 'জাতীয় সংকট'-এ ('একালের কবিতা'-য়) ঃ

আজ তাম্র সীতা, উলঙ্গিনী, দুর্ভিক্ষকন্যা আমাদের দেশ
কিম্ভূতকিমাকার জীবে আচ্ছন্ন নিঃসঙ্গতায়
অস্থিচর্মসার সন্তানের ভীড়ে নীরবে ব'সে।

তা-ই সিগনেট সংস্করণ 'সমর সেনের কবিতা'-য় সংশোধিত হল এইভাবে ঃ

আজ তাম্র সীতা, উলঙ্গিনী, দুর্ভিক্ষ কন্যা আমাদের দেশ
লঙরের সামনে অস্থিচর্মসার সন্তানের ভিড়ে নীরবে ব'সে।

'কিম্ভূতকিমাকার জীবে আচ্ছন্ন নিঃসঙ্গতায়'—এই অদ্ভুত এক বিষণ্ণতার ছবির প্রলোভন কী করে সমর সেন সংবরণ করলেন, তা ভাবলে তাঁর কবিত্বে আমাদের আস্থা দ্বিগুণিত হয়। কবি-জীবনের যে পর্যায়ে কবিতাটি লেখা সেখানে আর কোনো তির্যক ভাষণে তাঁর সম্মতি ছিল না। 'কিম্ভূতকিমাকার' জননীর কাছে নিশ্চয় নয়, কবির চোখে যদি হয়ই, তাহলেও সে-ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রশ্রয় পেল না। বরঞ্চ, 'লঙরের সামনে' বলার জন্য জননীত্ব, সন্তানের জন্য তাঁর উদ্বেগ আরো প্রত্যক্ষতা পেয়েছে। শেষের দিকে তাঁর লক্ষ্যই ছিল প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠা। 'গোধূলির পরে/ পুরোনো গ্রামের পরিচিত দোকানে আসি, / টিমটিমে আলো, দেয়ালে দেয়ালে করুণ ছায়া, / শূন্য চালের থলি, শীর্ণ ইঁদুর !'—প্রত্যক্ষেরই ছবি। প্রজ্বলন্ত মশালের কাষ্ঠদণ্ডের মতো কবিতাটির এই ব্রেখ্‌ট্‌-সম্ভব উক্তিটি আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না—'জীবনধারার ছাপ চেতনাকে গড়ে,/চেতনার ছাপ জীবনধারাকে নয়।'

চার

স্বপ্নময় প্রত্যক্ষ বাস্তবের শিখরে শিখরে অধিত্যকায় উপত্যকায় আরোহণ অবরোহণের সাধ বা সংকল্প যাঁর এমনই অদম্য, তিনি কেন নৈঃশব্দ্যের অন্তরালে

লীন হলেন, তা দুরনুমেয় হলেও অননুমেয় নয়। নতুন সভ্যতা কী ভাবে গড়া হবে, আমাদের মধ্যে তা অনেকেরই জানা না থাকতে পারে—কিন্তু মানুষেরই শ্রমে ও মননে নির্মিত পুরাতন সভ্যতা কোনো উত্তরাধিকারই রেখে যাবে না—একথা বোধহয় কেউ বলেন নি। সেহেতু 'প্রাচীন সভ্যতা ধোঁকে ঘেয়ো কুকুরের মতো'—সমর সেনের কবিতার চরিত্র-কন্ঠের এই অসতর্ক উচ্চারণ আমার কাছে সংসার-বিরক্তের উচ্চারণ বলে মনে হয়। আর যদিও মানি সমুদয় মধ্যবিত্ত বিকার শেষ পর্যন্ত ঃ

> দ্বিখণ্ডিত-সত্তা জীবনের উদ্বিগ্ন ক্লান্তিতে
> হাশিশ্ খোঁজে দ্বিধান্বিত নানা ভ্রান্তিতে। (জাতীয় সংকট)

তথাপি প্রকৃতি ও মানুষের এ-ছন্দপাতে কিসের নিরসন ঘটে ?

> গাছের যৌবন প্রতিবছরে ফেরে
> আমরা ক্রমশ ডুবি স্বখাত সলিলে। (জন্মদিনে)

মানুষই সেতু-নির্মাতা, ব্যবধান-রচয়িতাও মানুষ। 'রোমাণ্টিক ব্যাধি আর রূপান্তরিত হয় না কবিতায়'—এ উক্তি তাই মধ্যবিত্ত যন্ত্রণাসম্ভূত উক্তিই। আসলে—আমার মনে হয়—সমর সেন সমস্ত চেতনা সত্ত্বেও, বারে বারে তাঁর কাব্যের চরিত্রপাত্র হিসাবে যাকে মনস্থ করেছেন, সে বিচ্ছিন্ন মধ্যবিত্ত। সে না-প্রেমিক, না-পিতা, না-মাতা, না-কর্মী, না-সৈনিক। প্রকৃতিতে বা লোকজীবনের বহতা ধারায় সে-মধ্যবিত্ত আপন অচরিতার্থতা মোচনের জন্য সক্রিয় ছিল না। নাগরিক জীবনের যা প্রধান বাস্তবতা সেই আলোক-প্রসঙ্গ তাঁর কবিতায় কোনো চিত্রলতায় রেখায়িত হল না, সাঁওতাল পরগণার প্রকৃতিপট তার শৌখিন হাওয়া বদলের ইশারা হয়েই থাকল! রেখা-রচনায়, ডৌল রচনায় অসামান্য নৈপুণ্যও তাৎপর্য পায় না যদি না পরিপ্রেক্ষিত ঠিক থাকে। ঐতিহ্যের কোন ভূমিকে সমর সেন বেছে ছিলেন তাঁর কবিত্বের শিকড়ের পুষ্টির জন্য—তা আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। কেন এ নীরবতা—তিনি কি বুঝে নিলেন যে, এই বিকারগ্রস্ত জরাজর্জর বুর্জোয়া সভ্যতার শেষ দৃশ্যে শব্দেরা—বিশেষ মধ্যবিত্ত সংস্কারে লালিত শব্দেরা পঙ্গু ? কেন তিনি মৌন—তিনি কি জেনেছেন, যেখানে মানুষের ভূমিকা বারে বারে বিড়ম্বিত, সেখানে শব্দেরাও মৃত ? হয়তো এও আমাদের দ্বিখণ্ডিত সত্তারই যুগ্ম অভিশাপ। অথচ নিজের গড়া একটা ছন্দ তাঁর হাতে ছিল, ছিল অনন্য সাধারণ শব্দপ্রতিভা, ছিল অসামান্য কান।

তাঁর বিদ্রোহে আমার আপত্তি নেই। আপত্তি তাঁর অভিমানে, আপত্তি তাঁর স্বেচ্ছা-নির্বাসনে। দেরি হোক, যায়নি সময়।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়—প্রত্যয়ী পথিক

এক

ব্যক্তিগত কবিতার গহন রহস্য তাঁকে কোনোদিন হাতছানি দেয় নি। অথচ যাকে বলা যায় গণ-কবিতা বা সাধারণ্যের কাব্য, তিনি সে রচনায় স্মরণীয় সিদ্ধির প্রমাণ রাখলেও তাঁর প্রধান সার্থকতা তাঁর ব্যক্তিগত কণ্ঠস্বরে। বাংলা আধুনিক কবিতায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় একটা 'টোন্' বা স্বরক্ষেপের জন্য বিশিষ্ট। এ বিশিষ্টতা তাঁর স্বোপার্জিত, তাঁর কবিত্বের সহজাত, যে-মুহূর্তে এটা অনুকারীদের হাতে অনুকৃত হতে গেছে, সেই মুহূর্তে ধরা পড়েছে তাঁদের নিজস্ব স্বর-ব্যতিরিক্ত বক্তব্যের সোচ্চারতা। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবি-জীবনের প্রাথমিক পর্বে এই উচ্চগ্রাম-স্বর কিন্তু প্রকট হয় নি। অন্তত যেদিন শ্রী হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'আধুনিক বাংলা কবিতার' অন্যতম সম্পাদকীয় ভূমিকায় এ মন্তব্য করেছিলেন যে, তাঁর কাব্য প্রসঙ্গ ও প্রকরণের সঙ্গে বিপ্লবী সিদ্ধান্তের সঙ্গতি নেই, সে সিদ্ধান্তকে যেন ক্রোড়পত্রের মতো জুড়ে দেওয়া হয়েছে—সেদিন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠস্বরের তির্যক ভঙ্গি গণ-কণ্ঠের প্রতিভূ হয়ে ওঠে নি। কোনো দিনই হয়নি। অসামান্য ক্ষমতাবলে তিনি তাঁর কতকগুলি পঙক্তিকে গণ-কণ্ঠবাহিনী (না কি ছাত্র-যুবক কণ্ঠবাহিনী?) করে তুলতে পেরেছিলেন। কিন্তু এটা তাঁর সর্বাংশ নয়। তাঁর কবিতা বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে একটা নতুন ধারা যোজনে এবং অবয়বের নতুন রেখাচিহ্ন সৃষ্টিতে একান্ত ভাবেই বিশিষ্ট। এ কবিতার আলোচনাও শুরু হবে সেখান থেকে।

ইতিহাসের বড়ো মোড়ে দাঁড়িয়ে যে-কোনো সৎ-সাহিত্যিকই সাহিত্যের স্বরূপ সন্ধান করবেন। তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে এই শতাব্দীতে সমগ্র পৃথিবী যখন দার্শনিক, নৈতিক এবং অস্তিত্বগত নানা সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে, যখন বিশ্ব নামক বৃহৎ ব্যাপারটি তার প্রাত্যহিক প্রত্যক্ষতা নিয়ে এই কলকাতাতেও হয়ে উঠেছে প্রতিদিন পরিদৃশ্যমান, প্রতিদিন অনুভবগম্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায় সেই সময়ে তাঁর কবিত্বকে গড়ে পিটে নিয়েছেন। তাঁর বহু আবৃত্ত পুনঃ পুনঃ শ্রুত পঙক্তিগুলি যখন এক কণ্ঠ থেকে আরেক কণ্ঠে ভেসে যাচ্ছিল, তখন তারই সঙ্গে সঙ্গে তিনি সচেষ্ট থেকেছেন তাঁর নিজের গলার আওয়াজটিকে ধরার জন্য। সে স্বর পরিশীলিত এবং অনুচ্চ, ধ্বনিময় অথচ অনুগ্র। বরঞ্চ আমি সোজা কথাতেই বলে ফেলি,—এই কবিকে আমার সবচেয়ে ভাগ্যযুক্ত বলে মনে হয়েছে যখন তিনি উচ্চগ্রামে তাঁর রাজনৈতিক প্রত্যয়গুলি উচ্চারণ

করেছেন। উপরোধে কখনো বড়ো সার্থকতা কবিতায় অর্জিত বা আয়ত্ত হয় না। নিজের প্রত্যয়ের উপরোধেও না। শ্রী হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পূর্বোক্ত ভূমিকায় এবং বিষ্ণু দে,[১] উভয়েই সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে যে-রাজনৈতিক সরলীকরণের অভিযোগ তুলেছিলেন—সুভাষের কবিত্ব-শক্তিকে উচ্চ সাধুবাদ জানিয়েই বলা যায়—তা অমূলক নয়। শিল্পের সরলীকরণ হয় না। লেনিনের উদাহরণ এখানে স্মরণীয়। তাঁর বক্তৃতা খুবই সোজা। কিন্তু তাঁর লিখিত গদ্যের 'স্টাইল' রীতিমত জটিল। কারণ যে-সব জটিল বিষয় নিয়ে তাঁকে ভাবিত হতে হয়েছে তার কোনো সরলীকৃত প্রকাশ-ভঙ্গি হয় না। আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রেও, যেমন আমরা পূর্বে বলেছি, প্রশ্নটা সোজা হবার বা শক্ত হবার ছিল না। প্রশ্নটি ছিল কবিতার স্বয়ম্ভূ হবার। সুভাষ মুখোপাধ্যায় অন্তত তাঁর কবিজীবনের প্রথম পর্বে যেন দ্বিধাবিভক্ত ছিলেন। এক-ভাগে তিনি চেয়েছিলেন তাঁর কবিতা সভা-সমিতিতে পঠিত হোক, সকলে এতে গলা মেলাক—সেই এক ভাগেই তিনি চেয়েছেন সোজা কবিতা লিখতে। এই ভাগে তিনি এক মুহূর্তের জন্য ভোলেননি তাঁর 'কর্তব্য'-কে। 'কর্তব্য' কবিতার ক্ষেত্রে কবির প্রসঙ্গে বড়ো অদ্ভুত কথা। Cowley-র কাছ থেকে নিয়ে Mac-Leash বলেছিলেন, MacLeash-এর কাছ থেকে নিয়ে আমরাও ভাবতে পারি—Duty is the greatest temptation to the poet and the worst—অন্ততঃ ততক্ষণ পর্যন্ত একথা খাটবে, যতক্ষণ কবির কর্তব্যচেতনা কবিকে নির্দেশ দেবে সহৃদয় প্রত্যহস্পৃষ্ট সামাজিকের সাধারণ শ্রেণীভুক্ত হতে। আমরা ভুলতে পারি না সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম 'পদাতিক'। এই বিশেষ নামকরণটির মধ্যেই তাঁর তৎকালীন কবি-অভিপ্রায় নিহিত। কবির স্বোপার্জিত স্বাতন্ত্র্যের পদকটি খুলে ফেলে, কবি-অভিমানের বর্মটি খুলে তিনি পথচারী মানুষের মতো, বিমর্ষ, ক্ষুব্ধ, বিদীর্ণ জগতে বাঁচতে, লড়তে চান। ইএট্‌স্‌-এর 'গ্রে-রক্‌' কবিতার সেই সারস্বত আশীর্বাদ ধন্য দেশপ্রেমিক কবির মতো তিনিও 'পিন'-টা খুলে ফেলতে চান। তাই তিনিও সেদিন পদাতিক। এতে কোনো আপত্তি নেই। আপত্তি থাকত না, যদি না প্রথম থেকেই কবি এর ফলস্বরূপ একটা সীমাবদ্ধতার দুর্ভোগ বহন করতেন। তিনি 'চীন-১৯৩৮', 'মে-দিনের কবিতা'—এই সব কবিতায় একটা প্রচার-যোগ্য বিষয় প্রকাশযোগ্য করে তুলতে গেছেন। সাধারণ্যে পরিচিত অভিজ্ঞতাকে, অথবা বলা ভাল কতকগুলি খবরকে তিনি আবেগে স্পন্দিত করে তুলতে চেয়েছিলেন। চীনের বা স্পেনের দুর্যোগ তখনও পর্যন্ত এ্যাভারেজ বাঙালির কাছে খবর মাত্র।

১. বিষ্ণু দে, "একচক্ষু", রুচি ও প্রগতি।

তাঁর কাছে এটা অবশ্যই ছিল আবেগের বিষয়। কিন্তু সে তো তাঁরই ব্যক্তিগত আবেগের বিষয়। একই কালে একজন 'কঙ্কাবতী-র দীর্ঘ কেশপাশ ও অন্যজন বাহ্মান ক্যান্টন সাংহাইকে নিয়ে কবিতা লিখছেন, তাঁরা দুজনে প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যক্তিগত আবেগের বিষয় নিয়েই কবিতা লিখেছেন। তফাৎটা এইখানে যে, একজনের জগৎটাই ছিল নিজস্ব নিভৃত জগৎ, আরেক জনের জগৎ এবং জীবন একাকার। শেষোক্তের ব্যক্তিগত আবেগের বিষয়-উপাদান বাইরের সংঘর্ষ-সঙ্কুল শ্রেণীবিভক্ত বিশ্ব-মানব-সমাজ থেকে সংগৃহীত। একেবারেই সন্দেহ ছিল না তাঁর আন্তরিকতায়। অন্তত এতটা স্বচ্ছন্দ না হলে তিনি তাঁর ন্যায্যত বিপুল সংখ্যাত ছন্দোকীর্তি স্থাপন করতে পারতেন না।

কিন্তু আরেক ভাগে তিনি রচনা করেছেন সেই সব কবিতা, যেগুলির বিষয়-বস্তুতে রাজনীতিক চেতনা থাক বা থাক, কবিতাগুলিতে পাওয়া যায় কবির সজাগ আত্মবীক্ষণের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। 'নির্বাচনিক', 'দলভুক্ত' প্রভৃতি ছোট কবিতায় বা 'পদাতিক'-এর মতো বড়ো কবিতায় কবির এই আত্মবীক্ষণ তাঁর আধুনিক জগৎ-বীক্ষারই নামান্তর। এই সব কবিতাতেই তিনি স্বস্থ তৎপরতায় প্রমাণ করেছেন তাঁর আঙ্গিককুশল নাগরিক চতুর বাগভঙ্গির লক্ষ্যভেদ-দক্ষতা। আমরা পরিচয় পেয়েছি তাঁর ব্যঙ্গ-দীপিত অন্তর্গামী দৃষ্টির অসিকল্প বিদারণ ক্ষমতার। আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, 'পদাতিক' কাব্যগ্রন্থে একটাও গ্রামপটে আঁকা ছবি নেই। এই ছিল তিরিশের দশকের আধুনিকতার অন্যতম চিহ্ন। এর একমাত্র জীবনানন্দ-সম্ভব ব্যতিক্রমের কথা ছেড়ে দিই। অন্য সকলেই বোধ হয় নাগরিক জটিলতার প্রতীকেই তখনকার ম্লানায়মান মধ্যবিত্তের তাবৎ ধূসরতাকে, স্রোতের মন্থরতার গঞ্জনাকে এবং সবকিছুর প্রতিষেধককেও প্রতিফলিত দেখতে চেয়েছেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক' কাব্যগ্রন্থের নগর-জীবনও ধনতন্ত্রের সংকট লগ্নের এক মন্থর অথচ অস্থির, বিষণ্ণ অথচ চঞ্চল, সংশয়ী অথচ প্রত্যয় লিপ্সু—এই সব নানা বিষমের মিলনে বেপথু এবং বক্র এক জীবন। তাই তাঁর মাত্রাবৃত্তে লেখা কবিতাগুলির বাক্য প্রায়শই পঙক্তি লঙ্ঘক হয় নি। দিবসান্তে প্রত্যাবৃত্ত কেরাণির মতোই তার ওসার বহর। মিল খুব কমক্ষেত্রেই অপ্রত্যাশিতের চমক দেয়। কিন্তু অক্ষরবৃত্তে বুদ্ধদেব-প্রশংসিত, প্রবোধচন্দ্র সেন সমর্থিত এই তরুণ কবি তাঁর নাগরিক কণ্ঠস্বর ও উচ্চারণবিধির সাহায্যে এক নতুন ডিকশনের জন্ম দিলেন ছোট ছোট সংক্ষিপ্ত বাক্যে, ক্রিয়াপদহীন তীব্রগতিশীল যাদের 'চাল' বা মুভমেন্ট; যেন এক সাংবাদিকের দ্রুত নেওয়া 'নোট' থেকে তারা সটান চলে এসেছে কবিতার খাতায়। যেমন ঃ

ক. নখাগ্রে নক্ষত্র পল্লী ; ট্যাঁকে টুকরো অর্ধদগ্ধ বিড়ি।
খ. শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সভা ; লেনিন দিবস ; লাল পাগড়ি মোতায়েন ;
গ. আদালত সচ্চরিত্র ; রেস্তোরাঁয় আড্ডা তাই ভোঁতা।
ঘ. পেয়াদারা বশম্বদ : প্রবঞ্চক আদায়ের প্রত্যেক ফিকির তাদের কণ্ঠস্থ আজো। অথচ বকেয়া খাজনা প্রজারা দেয়নি গত দুইতিন সনে। আদালতে ফল অল্প।

এই বাগ্‌ভঙ্গি বা কথ্যরীতির এই খর স্রোত একটি বিশেষ সামাজিক-রাষ্ট্রিক অবস্থার নির্দেশক। এত সংক্ষেপে মানুষ কখন্ কথা বলতে চায় ?—যখন পটভূমি দ্রুত বদলে যাচ্ছে। কুশীলবকে তখন সেই দ্রুত পরিবর্তনশীল পটভূমির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই দ্রুত চালে কথা বলতে হয়। তাঁর মাত্রাবৃত্তে লেখা কবিতাতেও এই বাগ্‌বিন্যাস কখনো কখনো যে লক্ষিত হয় না তা নয় :

ক. দৈব কৃপণ, মেলে নাকো কৃপা, বিধাতা বাম ;
প্রস্তুত চিতা ; মরণ কামড়ে খুঁজি আরাম।

খ. কোনো দ্বিরুক্তি করবো না ; নেবো তীর ধনুক।
এমনি বেকার ; মৃত্যুকে ভয় করি থোড়াই ;

এই দ্রুত মুভ্‌মেন্টে বলা কথায় ক্লান্তির সুর ফোটে না। সুভাষের কবিতায় কোনোদিনই ক্লান্তির সুর ফোটে নি। এই বিশেষ বিষয়টি নিয়ে অধুনালুপ্ত 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকার তৃতীয় বর্ষের একাদশ সংখ্যায় শ্রীসত্যজিৎ চৌধুরী তাঁর 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা' নামক প্রবন্ধে আলোচনা করেছিলেন। প্রসঙ্গত তিনি সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার তুলনাও করেন। সুভাষের এই 'ক্লান্তি'হীনতা এবং সমর সেনের 'ক্লান্তি' দুইই কিন্তু মূলত একই এ্যান্টি-রোম্যান্টিক চেতনার ফল। সুভাষ এবং সমর সেনের কবিতায় রূপগত ভাবগত ছন্দোগত ব্যবধান থাকে। যতই তফাৎ থাকুক ওঁদের কবি-ব্যক্তিত্বে—এক জায়গায় ওঁদের মিল কিছুতেই আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। কবিতার পুরাণো ঐতিহ্য, যা কিছু ঊনিশশতকীয়, তাকে এমন ঝেড়ে কেটে বাদ আর কেউ দেন নি। মধ্যবিত্তের সমস্ত রোম্যান্টিক স্বপ্নের মিনারের পতনের ধূসর কবর-পাথরই সমর সেনের 'ক্লান্তি'। আর সুভাষের 'ক্লান্তি'-হীনতা হল সেই কবর-পাথর ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়া। ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টি তিরিশের কবিদের অন্যতম চারিত্র। অমিয় চক্রবর্তী ছাড়া প্রায় সকলেই ব্যঙ্গের শরনিক্ষেপে কখনো না কখনো হাত পাকিয়েছেন। এও সেই মধ্যবিত্ত সীমাবদ্ধতা, নানাবিধ

'ফাসাড্'-এর করুণ হাস্যকরতার সঠিক এবং মোক্ষম উন্মোচন। আমরা মনে করতে পারি বুদ্ধদেব বসুর সেই অব্যর্থ ব্যঙ্গবাণী :

সবি বুঝলুম। ইচ্ছে হলে যে বাংলাও পারে বলতে
তাও বুঝলুম। মহৎ যত্নে এ্যাক্সেন্ট গুলো সাজানো
ব্যর্থ হবে কি তাই ব'লে, বলো।
নিখুঁত বাংলা ফোটে ফিরঙ্গ রঙ্গে,
ইংরেজি সুরে তির্যক গতি-ভঙ্গে।

(ম্যাল্-এ/দময়ন্তী)

অথবা বিষ্ণু দে-র সেই অবিস্মরণীয় কটাক্ষ :

পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ এ কি সন্ন্যাসী
বিশ্বময় চলেছে তার ভোজ !
মরমিয়া সুগন্ধ তার বাতাসে ওঠে নিঃশ্বাসি,
সুরেশ শুধু খায় দেখি গ্লুকোজ !

(কথকতা/চোরাবালি)

বুদ্ধদেবের ব্যঙ্গ একটা সামাজিক পরিস্থিতিকে, বিষ্ণু দে-র ব্যঙ্গ যুগ-ধৃত রুগ্নতাকে—সভ্যতার মর্বিড সন্তানদের উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত সে বাণ। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ব্যঙ্গ সেক্ষেত্রে শ্রেণীবোধসচেতন রাজনৈতিক ব্যঙ্গ। 'কুঁজো হয়ে যারা ফুলের মূর্ছা দেখে', 'অসীম সিন্ধু মাপি আজ এক বিঘৎ-এ', 'লেকে সন্ধ্যায় গোচারণ ঘাসে প্রার্থী যুবক', 'ফাল্গুনী কবিরা অর্ধেক চাঁদের মতো কী করুণ চ্যাপ্টা হয়ে গেছে'—প্রভৃতি উক্তিতে মধ্যবিত্ত যুবকের বিচ্ছিন্নতার রূপটিকে কার্টুনের ভঙ্গিতে কবি সহজে এঁকে দেন। কিন্তু সেই কার্টুনটির পাদটীকায় থাকে যেন একটি রাজনৈতিক ভাষ্য। তাঁর এই স্তবকটি তৎকালীন ইংরেজ সরকারের ভারত রক্ষা আইনের চমৎকার ব্যঙ্গভাষ্য :

হে সওদাগর ! সিপাই, সান্ত্রী সব তোমার।
দয়া করে শুধু মহামানবের বুলি ছড়াও —
তার পরে প্রভু বিধির করুণা আছে অপার ;
জনগণমতে বিধিনিষেধের বেড়ি পরাও

(প্রস্তাব : ১৯৪০/পদাতিক)

এক হীরকদ্যুতি আয়রণিতে কবিতাটি শেষমুহূর্তে সূচীতীব্র হয়ে উঠেছে —'চোখবুজে কোনো কোকিলের দিকে ফেরাবো কান'। সেই সময়ের বেকার ম্লান পাণ্ডুর যুবকের স্বপ্ন আর বাস্তবের মূঢ় অসঙ্গতির কী অসামান্য ছবিই না তিনি এঁকেছেন :

ঘড়ির কাঁটায় কত যে মিনিট মরছে,
মনে অনন্ত সময়ের অধিরাজ্য ;
ভুলেছি, জ্যোৎস্না হারিয়ে হরিৎ ধান্য,
এখানে বন্দী আনা-তিনেকের বালবে। (রোমান্টিক)

দুই

কিন্তু এ উজ্জ্বল যাত্রার মধ্যে সেই বেদনাবোধ ছিল না, যা কবিকে নিয়ে যাবে মহত্তর উপলব্ধিতে। ছিল না প্রেম এবং প্রকৃতির দুই বাহুর মিলিত আমন্ত্রণ। কোথায় তাহলে তাঁর অধিষ্ঠান ভূমি? কোন্‌খানে দাঁড়িয়ে তাহলে তিনি বলবেন জীবনের পাহাড়-সাগরের কথা? অচিরেই সুভাষ তাঁর উত্তর দিলেন—'মানুষ'। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দারুণ আঘাতে, দুর্ভিক্ষের কালো শকুনির ছায়ায় অরুন্তুদ মানুষগুলির মাঝখানে তাঁর কবিতা খুঁজে পেল নিজের অধিষ্ঠান ভূমি। তিনি এবং আমরা সেই সময়েই বুঝলাম উজ্জ্বল চকচকে পঙ্‌ক্তি নয়, চতুর নাগরিক বিন্যাস নয়, যে- অর্থ, যে-meaning তাঁর কবিতা সঞ্চারিত করতে চাইছে তা হল প্রত্যক্ষ 'মানুষ'। 'এই আশ্বিনে' এবং 'স্বাগত' এই দুটি কবিতাকে এই কবির বিবর্তনের স্মারক চিহ্ন বলা যায়। 'শোকাচ্ছন্ন পড়ে থাকে ভগ্ন দুত শাঁখা'—এ আব সেই স্মার্ট যুবকোচিত বাণী-ভঙ্গি নয়। এ এক হৃদয়বান যথার্থ কবির উপলব্ধি, মানুষের শ্মশানে সুভাষের বিশ্বরূপদর্শন শুরু হল। আমরা তাঁর যুবকতর পাঠকেরা ঝাপসা চোখে সেদিন পড়লাম ঃ

চোখ তার
অনুর্বর অন্ধকারে ঢাকা ;
গায়ে তার শবগন্ধ
পদতল চিতাভস্মে বাখা

ঝড় এসে পাতা নাড়ে
বীজে লাগে টান,
উপবাস রুক্ষ হাড়ে
বজ্র পাতে কান ;
উন্মত্ত বন্যার স্তম্ভ কাঁপে,
রুষ্ট কৃষ্ণ মেঘে কাঁপে,
যেন কোনো কটাক্ষের স্খলিত বিদ্যুৎ।

আমরা বিস্মিত হলাম না, যখন দেখলাম 'স্বাগত' কবিতায় একটিও চলতি মেজাজের ও কালের প্রকর্ষ-প্রদীপ্ত পঙক্তি নেই। সেখানে যথাসম্ভব বিশেষণ-বিবর্জিত ছোট বড় (কোনোটিই খুব বড় নয়) পঙক্তি-দীর্ঘ বাক্য—অথচ গা ছম্ ছম্ করে ওঠে কবিতাটির প্রথমাংশে। দুর্ভিক্ষের বিষয় নিয়ে বাংলা সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা মর্মস্পর্শী কবিতা যে এটাই—একথা নিয়ে কোনো তর্কও চলে না। এর সঙ্গে একমাত্র মনে পড়ে বঙ্কিমচন্দ্রের আঁকা ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ছবি। বৃহৎ জীবনের বিপুল অভিঘাতেই কোথায় হারিয়ে গেল সেই ব্যঙ্গের তীরন্দাজি। তার বদলে এখনকার কবিতায় এল মানবিক প্রত্যয়ের প্রগাঢ় স্পর্শ। 'চিরকুট'-এর মতো কবিতার বা 'ঘোষণা'-য় প্রচার একারণেই রৌদ্র-বীর্যেভরা। তির্যক হবার জন্য তার সাধ নেই। কিন্তু সে সরলার্থে ঋজুও নয়। 'চিরকুট'-এর প্রথম কবিতার প্রথম পঙক্তি 'সেদিনকার শাণিত ধার হারিয়েছি' তাই পরবর্তী নতুন পদক্ষেপের সূচক। এর পরিবর্তে তিনি যা পেলেন তা হল চিত্রকল্পচারী ভাব-ভাবনা, ভাষার চাকচিক্যহীন অথচ অন্তগূঢ় চাল ও সংহতি। অতঃপর চিত্রকল্পও হয়ে উঠল বহুবার্থ-সঞ্চারী। 'ভাঙলো চিবুক-ঠেকানো হাতের নিদ্রা', 'খাল শুকনো, বিল শুকনো চোখের কোলে সমুদ্দুর', 'অরণ্যের ডালে ডালে বাজুবন্ধে বেঁধে দিয়ে পর্ণচূড় রাখী আলাপে মুখর হয় পাখি', 'ঝড় আসন্ন, আকাশে মেঘের কুচকাওয়াজ', 'হাতুড়ি বিকিয়ে হাটে ভস্ম মেখে পড়ে থাকে বেকার হাপর', 'বজ্র দাঁতে কাটে মেঘ', 'চাপা বিদ্যুতে খেলে দুষমণ বজ্রমুষল', 'ঝড় আসছে, আকাশে মেঘ চোখ পিটপিট করে', 'পাগল বাবরালির চোখের মত আকাশ', 'শান বাঁধানো পাথরে আগুনের ফুল তুলে', 'শান বাঁধানো ফুটপাথে পাথরে পা ডুবিয়ে এক কাঠখোট্টা গাছ গাছ কচি কচি পাতায় পাঁজর ফাটিয়ে হাসছে'। বজ্র, পাথর, মেঘ, ঝড় তাঁর চিত্রকল্পের প্রিয়ভাষা। বিপরীত বিষয়কে ঐক্যবদ্ধ করে সুভাষের চিত্রকল্প যেন সময়ের যন্ত্রণার ভিতরমহলের চাবি খুলছে। প্রকৃতি থেকে সংগৃহীত চিত্রগুলি মূল্যবান হয়েছে মানবিক বিপর্যয় এবং প্রতিবাদের নানা বর্ণের রেশ গায়ে মেখে। আর সঙ্গে সঙ্গে দেখি 'পদাতিক' পর্যায়ে তাঁর অন্ত-মিল ছিল মাত্র ভাল—এখন থেকে তা হলো অপ্রত্যাশিতের চমকতোলা অনিবার্য মিল।

তাঁর কবিতার স্ট্রাকচারেও এসেছে ফল্গুস্রোত নাট্যরূপের বাঁধন। 'ফুল ফুটুক না ফুটুক' এর মতো কবিতা এর নিদর্শন। কবিতাটির প্রথম বাক্যটি এক বিমুখ বাস্তবকে উপেক্ষা করার দুঃসাহসে দৃপ্ত। বুঝি একটু আচমকা শোনায়। ছোট্ট দ্বিতীয় অংশটি আকস্মিকতাকে সহজ করে দেয়। উৎস

যার পাথর সে ফুল ফোটাতে পারেনি। কিন্তু কচিপাতার হাসি দিয়েই সে বিপুল বসন্ত ঘোষণা করছে। সে যেন বলতে চাইছে তার পাওনাটা বড় কথা নয়—বড় কথা হল বিপুল জীবনকে স্বীকৃতি জানানো। এর পরে আবার উচ্চারিত হয়েছে প্রথম বাক্যটি। এবারে স্বর সহজ হয়ে এসেছে। স্বরের এই ওঠা পড়া সুভাষের কবিতার নির্ভুল আত্মপরিচয়। এই কবিতার ক্ষুদ্র নাটিকায় দুটি চরিত্র। প্রথম চরিত্র পাথরে পা ডুবিয়ে থাকা ঐ গাছটি। দ্বিতীয় চরিত্রটির স্বগত-চিন্তাকে অতঃপর পাওয়া গেল। গাছটি অতীতের কথা একবারও বলেনি। সে তৎক্ষণজীবী। সেখানেই তার গভীর আশার মূল। তার প্রত্যয়ও যেন পাথরে পা ডুবিয়ে বসে থাকে—অনড়। কিন্তু 'কালো কুচ্ছিত' 'আইবুড়ো' মেয়েটা ওভাবে আশাবাদী হতে পারে না। সে তো পাথরে পা ডুবিয়ে বসে নেই। সে দেখেছে ব্ল্যাক আউটের রাত্রি এসেছে, চলে গেছে (আলোর চোখে কালো ঠুলি পরিয়ে তারপর খুলে), সে দেখেছে আকাল এসেছে এবং গেছে। অনেক বিচিত্র সুর—হরবোলা ছেলেটি যার প্রতীক—গত দুর্ভিক্ষে হারিয়ে গেছে। মেয়েটির প্রার্থনা ঐ সব ভয়ংকর দিনগুলি যেন না ফেরে। এই পর্যন্ত মেয়েটির স্বগত চিন্তায় আত্মচিন্তা নেই। আত্মচিন্তাটি উঁকি দিল হরবোলাটির প্রসঙ্গে যখন মনে পড়ে গেল বিকেলের রঙটি – 'গায়ে হলুদ দেওয়া বিকেলে'। তার ব্যর্থ যৌবনের কথাটি এই সূত্র ধরেই আরো দৃঢ় হল এই চিত্রকল্পে—'লাল কালিতে ছাপা হলদে চিঠির মতো আকাশটাকে মাথায় নিয়ে'। আকাশের মতোই স্বপ্ন ছড়াবে শুধু—নইলে সুদূর, অপ্রাপ্য তার জীবনেও অমন চিঠি। ঠিক এই সময়েই তৃতীয় পাত্রের প্রবেশ—প্রজাপতি। গায়ে উড়ে পড়া প্রজাপতিটি যেন প্রকাশ্যে ফাঁস করে দিল তার গোপন স্বপ্ন। মেয়েটি বাইরের বারান্দা ছেড়ে দ্রুত ঘরের অন্ধকারে আত্মগোপন করল—'তারপর দড়াম করে দরজা বন্ধ হবার শব্দ'। 'অন্ধকারে মুখচাপা দিয়ে দড়ি পাকানো সেই গাছ তখনও হাসছে।' 'দড়িপাকানো সেই গাছ' হয়তো অনেক দেখেছে। কিন্তু মেয়েটিকে যেমন দাগ কেটে গেছে অভিজ্ঞতাগুলি, তাকে কি তেমন করে কাটেনি? নাকি, তার হাসি নিজেরই হাসি, সে হাসি ততটা মেয়েটির আত্মগোপন দেখে নয়, যতটা বিশ্বাসের হাসি—'ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত'। কিন্তু তার হাসি দেখেই আমাদের মনে পড়ে যায় মেয়েটিও তো বলতে পারত—বিয়ের ফুল ফুটুক না ফুটুক জীবন বৃথা হয় না। হয়তো গাছটি বলছে তত্ত্বকথা, হয়তো মেয়েটিই বলছে মনের কথা—সেই 'রিয়্যাল'। তথাপি এই দুই বিপরীতের সহাবস্থানে কবিতাটি হয়ে উঠেছে গঠন-রীতিতে নাট্যধর্মী।

কবির অপক্ষপাত দৃষ্টিটি সেই রীতিকে আরো গুণান্বিত করে তুলেছে। প্রকৃতির থেকে যে মানুষ বড় একথা তিনি 'ড্যাং ড্যাং করে' কবিতায় জটাধারী গাছের পটভূমি ব্যবহার করে বলেছেন। এ কবিতাতেও বললেন। পাথরে পা ডোবানো গাছটির 'কাষ্ঠ'-প্রত্যয় অপেক্ষা অনেক সজীব মেয়েটির লাজলজ্জা, আত্মগোপন। তবু সাধুসত্যের কথা গাছটিই বলেছে।

তিন

'খাঁচা ছাড়া' কবিতায় কি 'পদাতিক'-এর প্রতিশ্রুতি অন্যপথের ইশারা পেল ?

লেখকের দল
একদিকে জল
একদিকে দানা।
বসিয়ে খাঁচায়
ওরা লেখা চায়।
খাঁচা ভেঙে তাই
মেলেছে ডানা ॥

দল বা খাঁচার বাইরে অনন্ত আকাশের মূল্যে নিজের ডানা দুটিকে বুঝে নেবার প্রয়াস অবশ্যই মূল্যবান। 'ছেলে গেছে বনে'-তে সেই প্রয়াসের সাক্ষ্য। ওদিকে বাংলাদেশের রক্তস্রোত, এদিকে পশ্চিমে বাংলার ছিন্নমস্তা মূর্তি— কবিতায় কি আর রক্তের ছিটে লাগেনি ? দেয়ালে লেখার জন্য তিনি যা রচেছেন তার ভিতরে আছে এই সময়ের দেওয়া ভূয়োদর্শন ও একক-বৈদগ্ধ্যের মিলিত উদ্ভাসন—'দিনে দিনে হয়, রাতারাতি হবার নয়'। রাতারাতি নয়, দিনে দিনেই সুভাষ মুখোপাধ্যায় পেঁছুচ্ছেন নিশ্চিত লক্ষ্যে। নাজিম হিকমতী[২] অধ্যায়ে তিনি জেনেছিলেন কবিতার বিষয় প্রত্যক্ষ মানুষ। 'ছেলে গেছে বনে'-তে নানা কবিতায় দেখা গেল তাঁর কথায় মানুষের জীবনের নানা গল্পের আদল বা আভাস এসেছে। 'সময়ের জালে' কবিতাটি বা 'কে বা কারা' কবিতায় তার দেখা মেলে। এবং সব থেকে বড়ো কথা তাঁর এখনকার কবিতা মুক্ত আকাশের গানই বটে। তার মানে এই নয় তিনি ব্যক্তিগত কবিতায় লীন হয়ে গেছেন। তিনি 'চিরকুট', 'অগ্নিকোণ', 'ফুল ফুটুক না ফুটুক' প্রভৃতি কাব্য-পর্যায়ে দিনে দিনে যে জীবনকে খুঁজেছেন এখন সেই জীবনই তাঁর কাছে প্রধান কথা। 'পদাতিক'-এ তাঁর রাজনৈতিক চেতনার উপর ভর করে দাঁড়াতে

২. শ্রীসত্যজিৎ চৌধুরী-র পূর্বোক্ত প্রবন্ধে আলোচিত।

চয়েছিল তাঁর জীবনবোধ। 'চিরকুট'-এও সে সুরটি বিদায় নেয়নি। কিন্তু ক্রমশই তিনি বুঝেছেন জীবন নামক বৃহৎ জটিল অসংজ্ঞেয় ব্যাপারটিকে। তিনি জেনে নিয়েছেন সেই জীবনই সব কিছুর ধারক, বাহক, ভাষ্য রচয়িতা। 'ছেলে গেছে বনে'-তে সেই বোধ আরো তীব্রতা পেয়েছে। নাম-কবিতাটি কী-এক অসীম বেদনার ও উদ্‌ভ্রান্ততার বাঙ্ময় মিনার—উত্তরকাল তার সাক্ষী হবে। 'ফেরাই' কবিতাটি প্রসঙ্গেও একই কথা বলা চলে। যাদের কথা কোথাও কেউ আর বলে না—সুভাষের এই সব চিরকালের কবিতায় তাদের কথা থাকল। ছোট ছোট কবিতাগুলিতে অবরুদ্ধ হয়ে থাকল ধাবমান উদ্ভ্রান্ত সময় ঃ

গভীর রাত
তীব্রগতি
খড়ের গাড়ি
গরুর চোখ
গাছের গুঁড়ি
খড়ির দাগ।

সেই উদ্‌ভ্রান্ত সময়ই স্থির মূর্তি ধরে 'আলোয় অনালোয়' কবিতায়। কবি নিজেরই তৈরি করা চিত্রকল্পের পুরানো প্যাটার্ন ভেঙে ফেলেছেন। প্রচলিত অর্থে চিত্রকল্প কমে এসেছে। তার জায়গায় গাঢ় হয়ে উঠেছে আরেক রীতির চিত্রকল্প—যারা আপন মহিমার প্রতীক, অথবা গোটা কবিতাটাই হয়েছে একটা পরিবেশ পরিস্থিতির চিত্রকল্প, যেমন 'একুশে ফেব্রুয়ারি'। 'ফুল ফুটুক বা না ফুটুক'-এর সেই ফল্গু নাট্যস্রোত কালের হস্তাবলেপেই বুঝি স্তব্ধ। তাই নাট্যস্বভাষী বিপরীতের মিলনঘটক সেই চিত্রকল্প-রীতিও 'ছেলে গেছে বনে'-তে পরিহৃত। মানুষ এবং মানুষ সংক্রান্ত সব কিছুর মূল্যে এই কবি জীবনকে নির্ধারণ ও অবধারণ করতে করতে এগিয়ে চলেছেন।